প্রথম প্রকাশ :—শুভ মহালয়া—১৩৬৬

পরিবেশক : নাথ ব্রাদার্স। কলিকাতা-১২

শঙ্কর প্রকাশন ১৫।১এ যুগলকিশোর দাস লেন, কলিকাতা-৬ হইতে নিতাই মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও বাণী-শ্রী প্রিন্টার্স ৮৩বি, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীরণজিৎ কুমার সামুই কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ : ইন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের
শতবর্ষ
স্মরণে

॥ সেদিনের নাট্যশালা ॥

বাংলা নাট্যশালার ইতিহাসে ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দ একটি স্মরণীয় বৎসর। ঐ বৎসর বাংলা নাটকের সূচনা। আর ঐ সঙ্গে একজন বিদেশীর নাম যুক্ত হয়ে আছে। বিদেশী ভদ্রলোক একজন রাশিয়ান। নাম হেরাসিম লেবেডেফ। যদিও সেদিনের সেই নাট্যশালা ক্ষণস্থায়ী প্রচেষ্টার স্বাক্ষর, তবু ইতিহাসে সেই নাটকাভিনয়ের ঘটনাকে ঐতিহাসিক বলতে হবে।

এরপর প্রায় চল্লিশ বছর পরে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্যামবাজারে নবীন চন্দ্র বসুর বাড়ীতে নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা হয়। যদিও তা স্থায়ী মঞ্চে পরিণত হয় নি।

ঠিক ঠিক বলতে গেলে বাংলা নাট্যাভিনয়ের সত্যি ইতিহাসটা আরম্ভ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে। আর তখন থেকে বাংলা নাট্যশালায় একটি যুগের সূচনা। আর এই সময়ের ইতিহাসের সঙ্গে অনেক নাম যুক্ত হয়ে আছে। নন্দ কুমার রায়, রামনারায়ণ তর্করত্ন, কালীপ্রসন্ন সিংহ, রাজা প্রতাপ চন্দ্র সিংহ, ঈশ্বর চন্দ্র সিংহ, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, চুনিলাল বসু—এ ছাড়া আরো অনেক নাম সেদিনের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে।

মেট্রোপলিটান থিয়েটার, শোভাবাজার রাজবাড়ীর প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি, পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর নাট্যশালা, বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয়—এই সব নাট্যশালা ছিল সে যুগের নাট্য-চর্চার পীঠ।

কিন্তু তখনো পর্যন্ত পেশাদারী মঞ্চ বাস্তব রূপ নেয়নি। তখনকার আমল শৌখীন নাট্য চর্চার আমল। যদিও পরবর্তী কালের পেশাদার রঙ্গমঞ্চের সূচনা সেদিনই দেখা গিয়েছিল।

এই শৌখীন নাট্য সম্প্রদায়ই প্রথম পেশাদারী মঞ্চের সূচনা করেন ১৮৭২ সালে। ঐ বৎসর ৭ই ডিসেম্বর তারিখটি সে হিসাবে ঐতিহাসিক। ঐ দিনই ন্যাশনাল থিয়েটার পেশাদারী মঞ্চ হিসাবে প্রথম নাটকাভিনয়ের সূচনা করেন। আর প্রথম রজনীর নাটক ছিল নীলদর্পণ। আর এই অভিনয়ের ঐতিহাসিক তাৎপর্য বোঝাতে নবগোপাল মিত্র সম্পাদিত 'ন্যাশনাল পেপার' পত্রিকার মন্তব্যই যথেষ্ট 'The event is of National importance.'

আর ১৩ই ডিসেম্বর তারিখে 'এডুকেশন গেজেটে' এই অভিনয় সম্পর্কে যে মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল, তার কয়েকটি লাইন এখানে তুলে ধরছি। যে মন্তব্য পড়লে আজকের দিনের মানুষ সেদিনের বাস্তব অবস্থাটা বুঝতে পারবেন।

'ন্যাশনাল থিয়েটারের রঙ্গমন্দির অতিশয় প্রশস্ত এবং উচ্চও মন্দ নয়। তাহার দুই পার্শ্বে ও ফুটপাথে অর্থাৎ বহির্ভাগে গ্যাসের আলো ছিল। তাহাই কেবল দর্শক মণ্ডলীর আলোকের ভরসা মাত্র। রঙ্গ গৃহের উপরিভাগে একটি আলোকময় crown অর্থাৎ রাজমুকুট শোভা পাইয়াছিল। আলোক বিহনে শ্রোতৃবর্গের সে দিবস যে কি অপরিসীম কষ্ট হইয়াছিল, তাহা কেবল যাঁহারা সেই দিবস ভোগ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই জানিতে পারেন।'

সুলভ সমাচারে প্রকাশিত হয়েছিল, 'কলিকাতা ন্যাশনাল থিয়েট্রিকেল সোসাইটির সভ্যেরা গত শনিবার রাত্রে নীলদর্পণের অভিনয় করিয়াছেন, ইহা উত্তম হইয়াছিল। সভ্যতা যতই বৃদ্ধি হইবে তাহার সঙ্গে সঙ্গে দেশের মঙ্গল জনক নির্দোষ আমোদ সকলেরও সৃষ্টি হইবে।'

অমৃত বাজার লিখেছিল 'নীলদর্পণ নাটক দেশ প্রসিদ্ধ। ইহার গল্পভাগ অনেকেই জানেন। কিন্তু একথাও বলিতে হয় যে গত শনিবারে নীলদর্পণের, 'নবযৌবন' হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে বলি, সে সময়ে অভিনয়ে মেয়েরা অংশ নিত না।

পুরুষেরাই নাটকে অংশ গ্রহণ করতো। আর যে অমৃতলাল বসু একদিন যুগ সৃষ্টি করেছিলেন, ন্যাশনাল থিয়েটারে প্রথম অভিনয়ে সেই অমৃতলাল সৈরিন্ধ্রী চরিত্রে রূপদান করেছিলেন।

যে আমলের কথা বলছি, সে আমল অর্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল, গিরিশচন্দ্রের আমল। বাংলা নাটমঞ্চের সেটা আদি যুগ। কিন্তু বাংলা নাট্যশালা তার সূচনাতে যাঁদের পেয়েছিল, এ পাওয়াটা গৌরবের বৈকি।

গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, অর্ধেন্দুশেখর, ধর্মদাস সুর, মতিলাল সুর, বেলবাবু, ক্ষেত্রবাবু—এঁদের নাম তো রূপকথার নায়কের মত বাঙালী মানসে আজও বিস্ময়ের সৃষ্টি করে।

ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার পর আরো সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা হয় এবং অভিনয় সুরু করে। ১৮৭৩-এর প্রথমেই ওরিয়েন্টাল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা। আর ওরিয়েন্টাল থিয়েটারের প্রথম নাটক রামনারায়ণ তর্করত্নের 'মালতী মাধব'।

সে আমলের আর একটি নাট্যশালা 'বেঙ্গল থিয়েটার'। বেঙ্গল থিয়েটার সে আমলে নিঃসন্দেহে আধুনিকতার দাবীদার। এর আগে থিয়েটারে স্ত্রী চরিত্রে পুরুষেরা অভিনয় করতো। বেঙ্গল থিয়েটারে প্রথম অভিনেত্রীরা পাদপ্রদীপের আলোয় আসেন। এই প্রসঙ্গে অমৃতলাল বসু তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন, 'ছাতুবাবুর (৺আশুতোষ দেব) দৌহিত্র শরৎবাবু (৺শরৎচন্দ্র ঘোষ) ছাতুবাবুর বাবুর বাড়ীর সম্মুখের মাঠে একটি নূতন খোলার ঘরে বেঙ্গল থিয়েটার নাম দিয়া একটি নূতন নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করেন। মাইকেল মধুসূদনের পরামর্শে থিয়েটারে অভিনেত্রী লওয়া স্থির হইল।....যে চারিজন স্ত্রীলোককে বাছাই করিয়া লওয়া হইল, তাহাদের নাম জগত্তারিণী, গোলাপ (পরে সুকুমারী দত্ত), এলোকেশী ও শ্যামা।

অভিনেত্রীর মঞ্চাবতরণ নিয়ে সেদিন যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি

হয়েছিল। নানা বিরূপ মন্তব্যও প্রকাশিত হয়েছিল। সাপ্তাহিক পত্রিকা 'ভারত-সংস্কার' লিখেছিল, 'অভিনেত্রীদিগের মধ্যে দুইজন বেশ্যাও ছিল। এ পর্যন্ত আমরা যাত্রা, নাচ, কীর্তন, ঝুমুরেই কেবল বেশ্যাদিগকে দেখিতে পাইতাম, কিন্তু বিশিষ্ট বংশীয় ভদ্রলোকদিগের সহিত প্রকাশ্যভাবে বেশ্যাদিগের অভিনয় এই প্রথম দেখিলাম।'

অমৃতবাজার লিখেছিল, 'বেঙ্গল থিয়েটার সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী সমাজে একটি নূতন জিনিষ। রঙ্গভূমিতে স্ত্রীলোকের অংশ স্ত্রীলোকের দ্বারা অভিনীত হইলে অভিনয় সর্বাঙ্গসুন্দর হয়। কিন্তু এই স্ত্রীলোকের অংশ সকল সমাজ-পরিত্যক্ত ধর্ম্মভ্রষ্টা স্ত্রীলোকের দ্বারা অভিনীত হইলে জন সমাজে পাপ ও অমঙ্গল বৃদ্ধি হয় কিনা, তাহা পরীক্ষা সাপেক্ষ। বেঙ্গল থিয়েটার কোম্পানী এই দুরূহ পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

১৮৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বর পেশাদারী মঞ্চের প্রথম সূচনা।

আর এর এক বছর পরে ১৮৭৩-এর শেষের দিকে ন্যাশনাল থিয়েটারের বৎসর পূর্তি উপলক্ষে চীৎপুর রোডে মধুসূদন সান্যালের বাড়ীতে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই অনুষ্ঠানে নাট্যকার মনোমোহন বসু ভাষণ দিয়েছিলেন, 'আজ কি আহ্লাদ, আজ আমাদের স্বজাতীয় নাট্যসমাজের বর্ষোৎসব। জাতীয় নাট্যাভিনয়ের জন্মদিন। গত বৎসর এই দিনেই জাতীয় নাট্যাভিনয়ের অভ্যুদয় হয়।'

সেদিনের নাট্যশালার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এমন ধারা অজস্র দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এবং আজকের দিনের মানুষের কাছে তা রীতিমত বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

আত্মজীবনী সে আমলের অনেক অভিনেতাই লিখেছেন। অভিনেত্রীদের মধ্যে বিনোদিনীও তাঁর কথা লিখে গেছেন। আর সব আত্মকথার মধ্যে সেদিনের সত্য ইতিহাস স্পষ্ট হয়েছে।

ধর্মদাস সুর বাংলা নাট্যজগতের সূচনায় একটি উজ্জ্বল নাম। তাঁর আত্মকথায় গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার সম্বন্ধে বলছেন, 'আমার চেষ্টায় ও ভুবনমোহন নিয়োগীর পয়সায় বিডন ষ্ট্রীটে মহেন্দ্রনাথ দাসের জমি ভাড়া লইয়া (এখন যেখানে মিনার্ভা থিয়েটার) এক কাষ্ঠের ঘর নির্মাণ করি ও উহার নাম দেওয়া হয় গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার।'

১৮৭৩-এর ২৯শে সেপ্টেম্বর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনা করা হয়। আর এই নাট্যশালা নির্মিত হয়েছিল তিন মাসের মধ্যে। ১৮৭৩-এর ৩১এ ডিসেম্বর 'কাম্যকানন' নাটক দিয়ে ঐ মঞ্চের উদ্বোধন হয়েছিল। প্রথম রজনীর নাটক ছিল 'কাম্যকানন।' কিন্তু সে অভিনয় কয়েকটি দৃশ্যের পরই বন্ধ হয়ে যায় কারণটি নিতান্ত আকস্মিক—মঞ্চে আগুন লেগেছিল।

সে সময়ের একটি রেওয়াজের কথা আজকের দিনে মনে করা দরকার। তখন কলকাতার পেশাদারী মঞ্চের অভিনয় কলকাতা শহরেই সীমাবদ্ধ ছিল না। মফঃস্বল সফর করতো এই নাট্য সম্প্রদায়। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার মাঝে মাঝে মফঃস্বলে অভিনয় করেছে।

আর বেঙ্গল থিয়েটারের মতো গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারেও শেষ পর্যন্ত অভিনেত্রীদের গ্রহণ করা হলো। আর মঞ্চে অভিনেত্রী গ্রহণের জন্যে সেদিন নাট্যমঞ্চকে দস্তুর মতো বিরূপ সমালোচনার মুখোমুখি হতে হতো। তবুও বাঙালীর নাট্যচর্চা ব্যাহত হয়নি।

থিয়েটারের বিরুদ্ধে রক্ষণশীল মহলের সামাজিক প্রতিরোধ তো ছিলই, শেষ পর্যন্ত রাজরোষেও পড়তে হলো বাংলা মঞ্চকে।

১৮৭৬-এর ১৯শে ফেব্রুয়ারী গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হলো' গজদানন্দ ও যুবরাজ' নামে একটি প্রহসন। প্রহসনটির বিষয়বস্তু ছিল বিচিত্র। সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড কলকাতায় আসেন

প্রিন্স অব ওয়েল্‌স রূপে। আর ঐ সময় কলকাতার লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রিন্স অব ওয়েল্‌সকে তাঁর বাড়ীতে আহ্বান করেন। ১ যুবরাজ জগদানন্দবাবুর ভবানীপুরের বাড়ীতে এলে তাঁকে মুখোপাধ্যায় পরিবারের অন্তঃপুরচারিণীরা শঙ্খধ্বনি এবং উলুধ্বনি দিয়ে বরণ করে। এ ব্যাপারে কলকাতার বাঙালী সমাজে আলোড়ন ওঠে। আর এই ঘটনার ফলশ্রুতি 'গজদানন্দ ও যুবরাজ' প্রহসনের অভিনয়।

এর ফলে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার কর্তৃপক্ষ রাজরোষে পড়লেন। এবং সরকারও নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন বলবৎ করতে সচেষ্ট হলেন।

কিন্তু তাতেও কর্তৃপক্ষ দমলেন না। বরং তারা নতুন নতুন নাট্য-প্রহসন রচনা করে অভিনয় করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত ঘটনা চরমে পৌঁছলো। 'সতী কি কলঙ্কিনী' গীতিনাট্যের অভিনয় চলছিল মঞ্চে—ঐ অভিনয় চলাকালীন ইংরেজ সরকারের পুলিশ গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের ডিরেক্টর উপেন্দ্রনাথ দাস, ম্যানেজার অমৃতলাল বসু, মতিলাল সুর, বেলবাবু ও আরো কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করলেন। ইতিপূর্বে 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নামে যে নাটক অভিনীত হয়েছিল, সেই নাটক অভিনয়ের অপরাধে এঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটক নাকি অশ্লীল।

আর এই নিয়ে সে সময়ে অনেক জল ঘোলা হলো। শেষ পর্যন্ত ১৮৭৬ সালের শেষের দিকে Dramatic Performances Controll Bill' - এই কুখ্যাত আইনটি পাশ হয়ে গেল।

আর বাঙালীর নাট্যভাবনার ওপর আইনের পাথর চাপা দেবার অপচেষ্টা হলেও, তাতে বাঙালীর নাট্যচর্চা ব্যাহত হলো না। কেন না সেদিন যাঁরা নাট্যপীঠে সমবেত হয়েছিলেন, অভিনয়ের সাধনা —সেদিন তাঁদের মধ্যে যেমন নিষ্ঠার অভাব ছিল না, তেমনি ছিল না সাহসের অভাব।

সেদিনের নাট-মঞ্চের সেবকদের এমন একটা মানসিকতা তৈরী হয়েছিল, যা কুসুমাস্তীর্ণ পথে চলার মানসিকতা নয়—বরং যে কোন বাধাকে অতিক্রম করার দুঃসাহস নিয়েই তাঁরা নাট্য জগতে প্রবেশ করেছিলেন।

গিরিশ চন্দ্রকে বাংলা নাট্যজগতের সবচেয়ে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বললে ভুল হবে—বরং ঠিক ঠিক বলতে গেলে বলতে হয়—সূর্য।

১৮৪৪-য়ে গিরিশচন্দ্র যদিও নাট্যজগতে প্রবেশ করেছিলেন, তবুও তখনো তিনি পুরোপুরি আসতে পারেন নি। আর এই প্রতিভাধর পুরুষটিকে পুরোপুরি নাট্যজগতে নিয়ে এসেছিলেন প্রতাপ জহুরী বলে একজন মাড়োয়ারী।

দেনার দায়ে বিকিয়ে গেল ন্যাশনাল থিয়েটার। কিনলেন অবাঙালী প্রতাপ জহুরী। আর থিয়েটার কেনার পর প্রতাপ জহুরী প্রথমে যে মানুষটির কাছে গেলেন, তিনি হলেন গিরিশচন্দ্র।

এই প্রসঙ্গে স্বর্গীয় ডঃ হেমেন্দ্রপ্রসাদ দাশগুপ্তের ভারতীয় নাটমঞ্চ গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরলে বোধহয় সব কিছুই স্পষ্ট হবে।

"প্রতাপ জহুরী আসিয়া কিন্তু প্রথমেই গিরিশবাবুকে স্মরণ করেন। গিরিশবাবুর সঙ্গে দেখা করিয়া বলেন, "বাবু আপনাকে আমার থিয়েটারের ভার লইতে হইবে, আপনি ম্যানেজার হবেন।"

গিরিশবাবু বলেন, দেখুন আমি চাকরি করি; তবে থিয়েটার ভালবাসি, আপনার ওখানে যাওয়া আসা করিব, যেরূপ পূর্বে সহায়তা করিয়াছি, এখনও তাহা করিব।

"না বাবু সেটি হবে না। আপনি ম্যানেজার হবেন, চাকরিটি ছাড়িতে হইবে।

গিরিশবাবু ভাবিলেন, এ বলে কি? আমি চাকরি ছাড়িব—

আমি সেখানে দেড়শত টাকা মাইনা পাই। আমি চাকরি ছাড়িব ?

কিন্তু জহুরী পাকা ব্যবসাদার খাঁটি জিনিষ পাইয়াছেন। ছাড়িবেন কেন ?”

আর সত্যি সেদিন প্রতাপ জহুরী গিরিশচন্দ্রকে থিয়েটারে পাকাপাকি ভাবে যোগদানে রাজী করিয়েছিলেন। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় লিখেছেন মাসিক একশ টাকা মাইনেয় গিরিশচন্দ্র থিয়েটারে যোগ দিলেন।

ঘটনাটা সাধারণ হলেও অসাধারণ। একজন অবাঙালী ব্যবসায়ী বাংলা মঞ্চ নিয়ে ব্যবসায়ের দিক চিন্তা করে একজন ‘জাত প্রতিভাকেই খুঁজে পেয়েছিলেন। আর সেই প্রতিভাধর মানুষটি গিরিশচন্দ্র।

একা গিরিশচন্দ্র নন, তাঁর অনুগামীরাও এলেন প্রতাপ জহুরীর থিয়েটারে। আর এঁদের প্রথম নাটক হলো কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার রচিত ‘হামির’ নাটক। এঁদের দলে ছিলেন, মহেন্দ্র বসু, অমৃত মিত্র, অমৃত বসু, বেলবাবু, মতিলাল সুর, বিনোদিনী, ক্ষেত্রমণি, লক্ষ্মী প্রমুখ আরো অনেক অভিনেতা, অভিনেত্রী। এঁরা সকলেই গিরিশচন্দ্রের গোষ্ঠীভুক্ত।

বস্তুতঃ এই সময় থেকেই বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে সম্ভাবনার জোয়ার দেখা দিল। সাফল্যের সঙ্গে পরের পর অনেক নাটকই অভিনীত হলো। মায়াতরু গীতিনাট্য রীতিমতো চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। যে গীতিনাট্যে বিনোদিনীর অভিনীত চরিত্রটি দস্তুর মত ‘বাহবা’ পায়।

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র‘মায়াতরু’ গীতিনাট্যে বিনোদিনীর অভি-নয় দেখে রীতিমতো মুগ্ধ হয়েছিলেন। ঋষি রাজনারায়ণও বিনোদিনীর গাওয়া গান শুনে উচ্ছ্বসিত প্রশংসাই শুধু করেননি,

বলেছিলেন, এই গান যিনি রচনা করেছেন, তিনি ব্রহ্মজ্ঞানী। গানের একটি লাইন ছিল 'পবিত্র সঙ্গীত রসে মাগও হৃদয়'।

'মায়াতরু' গীতি নাট্যের সাফল্যের পর আরো দুটি গীতিনাট্য সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হলো। 'মোহিনী-প্রতিমা' আর 'আলাদিন'—এই দুটি গীতিনাট্যের অভিনয় দর্শক মন জয় করতে সক্ষম হয়েছিল।

গিরিশচন্দ্র তখনো কেবল মাত্র অভিনেতা। তখনো তিনি নাটক রচনায় হাত দেন নি। গিরিশচন্দ্র বুঝতে পারলেন থিয়েটার রীতিমতো জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। অথচ নাটক নেই। শেষটা নিজেই নাটক রচনায় হাত দিলেন।

'আনন্দরহো' এই হলো গিরিশচন্দ্রের প্রথম নাটক। এবং বলা বাহুল্য নাটকটি তেমন বলিষ্ঠ ছিল না। প্রথম লেখার দুর্বলতা ছিল স্পষ্ট।

কিন্তু প্রতিভা কখনো চাপা থাকে না। সে তার পথ করে নেবেই। গিরিশচন্দ্র কিন্তু হতাশ হলেন না। হতাশা বলে তাঁর জীবনে কিছু ছিল না।

পরের পর, নাটক রচনা করে চললেন। বাংলা নাটকে নব জীবনের জোয়ার এলো। নাট্যরস পিপাসুরা বহু দিনে যেন নাটককে সত্যি সত্যি ভালোবাসতে শিখলো।

গিরিশচন্দ্র বাংলা নাট্কের ভগীরথ। নাটকের বন্ধন মুক্তি ঘটালেন গিরিশচন্দ্র।

যে প্রতাপ জহুরী গিরিশচন্দ্রকে নাটকের জগতে পুরোপুরি ভাবে এনেছিলেন, সেই প্রতাপ জহুরীর সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের মনোমালিন্য হলো। প্রতাপ জহুরী একজন পাকা ব্যবসায়ী আর গিরিশচন্দ্র এক সৃজনশীল প্রতিভা—দু'য়ের মিল হওয়া বাস্তবের ক্ষেত্রে অসম্ভব।

গিরিশচন্দ্র ন্যাশনাল থিয়েটার ছেড়ে চলে এলেন। কিছুদিন চুপচাপ বসে রইলেন। কিন্তু বসে থাকা কি তাঁর পক্ষে সম্ভব।

এবারেও এক অবাঙালী যুবকের সাহায্য পেলেন গিরিশচন্দ্র। গুর্মুখ রায় নামে একজন পাঞ্জাবী যুবক এগিয়ে এলো থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করতে। গিরিশচন্দ্রের সহযোগিতায় করলেন 'স্টার' থিয়েটারের পত্তন। এখানে একটা কথা বলা দরকার, বিনোদিনীর রূপ-লাবণ্যে মুগ্ধ হয়েই পাঞ্জাবী যুবক থিয়েটার প্রতিষ্ঠার সংকল্প করেন। এমন কি তিনি এই থিয়েটারের সঙ্গে 'বিনোদিনী' নাম যুক্ত করে 'বিনোদিনী থিয়েটার' রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র তা হতে দেন নি। থিয়েটারের নাম হলো 'স্টার' থিয়েটার।

আর এই 'স্টার' থিয়েটারের পাদ প্রদীপের আলোয় বাংলা নাটক নতুন করে অভিষিক্ত হলো।

বাংলা নাটক এবং মঞ্চে এলো নতুন যুগ। সে যুগ গিরিশ-চন্দ্রের।

আর গিরিশচন্দ্রই বাংলা নাট-মঞ্চের জনক।

॥ বাংলা নাটকের স্বর্ণযুগ ॥

(১৮৫৮—১৯১৯)

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের প্রারম্ভেই বাংলা রঙ্গ-মঞ্চের বয়স পঞ্চাশোর্ধ্বে চলে গেছে। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে এর সাফল্য লাভ অতি সামান্যই। এই কয় বৎসরে যে সকল স্বল্পায়ু বেসরকারী থিয়েটার' একের পর এক আত্মপ্রকাশ করেছিল তারা দেশে একটা ধারাবাহিক নাট্য ঐতিহ্য সংস্থাপনে সাফল্য লাভ করতে পারেনি। অধিক কি বলব। বাংলা নাটকের কোন তালিকাও তখনও পর্য্যন্ত ছিল না। উনবিংশ শতাব্দির ষষ্ঠ দশকের শেষ ভাগে কিছুটা পরিবর্তন এসেছিল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় নাট্য প্রচেষ্টার আবির্ভাব অতি আকস্মিক ভাবেই ঘটেছিল। ইহারই ফলস্বরূপ শুধু মাত্র কয়েকটি অত্যন্ত সফল রঙ্গমঞ্চেরই সৃষ্টি হয় নাই, বাংলাদেশে প্রকৃত নাট্য সাহিত্য সৃষ্টিতে ইহা বিশেষ রকম সহায়তা করেছিল। এই সময়ের পূর্বে কয়েকটি মাত্র ক্ষুদ্র পুস্তকই এর পূর্বাভাস সূচিত করেছিল। কিন্তু ১৮৫৬ সালে (কোন ঐতিহাসিকের মতে ১৮৫৭ সাল) রাম-নারায়ণ তর্করত্ন লিখিত মূল বাংলা নাটক 'কুলীন কুল সর্বস্বর অভিনয় তৎকালীন বিভিন্ন সংবাদ পত্রে বাংলা সাহিত্যে সৃষ্টিধর্মী ভবিষ্যৎ,পথনির্দেশক এক মৌলিক নাটকরূপে অভিনন্দিত হয়েছিল। আশা করা গিয়েছিল যে ইহা বাংলা মৌলিক নাট্যাভিনয়ের এক নব দিগন্ত উন্মোচন পূর্বক তদ্বারা বাংলা নাট্য প্রচেষ্টার পথ প্রস্তুত করবে।

কিছু সংখ্যক অত্যুৎসাহী নাট্য রসিকের অনুপ্রেরণা ও উৎসাহে সমগ্র শহরে বহু শখের থিয়েটারের দল গজিয়ে ওঠে এবং তাদের

প্রচেষ্টায় ১৮৫৪ সালে বেলগাছিয়া থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা হয়। এইটাই এ যুগের শ্রেষ্ঠ সাফল্য বলে বিবেচিত হয়েছিল। ইহাই নিঃসন্দেহে প্রারম্ভিক বাংলা নাট্যাভিনয়ের উজ্জ্বলতম সাফল্যের নিদর্শন। এই থিয়েটার পাইক পাড়ার রাজা প্রতাপ চন্দ্র সিংহ ও তদীয় ভ্রাতা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ কর্তৃক স্থাপিত হয়েছিল। এই প্রতিষ্ঠানকে এঁরা শুধু বদান্যতা ও উৎসাহ দ্বারাই সাহায্য করেন নি, এর সংগঠন কার্য্যেও তাঁরা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ইংরাজি শিক্ষিত কতিপয় ব্যক্তির গভীর উৎসাহের ফলেই নাটকগুলি মঞ্চস্থ করা সম্ভব হয়েছিল। এঁদের মধ্যে স্যার যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর, কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলী, গৌরদাস বসাক ও বিখ্যাত কবি মাইকেল মধুসূদনের মত ব্যক্তিরাও ছিলেন। এই কেশব চন্দ্র গাঙ্গুলীই এই সংস্থার নাট্য পরিচালক ছিলেন এবং স্বাভাবিক নাট্য প্রতিভা গুনে বাংলা রঙ্গ-মঞ্চের গ্যারিক নামে অভিহিত হয়েছিলেন। রামনারায়ণ সংস্কৃত থেকে রত্নাবলী নাটক বাংলায় রূপান্তরিত করেছিলেন এই নাট্য-মঞ্চের উদ্বোধন দিনে অভিনয়ের জন্য। বেলগাছিয়া রাজাদের বাগান বাড়ীতে এক অতি সুন্দর স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ নির্মিত হয়েছিল। এই রঙ্গমঞ্চে শহরের তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ ইউরোপীয় মঞ্চসজ্জা রচনা কারীদের দ্বারা নানাপ্রকার মঞ্চ কলা কৌশল প্রযুক্ত হয়েছিল। বাবু ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী এবং বাবু যদুনাথ পাল কর্তৃক মৌলিক রাগ রাগিনীর সংমিশ্রণে এক ব্যক্তিগত বাদ্যসংস্থা রচিত হয়েছিল। এই অভিনয়ে রাজাদের সেই সময় ১০,০০০ টাকা খরচ হওয়াটা—একটা অকল্পনীয় ব্যাপার।

বাংলার তৎকালীন ছোটলাট স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিডে পরিবার-বর্গসহ এই অভিনয় দেখেছিলেন। মাইকেল মধুসূদন এই নাটকের একটা ইংরাজী সংক্ষিপ্তসার ইউরোপীয় দর্শকদের বোধগম্যতার জন্য প্রস্তুত করেছিলেন।

কয়েকজন বিখ্যাত লোক যাঁরা পরে প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন,

তাঁরা হলেন বাবু প্রিয়নাথ দত্ত, কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলী, ক্ষেত্রমোহন গোঁসাই, এবং মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর যিনি এই নাটকে সঙ্গীত শিক্ষকের কাজ করেছিলেন।

এই নাটক সম্বন্ধে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত "সংবাদ প্রভাকরের" একজন পত্র লেখকের নিকট হতে আমরা জানতে পারি যে শহরের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি বিগত শনিবারে এই রত্নাবলী নাটকের অভিনয় দেখে ছিলেন। এঁদের মধ্যে মহামান্য ছোটলাট বাহাদুর স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিডে, মিঃ হিউম, ডাঃ গোপাল চক্রবর্ত্তী, রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, বাবু রামগোপাল ঘোষ, এবং প্রিয়চন্দ্র মিত্র, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রভৃতি ছিলেন এবং এ ছাড়া শহরের ইউরোপীয় ও ভারতীয় গুণী-জ্ঞাণী ব্যক্তিদের এক বিরাট দল ছিল।

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রত্নাবলীর অভিনয় এতাবৎ কালের ভারতীয় নাট্যাভিনয়ের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করেছিলেন। রত্নাবলীর অভিনয় সাফল্য মাইকেল মধুসূদন দত্তকে নাটক লিখতে প্রেরণা-জুগিয়েছিল। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর স্মৃতিগ্রন্থে লিখেছিলেন যে মাইকেল মধুসূদন ১৮৫৬ সালে মান্দ্রাজ থেকে প্রত্যাবর্তন পূর্বক কলিকাতা পুলিশ কোর্টে একটি চাকরী গ্রহণ করেছিলেন। হিন্দু কলেজের তাঁর কতিপয় সহকর্মী ছাড়া এ খবর কলকাতার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের অনেকেই জানতেন না। তাঁর পুরাতন বন্ধুদের একজন গৌরদাস বসাক তাঁকে বেলগাছিয়া থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা পাইক পাড়ার রাজাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। এঁরা তাঁকে শর্ম্মিষ্ঠা নামে একখানি পৌরাণিক নাটক ইউরোপীয় ষ্টাইলে নাট্যকলা কৌশল প্রয়োগ পূর্বক লিখতে অনুরোধ করলেন। এ একটি সত্য ঘটনা যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত বেলগাছিয়া থিয়েটারের জন্যই শর্ম্মিষ্ঠা নাটক লিখেছিলেন এবং এঁরাই ৩রা সেপ্টেম্বর ১৮৫৯ সালে তাঁদের নিজেদের ব্যয় বহুল রীতিতেই এই নাটকের অভিনয় করেছিলেন। এ বইয়ের

ছয়টি অভিনয় হয়েছিল এবং শেষ অভিনয় হয় ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৮৫৯ সালে। তৎকালীন ছোটলাট বাহাদুর জে, পি, গ্রান্ট তাঁর অনুচরবর্গ ও পাটনার মুন্‌সী আমির আলি, বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র, এবং আরও অন্যান্য অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ সেই অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন। বেলগাছিয়া থিয়েটারে এইটাই শেষ অভিনয় কারণ ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের অকাল মৃত্যুতে ২৯শে মার্চ ১৮৬১ সালে এই থিয়েটার বন্ধ করতে হয়।

'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ের রোঁ' নামে —১৮৬০ সালে মাইকেল পরপর সম্ভ্রান্ত দুইখানি প্রহসন রচনা করেন, প্রথম বইটির বিষয় বস্তু আমাদের সমাজের ইংরাজি শিক্ষিত তরুণদের দ্বারা সদ্য প্রবর্তিত মদ্যপান অভ্যাসের কুফল নিয়ে আলোচনা। দ্বিতীয় বইটির বিষয় বস্তু ধর্মের নামে নিষ্ঠুর প্রতারণা, নৈতিক শৈথিল্য এবং নানাপ্রকারের প্রতারণামূলক ব্যবহার, যার নায়ক এই সকল ব্যাপারে পুরাদস্তুর অংশীদার এক ব্যক্তি। এ সকলই আমাদের তৎকালীন সমাজের জীবন্ত চিত্র এবং কবির কৃতিত্বের পরিচয় হিসাবে এটা স্বীকৃত যে এই সকল নাটকের চরিত্র ও ব্যবস্থাপনাগুলি আদৌ অতিরঞ্জিত নয়, বরং বাস্তব এবং এদের রুচি উচ্চাঙ্গের।

ইহা সত্য যে মধুসূদন বাস্তব জীবন থেকেই এই সকল চরিত্রের রূপ দিয়েছিলেন। এই চরিত্র সকলের ভিতর দিয়ে তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত তার সময়ের কয়েক ব্যক্তির চরিত্রাঙ্কন করেছিলেন। ঐ একই বছরে "প্যারিসের বিচার" নামক গ্রীক্ গল্পের অনুসরণে পদ্মাবতী নামে আর একখানি নাটক রচনা করেছিলেন। এতে উচ্চাঙ্গের রচনাশৈলী ছিল না। অপরপক্ষে অনেক সমালোচকের মতে মধুসূদন এই নাটক রচনায় রীতিমত ব্যর্থ হয়েছিলেন কিন্তু এই বইয়ের একটা সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য ছিল। মাইকেল মধুসূদন এই নাটকেই সর্বপ্রথম হাতে কলমে পরীক্ষার

জন্য অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন করেন। তিনি এই মত পোষণ-করতেন যে তখনকার দিনের অভিনেতাদের মুখে অমিত্রাক্ষর ছন্দ সঠিকভাবে উচ্চারিত হতো না এবং শ্রোতৃবর্গও এই নতুন ধরণের ছন্দোবদ্ধ ভাষা অনুধাবন করতে পারতেন না। মধুসূদন আরও একটি নাটক লিখেছিলেন কিন্তু এই নাটকে তিনি পুনরায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেন নি। এই পরোবর্তী নাটক ছিল কৃষ্ণকুমারী যা কর্ণেল জেমস্ টড্ লিখিত রাজস্থানের গল্পাবলম্বনে রচিত। বাংলার নাট্য ইতিহাসে এইটাই প্রথম ঐতিহাসিক নাটক-রচনা প্রচেষ্টা এবং এই ধরণের সর্বপ্রথম বিয়োগান্ত নাটক প্রাচীন বিশুদ্ধ ভাষালঙ্কারে সমৃদ্ধ। এই নাটকে মধুসূদন আমাদের সাহিত্যে সম্পূর্ণভাবে পাশ্চাত্য নাট্যকলা-কৌশল প্রয়োগ করেন এবং এটি মধুসূদনের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক বলে অভিনন্দিত হয়েছিল এবং নাট্য সমালোচকদের দ্বারা এখনও বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নাটকের অন্যতম বলে বিবেচিত। ১৮৭১ সালে এই নাটক রচিত হয়েছিল। অতএব আমরা দেখতে পাই যে উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে মাইকেল একবারের চেষ্টাতেই তাঁর এই নাটকটিকে সুষ্ঠু সাহিত্যের পর্যায়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। যখন তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য লেখকেরা শুধু গল্পের পর্যায়ে রচনা করেছিলেন, তাও আবার কখনও কখনও অসামঞ্জস্য রচনা বলে মনে হয়েছে।

পরবর্ত্তী বিরাট পুরুষ যিনি সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন এবং যাঁর খ্যাতি এবং সুনাম সাহিত্যক্ষেত্রে চির অম্লান থাকবে তিনি হলেন রায় বাহাদুর দীনবন্ধু মিত্র। কারণ তিনি বাঙলায় একটি স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠায় বেশ কিছুটা সহায়তা করেছিলেন। তৎপরবর্তী কালে এমন কি গিরিশ চন্দ্র ঘোষ যিনি বঙ্গ রঙ্গ মঞ্চের জনক বলে অভিহিত তিনি 'শাস্তি কি শান্তি' নামে নাটক লিখে দীনবন্ধু বাবুর নামে উৎসর্গ করার সময় তাঁকে লিখেছিলেন—মহাশয়, বঙ্গ রঙ্গ মঞ্চ প্রতিষ্ঠা করতেই আপনি জন্মেছিলেন। যদি আপনার

নাটকগুলি না থাকত তাহলে যুবক সম্প্রদায় "ন্যাশনাল থিয়েটার" আরম্ভ করতেই সাহস পেতো না। এই কারণে আমি আপনাকে বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে আমার সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাই। ১৮৬০ সালে দীনবন্ধু মিত্র নীলদর্পণ নাটক লিখেছিলেন এবং এই বই প্রকাশিত হবার পর ডিসেম্বর ১৮৭২ সালে বাংলার সাধারণ রঙ্গ মঞ্চের দ্বার জন সাধারণের নিকট উন্মোচিত হয়। এই নাটকখানি বাংলার সাহিত্য ও রাজনীতি ক্ষেত্রে এক আলোড়ন তুলেছিল। দুখানি 'সিরিয়াস' নাটক ছাড়া তিনি সাতখানি নাটক লিখেছিলেন, এগুলো সবই ব্যঙ্গ নাটক এবং প্রহসন। যদিও তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্তের কাছ থেকে তাঁর কয়েকটি ব্যঙ্গ নাটক এবং প্রহসন লিখবার প্রেরণা লাভ করেছিলেন, 'নীলদর্পণ'ই তাঁর সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রচনা। তথাপি তিনি এক অননুকরনীয় ষ্টাইলের অধিকারী ছিলেন' বিশেষ করে পল্লী বাংলার ব্যক্তি চরিত্র চিত্রনে। নীলদর্পণের মামলা মোকদ্দমায় জড়ান এক বিচিত্র ইতিহাসে আছে শাসক বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের দারুণ রোষ অসন্তোষ ও আদালত কর্তৃক শাস্তি প্রদান, কিন্তু জনসাধারণ এবং সংবাদপত্র সমূহ কর্তৃক ইহা জাতীয়তাবোধের প্রেরণা দায়ক বলে অভিনন্দন ইত্যাদি।

'নীলদর্পণে' লেখক যে সকল চরিত্র চিত্রণ করেছেন, তাদেরকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। একটি উচ্চ শ্রেণী অর্থাৎ তাতে সমাজের সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর লোকেরা আছেন, এবং অন্যটিতে আছেন সমাজের নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা। এই নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা অধিকাংশই হলেন রায়ত এবং তাদের পরিবারবর্গ। এই শেষোক্ত শ্রেণীর চরিত্র যা লেখক সৃষ্টি করেছেন, তারা সর্ব বিষয়ে অতুলনীয়—তাদের কথাবার্তা আলাপ আলাপন, হাবভাব, ব্যবহার ইত্যাদি দৃশ্যগুলি সবই বাংলার পল্লী জীবন থেকে নেওয়া এবং সাহসিকতাপূর্ণ পরিচ্ছন্ন ও পূর্ণাঙ্গ। উচ্চশ্রেণীর চরিত্রগুলি সবই প্রচলিত সামাজিক প্রথানুযায়ী বিশেষ করে তাদের সাহিত্য সম্মত কেতাবী কায়দায় বচন ভঙ্গীতে তারা

দৃঢ় চরিত্রের বিশেষ করে তাদের কথাবার্তা ও বচন ভঙ্গীতে তারা দৃঢ়চেতা। যাহা হউক, এই নাটকের অবস্থিতিস্থান খুবই সুন্দর এবং এটা নীলচাষ কর্তাদের স্বভাব চরিত্র ও রায়তদের প্রতি তাদের ব্যবহার, আচরণের ফলশ্রুতি ইত্যাদিতে একটা দলিল সম্মত কাহিনী চিত্র। নীলদর্পণের পরে তিনি লেখেন 'নবীন তপস্বিনী' ১৮৬৩ সালে এবং "বিয়ে পাগলা বুড়ো" ১৮৬৬ সালে। ঐ একই বছরে তিনি লেখেন "সধবার একাদশী"—এই সময়ের আর একটি উল্লেখযোগ্য ব্যঙ্গ নাটক। এই পুস্তকে দীনবন্ধু মধুসূদনের ১৮৬০ সালে প্রকাশিত "একেই কি বলে সভ্যতা" থেকে প্রেরণা পেয়েছিলেন এবং কিছু সুবিধাও গ্রহণ করেছিলেন। আর একটি মিলনান্ত নাটক এই লেখক কর্তৃক লিখিত হয়েছিল ১৮৬ (?) খৃষ্টাব্দে।

আমরা এখন নিরাপদে নাটুকে রামনারায়ণ থেকে দীনবন্ধু পর্যন্ত এবং মধুসূদনের দ্বারা বাংলা নাটকের যে ক্রমোন্নতি হয়েছে তার একটা হিসাব করতে পারি। ১৮৬৫ থেকে ১৮৬৭ পর্যন্ত কিছু কিছু ছোটখাট নাট্যকারের আবির্ভাব ঘটেছিল। এই সময় পর্যন্ত বাংলা নাট্য সাহিত্য সামাজিক ব্যঙ্গ চিত্র ও বাস্তবধর্মী প্রহসন ও হাস্য রসাত্মক নাটক নিয়েই প্রসার লাভ করেছিল। কিছু কিছু পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক নাটকও তার মধ্যে মাঝে মাঝে এসে পড়ত। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে বাবু মনোমোহন বসু যিনি কবি হিসাবে সংগীত রচনায় সুনাম অর্জন করেছিলেন।—'রামাভিষেক' নামে ভক্তিমূলক ও করুণ রসাত্মক গীত বহুল একখানি পৌরাণিক নাটক লিখেছিলেন। এই বই সমগ্র নাট্য প্রবাহের গতি একেবারে পাল্টে দিয়েছিল। ইতিপূর্বে নাটক রচিত হতো পাশ্চাত্য নাট্য কলাকৌশল অবলম্বনে এবং তার প্রভাব অল্প সংখ্যক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ ছিল। এই বই এক বৃহৎ সংখ্যক সাধারণ দর্শককে নাট্যরস পিপাসার্থ উৎসাহিত করেছিল। তিনি অনেক পৌরাণিক নাটক

লিখেছিলেন তার মধ্যে রামাভিষেক নাটক, সতী নাটক এবং হরিশ্চন্দ্র নাটক সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বলতম রত্ন ছিল। তিনি অবশ্য দুই খানি সামাজিক নাটকও লিখেছিলেন কিন্তু তা খুব জনপ্রিয় হয় নাই। বেলগাছিয়া থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা থেকে উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলার সামাজিক জীবনে নাট্য রসানুসন্ধানের যে উৎসাহ উদ্দীপনার স্রোত প্রবাহিত হয়েছিল, তার থেকে আরও অনেক শখের থিয়েটার পার্টি জন্মলাভ করেছিল। বিদ্যোৎসাহিনী সভা ছাড়াও একটি সাহিত্য ও নাট্য বিষয়ক সঙ্ঘ বিখ্যাত লেখক কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

বেলগাছিয়া থিয়েটারের পরে, স্বনামধন্য সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারক বাবু কেশব চন্দ্র সেনের সাংগঠনিক প্রচেষ্টায় মেট্রোপলিটান থিয়েটার ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বিধবা বিবাহ নাটক মঞ্চস্থ করেন। হ্যামলেট ও অন্যান্য নাটকও থিয়েটারের দল কর্তৃক অভিনীত হয়েছিল। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর "পাথুরিয়াঘাটা থিয়েটার" প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে শোভাবাজারের থিয়েটার পার্টি আরম্ভ হয়েছিল মাইকেল মধুসূদন দত্তের "একেই কি বলে সভ্যতা" দিয়ে। এই থিয়েটার পার্টির কার্যকরী সমিতির সভাপতি ছিলেন আর কেহ নহে, সুবিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁরা মাইকেল মধুসূদনের ঐতিহাসিক নাটক "কৃষ্ণ কুমারী" অভিনয় করেছিলেন। এই নাটকের অভিনয় হিন্দুদেশপ্রেমিকগণ কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিল এবং এই নাটক মৌলিক এবং এতাবৎ কালের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক বলে অভিনন্দিত করেছিলেন। বাবু প্রিয় লাল চ্যাটার্জী, এবং বাবু প্রিয় মাধব বসুর মত অভিনেতাও এই নাটকে অভিনয় করেছিলেন।

আমরা এবার বাবু গুনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং যতীন্দ্র নাথ ঠাকুর কর্তৃক সংগঠিত জোড়াসাঁকো থিয়েটারের দিকে দৃষ্টিপাত করি।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে এখানে তাঁরা রামনারায়ণ তর্করত্ন কর্তৃক রচিত নবনাটকের অভিনয় করেন। এর বিষয়বস্তু ছিল তৎকালীন সমাজে প্রচলিত হিন্দু বহু বিবাহ প্রথা। সৌভাগ্য বশতঃ এই থিয়েটারের দল সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা অক্ষয়কুমার মজুমদারকে গবেশবাবুর ভূমিকায় পেয়েছিল। বাবু অর্ধেন্দু শেখর মুস্তফী এই নাটকের অভিনয় দেখে এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তিনি বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যে নাটকের এই অভিনয় তাঁকে অভিনয় সম্বন্ধে যা কিছু শেখবার, দেখবার এবং শুনবার, তা সবই শিখিয়েছে। কলকাতায় বিশেষ করে সংখ্যায় অধিক বাঙ্গালী অধ্যুষিত এলাকায় আরও অনেক থিয়েটার গজিয়ে উঠেছিল। বাগবাজার থিয়েটার নামে এরূপ একটি শখের থিয়েটারের দল পরে যার নামকরণ হয়েছিল শ্যামবাজার থিয়েটার দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' মঞ্চস্থ করেছিল ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে। এতে অনেক সুদক্ষ অভিনেতা অংশ গ্রহণ করেছিলেন। যারা পরে অভিনয়ে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এবং এই লাইনে এক একটি দিকপাল পরিগণিত হয়েছিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন স্বনামধন্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ যিনি প্রধান চরিত্র নিমচাঁদের ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং আরও নানা ভূমিকায় অন্যান্য অভিনেতাদের শিক্ষা দান করেছিলেন। আর ছিলেন বাবু নগেন্দ্র নাথ মুখার্জী, অর্ধেন্দু শেখর মুস্তফী, নীলকমল গাঙ্গুলী, অমৃত লাল মুখার্জী (বেলবাবু) রাধামাধব কর এবং আরও অনেকে। সেইদিনের অভিনয়ে গিরিশচন্দ্র কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি সারদা চরণ মিত্রের মনে যে ছাপ দিয়েছিলেন, সে সম্বন্ধে বিচারপতি মিত্র পরে লিখেছিলেন—বহু ইংরাজি সংস্কৃত এবং বাংলা নাটক আমি সযত্নে পাঠ করেছি তার কতকগুলি কোন প্রকারে আমার স্মরণে আছে, কতকগুলি মন থেকে মুছে গেছে। এবং এই এক যুগ পরে অনেক আমি ভুলে গেছি কিন্তু একটা জিনিষ আমি জীবনে কখনও ভুলিব না সে হচ্ছে সেই রাত্রের নিমচাঁদের ভূমিকায় জীবন্ত

অভিনয়। যার সম্বন্ধে রসরাজ অমৃতলাল বসু বিখ্যাত গিরিশ চন্দ্রের মৃত্যুর পরে লিখেছিলেন –

মদে মত্ত পদ টলে
নিমে দত্ত রঙ্গস্থলে
প্রথম দেখিল বঙ্গ
নবনটগুরু তার (১৩৩২ সাল)

এই নাট্য সংস্থা দীনবন্ধুর 'লীলাবতী'র অভিনয় করেন বিরাট সাফল্যের সঙ্গে মে মাসে, ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে। এতে গিরিশচন্দ্র প্রধান ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেন। গ্রন্থকার গিরিশচন্দ্রের অসাধারণ অভিনয়ে এত প্রীত হয়েছিলেন যে তিনি (গ্রন্থকার) আনন্দের আবেগে তাঁকে বক্ষে জড়িয়ে 'ধরে বলেছিলেন—'আমি জানতাম না যে আমার ছন্দায়িত ভাষা এমন সুন্দর করে পড়া যেতে পারে।"

একই বছরে কলকাতার সাধারণ থিয়েটারের দরজা জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী তাঁর বাংলা নাটকের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে সাধারণ রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে লিখেছিলেন "বিগত শতাব্দীর ষষ্ঠ দশক থেকেই আমরা খবরের কাগজ থেকে যে সাক্ষ্য প্রমাণ পাই তাতে দেখা যায় যে একটা সাধারণ রঙ্গালয়ের জন্য ক্রমবর্ধমান চাহিদা রয়েছে। এই সাফল্যের কৃতিত্ব উত্তর কলকাতা অথবা বাগবাজারের যুবকসম্প্রদায়ের প্রাপ্য। তারা একটা শখের নাট্য সমিতি খুলে দিয়েছিল এবং এটাকে একটা সাধারণ রঙ্গ মঞ্চে রূপান্তরিত করার কথা চিন্তা করেছিল। একটা জাতীয় নাট্য শালার প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছিল। একজন বিখ্যাত লোক অবশ্য এতে সায় দেন নি। তিনি গিরিশচন্দ্র ঘোষ। তিনি যুক্তি দেখিয়েছিলেন বাংলায় সঠিকভাবে জাতীয় নাট্যশালা করার এবং তাকে সজ্জিত করার মত অর্থ সঙ্গতি নেই।

এটা খুব শোভন হবে না এইনামে রঙ্গালয় নির্মাণ করে তাতে জনসাধারণের কাছে টিকিট বিক্রী করা। অন্যেরা অবশ্য এই

উপদেশ শুনতে প্রস্তুত ছিলেন না। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে গিরিশচন্দ্র দলত্যাগ করলেন এবং একাকী পৃথকভাবে কাজ চালাতে লাগলেন। এই প্রকারে জাতীয় নাট্যশালা ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর আত্ম-প্রকাশ করল, কোন পরিচালক বা অধিকর্তা ব্যতীতই। পরিশেষে গিরিশচন্দ্র ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে এই থিয়েটারে যোগদান করেন এবং কখনও কখনও সুযোগ সুবিধামত মঞ্চেও অবতীর্ণ হতেন।

টিকে থাকার জন্য, কলকাতার সাধারণ রঙ্গমঞ্চ রামনারায়ণ থেকে মনোমোহন বসু পর্যন্ত তৎকালীন নাট্যকারদের পুরাতন নাটক মঞ্চস্থ করতে লাগলেন। তখন নতুন নাটকের অভিনয়ের তাগিদ সত্বেও, কর্মকর্তারা কোন নতুন নাট্যকারের সন্ধান পেলেন না। যদিও কিছু কিছু ছোটখাট নাট্যকার অতি সাধারণ নাটক নিয়ে মাঝে মাঝে উপস্থিত হয়েছিলেন। কাজেই তাঁরা আরম্ভ করলেন একের পর এক বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাসগুলির নাট্যরূপ দিতে। তথাপি নতুন নাটকের সেই ক্রমবর্ধমান চাহিদা, নাট্য সংস্থাগুলির দ্বারা প্রশমিত হল না। তখন ন্যাশনাল-থিয়েটার, বেঙ্গল থিয়েটার ও গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার, নামে তিনটি নাট্য সংস্থা ছিল। তাঁরা কেউই নিজেদের কোন নাট্যগৃহ নির্মাণ করতে পারেন নি এবং এখানে সেখানে অভিনয় করে বেড়াতেন। তাঁরা জোড়াসাঁকো শখের থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতাদের একজন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকগুলি মঞ্চস্থ করতে লাগলেন। রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের নাটমন্দিরে তাঁর হালকা ধরণের নাটক 'কিঞ্চিৎ-জলযোগ' (১৮৭৩ সালে প্রকাশিত) অভিনীত হয়েছিল। ১৮৭৩ সালের ৩০শে এপ্রিল 'ন্যাশনাল পেপার' নামক সংবাদপত্র লিখেছিল—" শেষ জাতীয় নাট্য রঙ্গমঞ্চে (২৬শে এপ্রিল) কতকগুলি হাস্য রসাত্মক নাটক অভিনীত হয়েছিল। 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' এই প্রথম রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হ'ল। এই অভিনয় দর্শকদের কাছ থেকে থেকে ভূয়সী প্রশংসা ও অভিনন্দন লাভ করেছিল। অন্যান্য প্রহসন-গুলিও কৃতকার্যতার সহিত অভিনীত হয়েছিল।" জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

একজন পরিণত ও দক্ষ নাট্যকার ছিলেন এবং নানা শ্রেণীর—যেমন সংস্কৃত নাটক থেকে অনুবাদ এবং সেক্সপীয়রের জুলিয়াস সীজারের অনুবাদ ইত্যাদিতে ২০ খানি নাটক রচনা করেছিলেন। যদিও তাঁর বেশীর ভাগ অনুদিত নাটকই অভিনীত হয় নি। রঙ্গমঞ্চের তিনি অতি জনপ্রিয় লেখক ছিলেন। তাঁর কল্পনাসংযোজিত ঐতিহাসিক নাটকের জন্য, যেমন পুরু বিক্রম নাটক, সরোজিনী নাটক, এবং অশ্রুমতী নাটক। তিনি ঐতিহাসিক ঘটনাবৃন্দের চেয়ে আদর্শবাদীতা ও কল্পনার উপরই বেশী জোর দিয়েছিলেন। তার রচনাগুলি দর্শকদের মধ্যে যে স্বদেশপ্রেমের প্রেরণা জাগিয়ে তুলতো তার জন্য তিনি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিলেন। তিনিই প্রথম নাট্যকার যিনি বইয়ের মধ্যে স্বদেশ প্রেমের এবং লোকপ্রীতির অনুপ্রেরণার অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিলেন। তাঁর গানের একটি। যেমন—

জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ
পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা,
জ্বলুক জ্বলুক চিতার আগুন
জুড়াবে এখনই প্রাণের জ্বালা।

১৮৭৬ সালে সরোজিনী নাটক গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হয়েছিল, এবং ঐ একই বছরে একটি কবিতা হিসাবেই আবৃত্তি করা হয়েছিল,

স্বাধীনতা রত্নহারা অসহায়া অভাগা জননী
ধনমান যত পর হস্তগত
পর শিরে শোভে তব মুকুটের মণি।

রাজস্থানের ইতিহাস থেকে গৃহীত আর একটি ঐতিহাসিক নাটক যাতে মেবার এবং রাণা. প্রতাপের শেষ জীবন চিত্রিত হয়েছিল। ১৮৮০ সালে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হয়েছিল। কিন্তু তিনি জনসাধারণের গভীর মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন তাঁর

প্রথম ঐতিহাসিক নাটক পুরুবিক্রম থেকেই যা ১৮৭৪ সালের অক্টোবরে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হয়েছিল। এই অভিনয় জাতিপ্রেমের যে আলোড়ন জাগিয়েছিল তার প্রেরণা জাগিয়েছিল এই গান—

মিলে যবে ভারত সন্তান একতান মনপ্রাণ
গাও ভারতের যশোগান।
ভারত ভূমির তুল্য আছে কোন স্থান
কোন আদ্রি হিমাদ্রী সমান।

অবশ্য আরও কতকগুলি স্বল্পখ্যাত নাট্যকার ছিলেন। তাঁরা সাময়িক প্রচলিত বিষয়ের ভিত্তিতে নাটক রচনা করতেন। উপেন্দ্র-নাথ দাস রচিত গজদানন্দ নামে এই রকমের একখানি ব্যঙ্গ নাটক ১৮৭৬ সালের ৯ই ডিসেম্বর গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হয়েছিল। এই বই তৎকালীন হাইকোর্টের খ্যাতনামা উকিল জগদানন্দ মুখার্জীর অবজ্ঞা সূচক ব্যবহারের বিরুদ্ধে রচিত হয়েছিল। তিনি বঙ্গীয় আইন সভার সভ্য ছিলেন এবং তৎকালীন যুবরাজকে (প্রিন্স অব ওয়েলস্) স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করেছিলেন এবং পর্দানসীন মহিলাদের দ্বারা শাঁখ বাজিয়ে উলুধ্বনি দিয়ে রীতিমত হিন্দু প্রথায় বরণ করিয়েছিলেন। বাংলার গভর্ণমেণ্ট এই নাটকের অভিনয়ে বিশেষ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এবং এর পুনরাভিনয় যাতে না হয় তার চেষ্টা করেছিলেন। বাংলা গভর্ণমেণ্টের অনুরোধে মহামান্য বড়লাট বাহাদুর লর্ড নর্থ-ব্রুক বাংলা গভর্ণমেণ্টকে নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দিয়ে এক আইন জারি করলেন। পরিশেষে এই আধা আইনই পূর্ণাঙ্গ আইনে পরিণত হল ১৮৭৬ সালে আইন সভা কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়ে। খ্যাতিসম্পন্ন অনেক ভারতবাসী, সংবাদপত্রসমূহ, সাধারণ মানুষ অনেকেই প্রতিবাদ করলেন কিন্তু এই "বিল" আইনে পরিণত হওয়া রদ করা

গেল না। নাট্যাভিনয় সংক্রান্ত এই আইন বাংলা রঙ্গমঞ্চের উপর এক মর্মান্তিক আঘাত হানল।

অধিকাংশ নাট্যকারই সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। তাঁরা আর ইতিহাস থেকে বা সামাজিক দিক থেকে কোন সাহসিকতাপূর্ণ গল্প বা ঘটনারই নাট্যরূপ দিতে চেষ্টা করলেন না। সুতরাং পুনরায় ১৮৭৬ সালের ঐ নাট্যাভিনয় সংক্রান্ত আইন পাশ হবার জন্য ভাল নাটকের অভাব দেখা দিল। পর বৎসর অর্থাৎ ১৮৭৭ সালে আমরা দেখতে পাই প্রকাশনী তালিকা থেকে, যে মাত্র সাতখানি নাটক রচিত হয়েছে। তার মধ্যে একখানি জ্যোতিরিন্দ্র নাথ রচিত হাসির বই"এমন কর্ম আর করবনা" এবং আর দুখানি গিরিশচন্দ্র ঘোষের উদ্বোধনী নাটক 'আগমনী' ও 'অকাল বোধন'। এ দুটি নাটক গিরিশচন্দ্রের কোন রকমে চাহিদা পূরণের নাটক। তিনি আশা করেছিলেন যে আরও ভাল পূর্ণাঙ্গ নাটক পরে প্রকাশিত হবে। তারপর ১৮৭৭ সালে জুলাই মাসে তিনি গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার ইজারা নিলেন এবং এর নাম পরিবর্তন করে ন্যাশনাল থিয়েটার করলেন। তিনি মাইকেল মধুসূদনের মেঘনাদবধ, পূর্বে বেঙ্গলী থিয়েটারে যে রকম ভাবে অভিনীত হয়েছিল তার থেকে আলাদা ধরণে নাট্যরূপ দিলেন এবং কবি নবীন চন্দ্র সেনের "পলাশীর যুদ্ধের"ও নাট্যরূপ দিলেন। এই দুটি পৌরাণিক নাটকই এই সুবিখ্যাত নাট্যকারের নাট্য প্রতিভা বিকাশের পূর্ণ-পরিণতিতে পৌঁছবার প্রথম পদক্ষেপ। তিনি বিভিন্ন প্রকারের প্রায় আশিটি নাটক রচনা করেছিলেন; তার মধ্যে ছিল ঐতিহাসিক, সামাজিক, পৌরাণিক নাটক, প্রহসন, বড়দিনের তামাসা এবং যাত্রাধর্মী গীত বহুল নাটক। তিনি সর্ব প্রকারের নাটক লিখতে চেষ্টা করেছিলেন। সেক্সপীয়ারের ম্যাকবেথের নাট্যানুবাদ করেছিলেন এবং এই বই ২৮শে জানুয়ারী ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছিল। তাঁর কতকগুলি ঐতিহাসিক নাটক জনপ্রিয় হয়েছিল। সামাজিক নাটক "প্রফুল্ল" 'ষ্টার থিয়েটারে'

১৮৯৯ সালে অভিনীত হয়েছিল। এই বই এখনও পর্যন্ত বাঙ্গালী পাঠক মণ্ডলীর কাছে এক প্রিয় গ্রন্থ এবং রঙ্গমঞ্চে ও রেডিওতে আজও অভিনীত হয়ে থাকে। তাঁর ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে সিরাজদ্দৌল্লা ১৯০৫ সালে মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনীত হয়। ঐ থিয়েটারেই "মীরকাশেম" অভিনীত নয় ১৯০৬ সালে। এই দুটি সাড়া জাগান স্বদেশ প্রেমের নাটক এবং এরা বঙ্গ বিভাগ বিরোধী ও স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাংলার জনগণের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিল। কিন্তু তিনি পৌরাণিক এবং সাধু সন্তর জীবনী বিষয়ক নাটকে ছিলেন অতীব উচ্চাঙ্গের নাট্যকার। যেমন "চৈতন্য বিলাপ" "বুদ্ধদেব চরিত" এবং আরও অনেক।

পূর্বতন নাট্যকারদের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি থেকে অভিজ্ঞতা লাভ করে এবং জনসাধারণের নিকট থেকে সাড়া এবং প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভর করে গিরিশচন্দ্র তাঁর নিজের পন্থায় এই গুলিকে বেছে নিয়েছিলেন তার নাটকের মধ্য থেকে এবং পরীক্ষামূলকভাবে চালিয়ে গিয়েছিলেন যতদিন না তাঁর নাট্য রচনায় বিবর্তন ঘটেছিল এবং শেষে "গৃহলক্ষ্মী" রচনা করেছিলেন। এ বই তিনি অপূর্ণ রেখে ১৯১২ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী মৃত্যু বরণ করেন। যাহা হউক গৃহলক্ষ্মী দেবেন্দ্র নাথ বসু কর্তৃক পূর্ণনাটকে পরিণত হয়েছিল। এবং তাঁর (গিরিশ চন্দ্রের) পুত্র বিখ্যাত নট শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষের (দানীবাবু) ব্যবস্থাপনায় ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯১২ সালে অভিনীত হয়েছিল। গিরিশচন্দ্র বাংলার ভাবাবেগ অন্তঃস্থল পর্যন্ত অনুভব করেছিলেন, এবং বাঙালীর ভাবাবেগ ধ্যান ধারণা সবই তিনি অনুধাবন করেছিলেন। কাজেই তিনি বাংলার অন্তর জয় করেছিলেন এবং তা শুধু কলকাতাতেই নয়, ছোট ছোট শহর ও গ্রাম থেকে আরম্ভ করে বাঙলাদেশের সর্বস্তরের লোকের অন্তর তিনি জয় করেছিলেন কারণ তাঁর পৌরাণিক এবং ধর্মভিত্তিক নাটকের অধিকাংশই যাত্রায় রূপান্তরিত হয়েছিল এবং গ্রামে গ্রামে ঘুরে পরিবেশন

করা হয়েছিল। তিনি তাঁহার রচনায় খুব যে বাস্তববাদী ছিলেন তা নয়, বরঞ্চ আদর্শবাদীই ছিলেন এবং তাঁর নানাপ্রকার রচনার মধ্যে দিয়ে দেশবাসীকে উন্নত করবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। কাজেই সঙ্গতভাবেই তিনি বাংলা রঙ্গমঞ্চের জনক বলে অভিহিত হয়েছিলেন। তিনি শুধু যে বাংলার রঙ্গমঞ্চের সৃষ্টি এবং তার শৈশব থেকে পরিবর্ধিত ও পরিপুষ্ট করে তাকে পূর্ণাঙ্গ নাট্য সংস্থায় পরিণত করেছিলেন তাই নয়, এই নাট্যমঞ্চকে তিনি এক গৌরবোজ্জ্বল ও মহিমান্বিত পর্যায়ে উপনীত করেছিলেন তার আশ্চর্য সুন্দর নাট্য রচনার দ্বারা যা দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে বাংলার মানুষের মনের চাহিদা মিটিয়েছিল।

গিরিশচন্দ্রের সমসাময়িক এবং সহকর্মী শ্রীঅমৃতলাল বসু—সঙ্গতভাবেই যাঁর নাম দেওয়া হয়েছে রসরাজ, কিছুটা হালকা ধরণের নাটক লিখেছিলেন। গিরিশচন্দ্র নাটক লিখতে আরম্ভ করার পূর্বেই তিনি নাটক লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। বরোদার গায়কোয়াড়ের তখনকার দিনের সাড়া জাগান মোকদ্দমারঘটনা অবলম্বনে রচিত "হীরকচূর্ণ" নামে নাটক ১৮৭৫ সালে অভিনীত হয়েছিল। তিনি ত্রিশটিরও বেশী নাটক রচনা করেছিলেন। এগুলির অধিকাংশই ছিল তামাসা, হাস্যোদ্দীপক নাটক, প্রহসন, আমোদজনক নাটক, এবং কিছু গাম্ভীর্য পূর্ণ বইও ছিল। তাঁর নাটকের সবচেয়ে ভাল বই "খাসদখল" ষ্টার রঙ্গমঞ্চে ১৯১২ সালে অভিনীত হয়েছিল। পুরাতন রঙ্গমঞ্চের রসিকরা এখনও হয়ত মনে রেখেছেন। তিনি যে শুধু একজন গুণী নাট্যকার ছিলেন তাই নয়, বিখ্যাত অভিনেতা এবং পরিচালকও ছিলেন। বই মঞ্চস্থ করার পূর্বে সে বিষয়ে তার সতর্ক সযত্ন প্রস্তুতি পুরাতন অভিনেতা ও দর্শকদের সমভাবে মনে থাকবে। তিনি ১৯২৯ সালে পরলোকগমন করেন।

গিরিশচন্দ্রের সমসাময়িক আর একজন বিশেষ প্রতিভা সম্পন্ন নাট্যকার ছিলেন রাজনারায়ণ রায়। তিনিও অসংখ্য পৌরাণিক নাটক রচনা করেছিলেন, যার অনেকগুলিই বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হয়েছিল। তার রচনার মধ্যে প্রহ্লাদ চরিত্রই সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল রত্ন। তিনি নাটক রচনা করতে আরম্ভ করেছিলেন ১৮৭৫ সালে এবং ১৯২৯ সালে পরলোকগমন করেন।

আমাদের বিশ্ববিশ্রুত কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৮৮১ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত নাটক লিখেছিলেন। তাঁর অতুলনীয় ও অনন্নুকরনীয় ভঙ্গীতে তিনি আরও অনেক নাটক লিখেছিলেন। ১৭ই জুন ১৮৯০ সালে তাঁর "রাজা ও রাণী" সাধারণ রঙ্গমঞ্চ এমারেল্ড থিয়েটারে অভিনীত হয়েছিল। তাঁর অনেক নাটক এবং নাট্যকারে রূপায়িত উপন্যাস পরবর্তী শতাব্দীতে অভিনীত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের পরে পণ্ডিত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদের নাম সার্থক নাট্যকার হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর নাটক রচনাকাল ১৮৯৪ থেকে ১৯২৬ পর্যন্ত। তাঁর অনেক ছোট নাটকের মধ্যে গীতবহুল নাটক 'আলিবাবা'—যা এ্যারাবিয়ান নাইটের গল্প অবলম্বনে লেখা—বাবু অমরেন্দ্রনাথ দত্তের ক্লাসিক থিয়েটারে ২৮শে নভেম্বর ১৮৯৭ সালে অভিনীত হয়েছিল। এটা চির নতুন নাটক হিসাবে অভিনন্দিত হয়েছিল। তাঁর শ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় নাটকের মধ্যে প্রতাপাদিত্য ষ্টার রঙ্গমঞ্চে ১৫ই আগষ্ট ১৯০৬ সালে অভিনীত হয়েছিল। তিনি অবশ্য আরও অনেক নাটক লিখেছিলেন।

যে নাট্যকার উনবিংশ শতাব্দী এবং বিংশ শতাব্দীর নাটকের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট পার্থক্যের নিশানা টেনেছিলেন তিনি হলেন দ্বিজেন্দ্র লাল রায় যার জনপ্রিয় নাম ডি, এল, রায়। তিনি একজন বিরাট আদর্শবাদী এবং কবি। তিনি তাঁর কল্পনাগুলিকে এমনই এক ধরণের কথোপকথনে রূপান্তরিত করেছেন, যা বাংলা সাহিত্যে এক

সম্পূর্ণ নতুন জিনিষ। যখন তিনি ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে "কল্কী অবতার" নামে হাস্য রসাত্মক বই লিখে নাটক লেখার সূত্রপাত করেন, তখনই দেখা গেল যে তিনি একজন নিপুণ নাট্যকার হিসাবেই আত্মপ্রকাশ করেছেন। তাঁর দ্বিতীয় প্রহসন 'বিরহ' ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ষ্টার থিয়েটার মঞ্চে অভিনীত হয়। তাঁর প্রথম ঐতিহাসিক নাটক 'তারাবাঈ' ১৯০৩ সালে ইউনিক থিয়েটার কর্তৃক অভিনীত হয় এবং বেঙ্গল থিয়েটার প্যাভিলিয়ন কর্তৃক ঐ একই বছরে অভিনীত হয়। কিন্তু সত্যিকার ঐতিহাসিক নাটক "রাণাপ্রতাপ" ২২শে জুলাই ১৯০৫ সালে 'ষ্টার' থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়। এ নাটক রীতিমত সাড়া জাগিয়েছিল। তাঁর 'দুর্গাদাস' প্রকাশিত হয় ১৯০৬ সালে, 'নূরজাহান' এবং 'মেবার পতন' ১৯০৮ সালে 'সাজাহান' ১৯০৯ এবং চন্দ্রগুপ্ত ১৯১১ সালে প্রকাশিত হয়। নাটকগুলি মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। তিনি আরও অনেক নাটক লিখেছিলেন কিন্তু তাঁর ঐতিহাসিক নাটকই বিশেষ করে সাজাহান এবং চন্দ্রগুপ্ত নাটকই সাফল্য ও খ্যাতি অর্জন করেছিল। শেষোক্ত নাটক দুটি এখনও বেশ জনপ্রিয় রয়েছে। তিনি ১৯১৩ সালে পরলোকগমন করেন। তাঁর লেখার ধরণ এবং নাট্য রচনাশৈলী নাট্যরস পিপাসুদের ও উঠতি লেখকদের মন জয় করেছিল। এই লেখকরা তার ধরণ রীতিনীতি তাদের নব নাটক রচনায় অনুকরণ করবার চেষ্টা করেছিলেন। এই সকল ঐতিহাসিক নাটক নানা সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছিল। এমন কি ১৯১২ সালে গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পরেও তাদের চাহিদা ছিল। এর পর নাট্য সাহিত্যে বিরাট পুরুষ আর কেউই রইলেন না, কারণ গিরিশচন্দ্রের পূর্ববর্তী এবং সমসাময়িক সকলেই তাঁর পূর্বেই পরলোক গমন করেছেন, শুধুমাত্র নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসু ছাড়া। তখন তিনি খুবই বৃদ্ধ। তারপর ১৯১৬ সালে সুপ্রসিদ্ধ জনপ্রিয় অভিনেতা শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত পরলোকগমন করেন। এরপর বাংলা রঙ্গমঞ্চ এক বিশেষ দুরাবস্থায় পতিত হইল। শুধুমাত্র শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ

(দানীবাবু) ছাড়া রঙ্গমঞ্চ পরিচালনা করার মত কোন শক্তিশালী নট তখন ছিলেন না। দ্বিতীয় শ্রেণীর নাটক অভিনয় দ্বারা যে জয়মাল্য লাভ করা সম্ভব তা সবই তিনি লাভ করেছিলেন। অবশ্য এ নাটকগুলি দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের নকলে কিছু স্বাদ সঞ্চার করেছিল মাত্র।

এক বিরাট নট দানীবাবু ছাড়া আরও কিছু খ্যাতনামা অভিনেতা এখানে সেখানে নানা রঙ্গালয়ে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু প্রতিভাময়ী শ্রীমতী তারাসুন্দরী তখনও ছিলেন অস্তমিত-প্রতিভা। পূর্ণ-গৌরবেই তিনি তখনও নাট্যমঞ্চে। দুই অভিজ্ঞ নাট্যকার অমৃতলাল এবং ক্ষীরোদপ্রসাদ তখনও জীবিত ছিলেন, কিন্তু তাঁদের কলম আর উৎকৃষ্ট লেখার জন্ম দিতে পারল না। সুতরাং আমরা দেখতে পেলাম ১৯১৯ সালের শেষ দিকটায় বাংলার নাট্যাকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা নেমে এল এবং তাতে আর কোন আশার আলো ফুটলো না।

॥ লোকনাট্যের পুনরুজ্জীবন ॥

লোকনাট্যের পুনরুজ্জীবনের সমস্যা আজকাল শিল্প সমালোচকদের মনোযোগ আকর্ষণ করছে। এ সম্বন্ধে অবশ্য তাঁরা সকলেই এক মত পোষণ করেন না। তাঁরা বিভক্ত, কলকাতার সংবাদ পত্রের স্তম্ভেও এর সমালোচনা প্রকাশ পেয়েছে। এই সমালোচকদের কেহ কেহ এই প্রশ্নটি বেশ সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। যাহা হউক প্রশ্নটি জটিল এবং ক্ষীপ্রতার সঙ্গে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে, তার ফল শোচনীয় হতে পারে। তাই প্রয়োজন হচ্ছে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বেশ একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছোন।

আমরা জানি যে পশ্চিমবঙ্গে যাত্রাই তার প্রাচীন শিল্পকলা-কৌশল ও ধরণ ধারণসহ প্রাচীনতম লোকনাট্যের প্রকৃষ্ঠ নমুনা। যাত্রা অনেক পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে হয়ে যে পরিবর্তিত অবস্থায় এসে পৌঁছেচে তাতে তার সে প্রাচীন বৈশিষ্ট্য আর বজায় নেই। এ অনেক পূর্বেই তার গৌরবময় সেই প্রাচীন ঐতিহ্য থেকে দূরে সরে এসেছে এবং তাকে মৃতশিল্প বলা যেতে পারে। বাংলাব পরেই উড়িয়া যাত্রার নাম করা যেতে পারে এবং সে যাত্রা বরঞ্চ অনেকটাই এর প্রাচীন ধরণধাঁচ বজায় রেখেছে এবং উগ্র আধুনিকতার সংস্পর্শে তেমন ক্ষতিগ্রস্থ হয়নি, যেমন আমাদের যাত্রা হয়েছে।

'পালাগান' আর একটি গ্রাম্যশিল্প এবং এটা যাত্রাগানেরই স্বগোত্র বললেই হয়। কিন্তু আজকাল আর এর প্রচলন নেই। এই দেশে এ জিনিষ এক সময় এত বেশী প্রচলিত ছিল যে প্রায়শঃই কোন না কোন পৌরাণিক বিষয় অবলম্বনে এই পালাগান হতো এবং তা বহু ধর্মভাবাপন্ন লোককে আকৃষ্ট করত। 'বেহুলার গল্প','নদের চাঁদ, 'মহুয়া'

কয়েকটি বিখ্যাত পালাগান, যা বহু শ্রোতৃবর্গকে আকর্ষণ করতো। ডাকাত কেনারামের এবং ও দ্বিজবংশীদাসের প্রসিদ্ধ গল্প যা পূর্ববঙ্গের গ্রাম্য লোকগাথায় বিবৃত হয়েছে এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সংগৃহীত হয়েছে, পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করবে শুধু গানের ভিতর দিয়ে এবং সে গান একটি মাত্র গায়ক এবং তার কিছু সঙ্গীত দ্বারা পরিবেশিত হয়ে কি অসাধারণ প্রভাবই না শ্রোতৃবর্গের উপর বিস্তার করতো।—কেনারাম এবং বংশীদাসের গল্প গ্রাম্য-গীতি কবিদের দ্বারা যেরূপভাবে পরিবেশিত হয়েছে, তা আমাদের বিবৃতির সত্যতা প্রমাণ করবে। দ্বিজ বংশীদাস এবং তাঁর সঙ্গীরা একদিন বাড়ী থেকে দূরে এক নির্জন বনের পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন কোন এক দূরবর্তী গ্রামে আহূত হয়ে তার ব্যবসাগত কাজ করতে। বংশীদাস একজন প্রসিদ্ধ গ্রাম্য পালা-গায়ক ছিলেন। বংশীদাস এবং তাঁর দলের লোকদের পথে দেরি হয়ে গিয়েছিল এবং রাত্রির অন্ধকার নেমে এসেছিল। সেটা ছিল চাঁদনী রাত। সেই নির্জন বনমধ্যে সহসা তারা কেনারাম এবং তার ডাকাতদল কর্তৃক পরিবেষ্টিত হলেন। তারা গায়ক এবং তার দলকে হত্যার ভয় দেখিয়ে তাদের যাকিছু আছে তা দাবী করল। তাঁরা তখন বললেন যে তাঁরা গায়কের দল এবং তাঁদের কাছে কোন টাকা কড়ি নাই। ঐ ভয়ঙ্কর দস্যু এবং তার দলের লোকেরা এক সঙ্গে অনুরোধ করলে একটা গান করতে। এবং তারা খোলা তরবারি নিয়ে তাদের (গায়কদের· চারিপাশে ঘিরে বসল। মৃত্যু সন্নিকট মনে ক'রে বংশী তার দলের লোকেরা তাদের অন্তিম গান গাইল। ধূসর চাঁদ এবং তারকারাজির স্তিমিত আলো বনবৃক্ষের শাখা পত্রাঞ্চল ভেদ করে মাটিতে এসে পড়েছিল, এমন পরিবেশে বংশী এবং তার সঙ্গীরা —বেহুলার করুণ কাহিনীর পালা গান গাইল। বংশীর ঐন্দ্রজালিক কণ্ঠস্বর—চন্দ্রালোকিত সেই অস্পষ্ট সৌন্দর্যের সংমিশ্রণে জনহীন বনমধ্যে কেনারাম ও তার ডাকাত সঙ্গীদের মনের উপর এক মন্ত্রশক্তির কুহক বিস্তার করল। তারা ধীর, স্থির ও নির্বাক বিস্ময়ে বসে গান

শুনছিল এবং জানতেও পারেনি কখন রাত্রি প্রভাত হয়েছে। কেনারাম তখনও বসে বসে অশ্রুপাত করে চলেছে। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে কেনারাম বললে, সে চিরকালের মত এ হত্যা ব্যবসায় পরিত্যাগ করবে। বংশীদাস ও তার সঙ্গীদের সে তৎক্ষণাৎ ছেড়ে দিলে।

মানুষের নৈতিক চরিত্রের উপর পালাগানের প্রভাব ছিল এই রকমই বিস্ময়কর, অবশ্য এই গানের সাফল্য নির্ভর করত দক্ষ দল পরিচালকের উপর সচরাচর যার নিজের এবং দলের অন্য গায়কদের থাকত সুমিষ্ট ও বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর আর নির্ভর করত গায়কদের সুর পরম্পরার ঐক্য সৃষ্টি এবং সুগভীর অভিনিবেশযোগ্য কারুণ্যের পরিবেশনার উপর। করুণ রস সৃষ্টির সহায়ক বিষয়বস্তুর অবতারণাও বিপুলভাবে করা হোত, এবং সর্বোপরি এর সাফল্য পৌরাণিক ও ধর্মীয় করুণ রসাত্মক গল্পের উপর নির্ভরশীল ছিল, যে গল্প শ্রোতা সাধারণের মনের উপর একটা বিস্ময় বিহ্বল ও মর্মস্পর্শী প্রভাব বিস্তার ক'রে চরম মোক্ষলাভের পথের সন্ধান দিত। এই পালা-গানের লেখকেরা ছিল অতি সাধারণ লোক। তারা কবিও নয়, বা সুলেখকও নয়। তাদের অধিকাংশই ছিল গাঁয়ের হিন্দু ও মুসলমান এবং তাদের শ্রোতারা ছিল গ্রামের অশিক্ষিত নারী পুরুষ। এই পালাগানের গল্প, দর্শন, ব্যাখ্যা এবং সমগ্রভাবে এর সম্পাদনা সুন্দর-ভাবে করা হোত। শ্রোতাসাধারণের মনের সুরের সঙ্গে পূর্ণ ঐক্য সৃষ্টি করে এমন নৈপুণ্যের সঙ্গে তার উপস্থাপনা করা হোত যে সন্দেহের কোন অবকাশই থাকত না যে এগুলি খাঁটি দেশী জিনিষ। কাজেই তাদের মনকে অতি সহজেই আকর্ষণ করত।

আগেই বলা হয়েছে, যাত্রা পুরাপুরি গ্রামীণ শিল্প, যার স্বভাবে কিছুটা নাটকধর্মীতা রয়েছে। আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্রমোন্নতির সঙ্গে তাল রেখে এর অনেক ভাঙচুর ও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। নবদ্বীপের মহাপ্রভু তাঁর মহান সঙ্গীদের নিয়ে এর নবরূপ

দিয়েছিলেন। এর আগে এত উন্নতাবস্থায় একে কখনও দেখা যায়নি। এঁদের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে এর অবনতি হতে থাকে, ইংরাজ আমলে এর পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা হয়েছিল এবং অপেশাদার যাত্রাদলগুলি পাশ্চাত্য রীতিতে নব-নাট্যরূপায়নের সাহায্যে এতে কিছু নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছিলেন। প্রাচীন উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত নানাপ্রকার অজানা বাদ্য সংযোগে এর মধ্যে প্রবেশ করান হয়েছিল, যেমন পর্টুগীজদের কাছ থেকে বেহালা এবং ইংরেজের কাছ থেকে হারমোনিয়াম।

এই সব নবরূপায়ণ সত্বেও, যাত্রার সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য যে গান তা এক রকমই রয়ে গেল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং বিংশ শতাব্দিতে যাত্রাকে পাশ্চাত্য সঙ্গীত ও অভিনয়ের ভঙ্গীতে ষ্টেজোপযোগী এক নব নাট্যরূপে সুশোভিত করা হয়েছিল। এক নতুন ধরণের যাত্রার উদ্ভব হয়েছে এবং ১৯১০ সালে আমরা দেখতে পেয়েছি এক ধরণের থিয়েট্রিক্যাল যাত্রা দল, যাতে মঞ্চও আছে, পর্দ্দাও আছে এবং মৃত্যুদৃশ্য রূপায়িত করতে দূরবর্তী মেঝের পশ্চাৎপট ব্যবহার করা হয়, যাতে মৃত নাট্য চরিত্রগুলিকে সহ অভিনেতাদের অভিনয়ের ক্ষেত্র থেকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যেতে না হয় কিন্তু এরও স্থায়ীকাল সংক্ষিপ্তই ছিল। অধুনা যাত্রা তার অভিনয়ে এবং সংলাপে সম্পূর্ণরূপে রঙ্গ মঞ্চ নির্ভর হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তার সেই পুরাতন রীতিনীতি সবই পাল্টে গেছে।

পাঁচালী আর এক প্রকারের লোকনাট্য। পালাগান থেকেই এর উৎপত্তি। যদিও এর প্রচলন খুব বেশী নেই, তবুও পাঁচালী আজকাল এখানে সেখানে মাঝে মধ্যে পরিবেশিত হয়ে থাকে। বর্ধমানের বাধমারার দেবীপ্রসাদ রায়ের পুত্র দাশরথি রায় (১৮০৫ সাল) পাঁচালীর একজন খ্যাতিমান পদকর্তা ছিলেন। দাশরথী এক ধরণের ভ্রাম্যমান পাঁচালীর প্রবর্তন করেন। পাঁচালী শব্দের ব্যুৎপত্তির্থের অনুসরণে এবং এর অশালীন অংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক এক নূতন রূপ

দান করেন। উনবিংশ শতাব্দির প্রারম্ভে এবং মধ্যভাগে পাঁচালীর প্রচলন খুব বেড়েছিল এবং জনসাধারণের মনে পাঁচালী এক অসামান্য প্রভাব বিস্তার করেছিল। কিন্তু আজকাল এ এক অপ্রচলিত শিল্পে পরিণত হয়েছে।

এর পূর্ব্বোক্ত বিশ্লেষণ থেকে আমরা দেখতে পাই যে লোক নাট্যরূপ এই সমস্ত প্রাচীন শিল্পের বনিয়াদই হল সঙ্গীত। এর কোনটাই সাধারণের উপর কোন প্রভাবই বিস্তার করতে পারত না যদি এর যথেষ্ট সঙ্গীতোপকরণ না থাকত। কোন শক্তিশালী অভিনয় বা জোরাল সংলাপই এর উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ হোত না। কখনও কখনও কোন করুণ রসাত্মক অভিনয়ে আবেগময় অবস্থা সৃষ্টির জন্য সঙ্গীতের অনুপ্রবেশ প্রয়োজন হয়, কিন্তু প্রকৃত বাস্তবধর্মী নাটকাভিনয়ে এরূপ সঙ্গীতোপকরণ সংযোজনার কোন স্থান নেই। যদি দর্শকেরা গভীরভাবে কাঁদবার পরিবেশ না পায় এবং তাদের অন্তরের সূক্ষ্ম ও কোমল অনুভূতিগুলির উপর যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করা না যায় তাহলে নাটক এবং তার অভিনয় দর্শক মনে কোন প্রভাবই বিস্তার করে না।

লোকনাট্যের পুনরুজ্জীবনের প্রশ্ন, কাজেই এক অতি অবাস্তর ব্যাপার। কারণ তাহ'ল একটা বিস্মৃত লুপ্ত শিল্পকে পুনরুদ্ধারের নিষ্ফল চেষ্টার সামিল। এমন কি যদি আমরা তা করবার চেষ্টা করি তাহলে তা একটা বিশেষ শ্রেণীকেই প্রভাবিত করবে, জনসাধারণকে নয়। যদি আমরা এরূপ প্রকল্প সম্পাদন করার চেষ্টা করি, তাহলে প্রত্যেক সম্পাদনার জন্য আমাদের দরকার হবে অন্ততপক্ষে তিনজন করে 'জুড়ীদার' বা সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ এবং তারা মুক্ত সুউচ্চ ও দরাজ কণ্ঠে গাইবেন আর দরকার হবে 'ধুয়া' ধরবার জন্য উচ্চকিত ও মধুর কণ্ঠ একদল চারণ ও সঙ্গীতসঙ্গী ও সহযোগী। একটা অপেশাদার কোন দলের পক্ষেও এর পরিচালনা করা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ।

অনেক দল আছেন যাঁরা এ কাজে হাত দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ

করবেন, কারণ তারা চিন্তা করবেন যে এ একটা মৃতশিল্প এবং উদার জনসাধারণ যাদের খেয়াল খুশীর উপর এর স্থায়িত্ব নির্ভর করছে। তাঁদের কাছ থেকে কোন সাহায্যই তাঁরা পাবেন না। এবং কোন একটা দলের পক্ষে একত্রে এতগুলি প্রতিভাসম্পন্ন লোকের সাহায্য পাবার আশ্বাস সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয় হওয়া অসম্ভব।

আধুনিক যাত্রার সম্বন্ধে বলা যায়, কেবল এইটাই মঞ্চস্থ করা সম্ভব। কারণ আজকাল এ খুবই মঞ্চধর্মী এবং এতেই নৃত্য অভিনয় এবং সঙ্গীতের একত্র সমন্বয় সাধন করা হয়েছে দর্শকের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য। যদি আমরা যাত্রাকে আধুনিক পূর্ণাঙ্গ নাটকের মত মঞ্চে অভিনয়ের মাধ্যমে আমাদের পুরাতন ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই, তা অবশ্য আমরা করতে পারি যদি যথেষ্ট আর্থিক সাহায্য পাওয়া সম্ভব হয় সরকারের তরফ থেকে। কারণ এ কাজে কোন বেসরকারী উৎসই যথেষ্ট নয়। অথবা তারা এরূপ বিরাট দায়িত্ব নেবার উপযোগীও নয় বা বিশ্বাসযোগ্যও নয়। কিছু সংখ্যক লোক হয়ত তর্ক তুলবেন যে নৃত্যনাটক এবং সঙ্গীত বিদ্যালয় এ কাজ ভাল ভাবেই সম্পন্ন করতে পারে। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে, যে সকল ছাত্র সেখানে শিক্ষা লাভ করবে তাদের যে বিষয়ে মনের আকর্ষণ বা উৎসাহ নেই সে বিষয়ে তারা অমনোযোগী হবেই, কারণ ঐ শিল্পকে তারা ভালবাসে না। কোন সঙ্গীতের ছাত্র একটি ক্ষেত্রেও নাচেব অনুষ্ঠানে যোগ দেবে না। আবার নাটকের কোন ছাত্র সঙ্গীতে আগ্রহ প্রকাশ করবে না। একটি লোককে কদাচিৎ কখনও একাকী তিনটি বিষয়ে প্রতিভাবান হতে হতে দেখা যায়। নাট্য শিল্পের কোন বিদ্যালয়ই অধুনা একাজে হাত দিতে চাইবে না। কারণ তারা এখন আধুনিক নাট্যকলা সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে চাইবে এ পথে পিছু হাটতে তারা রাজী হবে না। শুধু সঙ্গীত এবং নৃত্য শিল্পকলা হিসাবে একে গ্রহণ করা যেতে পারে, কিন্তু লোকনাট্যের পুনরুজ্জীবন সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার।

এখন আমরা লোকনাট্য সম্বন্ধে জনসাধারণের আবেদনের দিকটা

বিবেচনা করব। কত লোক আজ এতে উৎসাহ বোধ করে? তাদের সংখ্যা নিশ্চয়ই খুবই সীমিত। নাট্যকলার ছাত্ররা এতে অতি সামান্যই অর্থাৎ উপর উপর আগ্রহ দেখাবে। কারণ এটা তাদের শিক্ষা নেবার বিষয়েরই অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয়। তাদের এতে যে আগ্রহ সে আগ্রহ একটা দর্শকের যাদুঘর দেখার আগ্রহের সমতুল্য। যে যাদুঘরে কতকগুলি প্রাক ঐতিহাসিক আবিষ্কার, প্রাচীন স্মৃতি নিদর্শন, প্রস্তরিভূত অস্থিপঞ্জর জীবদেহ ইত্যাদি রাখা আছে।

কিছু লোক যুক্তি দেখান যে টুসু, গম্ভীরা, ছৌ, জাতীয় নৃত্য ও গীত বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিচিত্রানুষ্ঠানে নির্বাচিত অংশ হিসাবে ঢুকিয়ে পরিবেশন করা যেতে পারে। এতে হয়ত আংশিক সত্য আছে। কিন্তু যাত্রার কথা যদি ধরা যায়, তাহলে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে মাত্র একটি ঘণ্টার মধ্যে যাত্রার রস আদায় হওয়া সম্ভব নয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গে যেখানে লোকনাট্য এক প্রকার মৃত শিল্প বললেই হয়, সেখানে তাকে পুনরুজ্জীবিত করার অনেক বাস্তব অসুবিধা আছে। এই শিল্প নষ্ট হয়ে যাবার জন্য আমরা নিজেরাই দায়ী। এবং এরজন্য যদি কারুকে দোষ দিতে হয়, সে দোষ আমাদেরই ঘাড় পেতে নিতে হয়। তার কারণ পাশ্চাত্য সব কিছুকেই আমরা বেদ বাক্যের ন্যায় উত্তম ও সত্য বলে গ্রহণ করি। যাত্রা শিল্পের বহু কাল আগেই মৃত্যু ঘটেছে এবং এখন সে নিরুপদ্রবে কবরের তলায় শুয়ে আছে। কবর খুঁড়ে মৃতদেহ বার করবার চেষ্টায় কোন লাভ নেই। সে যেমন নিষ্প্রয়োজন তেমনি তার জন্য আবশ্যক এক আসুরিক প্রচেষ্টার।

আমাদের মধ্যেই অনেকেই ভাবেন যে যাত্রাশিল্পে ফিরে যাবেন, কারণ রঙ্গমঞ্চ পরিচালনা বিশেষ ব্যয়সাধ্য। এটা সত্য যে আধুনিক যাত্রা অল্প খরচে চলে। কিন্তু আধুনিক মঞ্চধর্ম্মী যাত্রায় পূর্ব্বের সেই মূল ধরণধাঁচ একেবারেই নেই। এ প্রশ্ন অত্যন্ত জটিল

এবং এ নিয়ে বেশী উচ্ছ্বাস প্রবণ হয়ে লাভ নেই। তবুও যদি আমরা এর পুনরুজ্জীবনের জন্য ঝুঁকে পড়ি, তাহলে আধুনিক রুচি অনুযায়ী আমরা তাকে ঢেলে সাজাব। যে রুচির স্বাদ আজকাল আমরা আমেরিকার "থিয়েটার ইন্ রাউণ্ড" থেকে পাই যা এখন যুক্তরাজ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে। সেখানে কোন মঞ্চ বা পর্দ্দা থাকে না। দর্শকরা অভিনয় ক্ষেত্রের চারিধারে ঘিরে বসেন। এ জিনিষ এখানে সহজেই করা যেতে পারে কিন্তু তা হবে দীর্ঘকাল অপ্রচলিত একটা শিল্পের এক নিষ্প্রভ আবেদনহীন বিকাশ মাত্র, তাতে প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা সামান্যই থাকবে।

॥ বাংলা রঙ্গমঞ্চের জনক ॥

সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ ১২৫০ বঙ্গাব্দে ফাল্গুন মাসে এবং ইংরাজি শকাব্দ অনুযায়ী ১৮৪৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাগবাজার বোসপাড়া, কলিকাতা নিবাসী নীলমাধব ঘোষের পুত্র। ঐতিহাসিক দিক দিয়ে, তখন ছিল লর্ড হার্ডিঞ্জের সময়। তিনি তখন লর্ড ড্যালহাউসীর আগমনের পথ প্রস্তুত করিতেছিলেন। এই সময়টা ছিল ভারতের সার্বিক উন্নতির এক নবযুগ।

বাল্যকালেই গিরিশচন্দ্র পিতা-মাতাকে হারান। তাই স্কুল কলেজের বিদ্যাশিক্ষা তাঁর অতি সামান্যই হয়েছিল। তথাপি তিনি ছিলেন অতি সামাজিক ও প্রফুল্লচিত্ত ব্যক্তি। তৎকালে কলিকাতা বাসীদের চিত্ত-বিনোদনের জন্য শুধুমাত্র কথকথা, পাঁচালী যাত্রাই ছিল। সেগুলি প্রায় যখন তখনই অনুষ্ঠিত হোত। যুবক গিরিশ চন্দ্র এই সকল অনুষ্ঠানের নিয়মিত দর্শক ছিলেন, এবং প্রতিটি মিনিট অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে এই অতি সাধারণ পারিপাট্যহীন শিল্পানুষ্ঠান-গুলি খুঁটিয়ে দেখতেন। এ সবের মধ্যে কথকথা তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করত। পৌরাণিক গল্প ছিল তাঁর একান্ত প্রিয়। এই নানা প্রকার কথকথার ভিতর দিয়ে যা অভিব্যক্তি হোত তা শুনতে শুনতেই তিনি তাঁর বাল্যকাল অতিবাহিত করেছিলেন। এর থেকেই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে ভবিষ্যৎ বাংলার এই সুপ্রসিদ্ধ নাট্য-কারের জীবনাঙ্কুর অতি শৈশবেই তাঁর মধ্যে রোপিত হয়েছিল। শেষে যখন তিনি এক পূর্ণাঙ্গ পরিণত নাট্যকার, তখন এই সকল পৌরাণিক বিষয়ের উপরেই অসাধারণ নৈপুণ্যের সঙ্গে নাটক রচনা করেছিলেন, এবং পাঠককুলের গভীর অন্তরে তাঁর স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। একটি মাত্র কথক নানা ভূমিকা রূপায়ণে নানা ভাবভঙ্গী ও বাক্য

বিন্যাসে বিচিত্র অনুপ্রেরণার পরিপ্রেক্ষিতে যে অভিনয় কৌশল প্রদর্শন করে ও সাফল্যের আনন্দে আপ্লুত হয়, তা তরুণ বয়সী গিরিশচন্দ্রের মনে এক বিস্ময়কর অনুভূতির সঞ্চার করত। তিনি অভিনেতা হবার জন্য দৃঢ় সংকল্প নিলেন। তাঁর উত্তর পুরুষেরা জেনেছিলেন যে তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞায় সফল হয়েছিলেন। আজও পর্যন্ত তিনি প্রধান অভিনেতা এবং নাট্যাভিনয়ের উৎকর্ষের ব্যাপারে কেউই তাঁকে অতিক্রম করে যেতে পারেনি।

গিরিশচন্দ্র ছিলেন মহাভারতের একনিষ্ঠ পাঠক, এবং মহাভারতের অমর কাহিনী থেকেই প্রেরণা লাভ করেছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন যে এই পৃথিবীতে প্রত্যেক লোকেরই কিছু না কিছু শিক্ষা থাকা দরকার। তিনি বিবাহের যৌতুকের অর্থ দিয়ে ইউরোপীয় নাটক, নাটক সম্বন্ধীয় পত্রিকা, মাসিক, ত্রৈমাসিক ইত্যাদি নানা প্রকারের প্রচুর পুস্তক ক্রয় করেছিলেন। পাশ্চাত্যের বিশিষ্ট অভিনেতাদের জীবনী তাঁর কাছে অতি সুস্পষ্ট ছিল। তৎকালীন কলকাতার ব্রিটিশ রঙ্গালয়ে তিনি প্রায়ই যেতেন। লুইস থিয়েটার ছিল তাঁর একটা বড় আকর্ষণ। সদাশয় পার্কার সাহেবের (যাঁর অধীনে তিনি কেরাণীর কাজ করতেন) দ্বারা পরিচিত হয়ে গিরিশচন্দ্র থিয়েটারের মালিক লুইস সাহেব ও তাঁর পত্নীর সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হন। লুইস পত্নী নাট্য শিল্পের একজন বড় রকমের সমজদার ছিলেন। থিয়েটারেও তিনি নিজেই নাট্য বিষয়ক শিক্ষিকা ছিলেন। গিরিশচন্দ্র অতি শীঘ্রই তাঁদের ভক্ত শিষ্য হয়ে পড়লেন। ফল এই দাঁড়াল যে লুইস পত্নীই তাঁর কাছ থেকে অভিনয় ও অভিনয় পরিচালনা সম্বন্ধে অনেক কিছুই শিখে নিলেন।

গিরিশচন্দ্র এই ভদ্র মহিলার সান্ধ্যভ্রমণের অপরিহার্য সঙ্গী হয়ে পড়লেন। যে অভিনয় প্রতিভা তাঁর মধ্যে অকেজো হয়ে ছিল তা একদিন ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে দীনবন্ধুর বিখ্যাত নাটকে নিমচাঁদের ভূমিকা অভিনয়ের কালে সমুজ্জ্বল ও মূর্ত হয়ে আত্মপ্রকাশ করল। এই

দেশে গিরিশচন্দ্রই প্রথম সাধারণ থিয়েটারে, প্রথম ভারতীয় পরিচালক হলেন এবং একটি নাট্যাভিনয় শিক্ষালয়ও স্থাপনা করলেন, যা এখনও তাঁর মহান নামের সঙ্গে যুক্ত আছে। এই অভিনয়ের যে রীতি ও ধারা তাঁর দ্বারা উদ্ভূত হয়েছিল, এ পর্যন্ত তা আমাদের অজানা ছিল, এবং তাঁর এই অভিনয় রীতি অলঙ্কারযুক্ত বাক্যবিন্যাস ও বাক্যজাল বিস্তারে নৈপুণ্যের উপর নির্ভরশীল ছিল না, অথবা আকর্ষণীয় ভাবভঙ্গীর উপরও না। এ নির্ভর করত অতি সাধারণ সরল বাস্তববোধ সম্পন্ন বচন ভঙ্গী সহযোগে নাটকের চরিত্রের সহজ সরল অভিনয়ের উপর, যেমন ভাবে সাধারণতঃ বাস্তব অনুভূতি ও ভাবাবেগে উদ্বুদ্ধ হয়ে কথক অভিনেতারা তৎকালে অভিনয় করতেন।

যে ন্যাশনাল থিয়েটারের সঙ্গে গিরিশচন্দ্র এতকাল সংশ্লিষ্ট ছিলেন তার সঙ্গে তিনি সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করলেন কারণ ঐ থিয়েটার তখন অভিনয় দেখিয়ে দর্শকদের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে চাইছিল। গিরিশচন্দ্রের মতে রঙ্গমঞ্চ তখনও পর্যন্ত শ্রোতৃবর্গের কাছ থেকে সঙ্গতভাবে অর্থ আদায় করার মত যথেষ্ট পরিমাণে সজ্জিত ছিল না। তিনি আরও যুক্তি দেখালেন যে জনসাধারণের মধ্যে তখনও এমন রুচিবোধ সৃষ্টি করা যায়নি, যাতে তারা অর্থব্যয় করে অভিনয় দেখতে এগিয়ে আসবে। অধিকন্তু তিনি একথাও গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন যে তাতে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে থিয়েটারের সামাজিক এবং শিক্ষা বিষয়ক যে মূল্য, তা একেবারেই নষ্ট হবে। ১৮৭২ সালে ৭ই ডিসেম্বর এই ঘটনা ঘটেছিল, যখন জাতীয় রঙ্গশালা সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিণতি ও সমৃদ্ধির মধ্যে এসে পৌঁছেছিল। তিনি মাত্র দুই মাস দূরে সরে ছিলেন, কিন্তু অপেশাদারী নট হিসাবে মাইকেলের কৃষ্ণকুমারী নাটকে গুরুগম্ভীর ভীম সিংহের ভূমিকায় অবতরণ করেছিলেন মার্চ মাসে, ১৮৭৩ সালে। সাত বছর ধরে, তিনি রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, কখনও

অপেশাদারী শিল্পী হিসাবে, কখনও অভিনেতা, বেশীরভাগ সময়ে শিক্ষক এবং কখনও বা ম্যানেজার ও পরিচালক হিসাবে। এই সময় তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকখানি উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছিলেন রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের জন্য। কিন্তু কোন রঙ্গমঞ্চের দায়িত্বভার নিজের স্কন্ধে নিতে ইতস্ততঃ করতেন।

ক্রমে গিরিশচন্দ্র অনুভব করেছিলেন যে বাংলার সমাজ জীবনে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, কাবণ এর মাধ্যমে লোকশিক্ষা চলতে পারে। তার আরও বিশ্বাস জন্মেছিল যে এ ব্যবসায়ে যথেষ্ট অর্থাগমও সম্ভব। তিনি থিয়েটার ইজারা নিলেন প্রথমে তাঁর ভাইয়ের নামে এবং পরে তাঁর এক আত্মীয়ের নামে।

তারপরেই তাঁর জীবনের সত্যিকার সংগ্রাম আরম্ভ হয়। তখন তিনি একজন পরিণত নট এবং সকল অভিনেতাদের শিক্ষক। কিন্তু তখনও তিনি নাট্যকার নন। এবং তখনই তিনি বাংলায় নাটকের নিতান্ত অভাব জনিত এক দারুণ অসুবিধার সম্মুখীন হলেন এবং নাটক লিখতে আরম্ভ করলেন। "আনন্দ রহ" তাঁর প্রথম রচনা। এটি একটি খাঁটি কল্পনাসমৃদ্ধ ঐতিহাসিক নাটক। এ নাটক দর্শক আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হল।

এ ক্ষেত্রটা ছিল যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরেরই বিশেষ অধিকারে। তিনি গিরিশচন্দ্রের পূর্বেই কয়েকখানি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করে নাট্যকার হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

আমি আগেই বলেছি যে গিরিশচন্দ্র বাল্য বয়সে তাঁর অঞ্চলে কথকথার অনুষ্ঠান হলেই তাতে যোগ দিতেন। তার থেকেই তিনি আমাদের অনেক পৌরাণিক গল্পের সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞানলাভ করেছিলেন। বাল্যের ঐ জ্ঞানই তখন তাঁর কাজে লেগেছিল। পৌরাণিক গল্পের ভিত্তির উপর তিনি রচনা করেছিলেন 'রাবণ বধ' এবং পরে আরও অনেক নাটক। এদের মধ্যে 'সীতার বনবাস' প্রচুর মহিলা দর্শককে আকর্ষণ করেছিল এমনকি কলকাতার বহু গোঁড়া

পরিবার থেকেও দর্শকরা আকৃষ্ট হয়েছিল। 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' আর একটি পৌরাণিক নাটক যা বহুসংখ্যক দর্শককে আকর্ষণ করেছিল। নাটক, ক্ষুদ্র নাটিকা, গীতবহুল প্রহসন, ব্যঙ্গ নাটক, সঙ্গীত-বহুল মিলনান্ত ও বিয়োগান্ত নাটক ইত্যাদি নিয়ে গিরিশচন্দ্র প্রায় আশিখানি বই লিখেছিলেন। এইরূপে তিনি নাট্যকারদের মধ্যে সম্রাটরূপে পরিগণিত হয়েছিলেন। পরমহংসের সঙ্গে সাক্ষাতের পরেই তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটকগুলি রচিত হয়। তাঁর মানশ্চক্ষুর সম্মুখে এক নতুন দিগন্তের পথ উন্মোচিত হয়। এর পরে তিনি যাই লিখেছিলেন, পরমহংসকে আদর্শ হিসাবে সম্মুখে রেখেই লিখেছিলেন। তাঁর নাটকের চরিত্রগুলির মুখে তিনি রামকৃষ্ণের বাণী যোজনা করেছিলেন। একদিন গিরিশচন্দ্র বলেছিলেন তিনি কি লিখেছেন নিজেই তা জানেন না। তিনি (রামকৃষ্ণ) আমাকে দিয়ে যেমন লেখান আমি তেমনই লিখি। বিল্বমঙ্গল এবং অন্যান্য ধর্ম্মবিষয়ক সামাজিক নাটকের প্রকৃত ব্যাখ্যা ও রস আদায় করতে তাঁর মত রসবেত্তা সুদক্ষ নাট্যকারই দরকার। নিঃসন্দেহে তিনি একজন বিরাট বড় অভিনেতা ছিলেন। অনেক ইংরেজ, যাঁরা ভিক্‌টোরীয় যুগের বহু অভিনেতা পরিচালক দেখে-ছিলেন তাঁরাও স্বীকার করেছিলেন যে গিরিশচন্দ্র ব্রিটিশ রঙ্গমঞ্চের ঐ সমস্ত বিরাট পুরুষদের চেয়ে কোন অংশে কম ছিলেন না। তিনি সেক্‌স্‌পীয়ারের প্রত্যেক নাটক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করেছিলেন এবং সেগুলি সম্বন্ধে মনে বেশ শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। তিনি ম্যাক্‌বেথের নাট্যানুবাদ করেন এবং রঙ্গমঞ্চে খুব প্রশংসার সঙ্গে তার অভিনয় করেন। এই নাটক তিনি বাঙ্গালী দর্শকদের সম্মুখে উপস্থাপনা করেছিলেন, খুব ব্যয়বহুল সীন-সিনারীসহযোগে এবং পিস্‌ সাহেবের জাঁকজমকপূর্ণ ও ব্যয়সাধ্য সাজসজ্জার সমন্বয়ে। এই পিস্‌ সাহেবই তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ মঞ্চসাজসজ্জা রচনাকারী ছিলেন। এই নাট্যানুবাদও স্যার গুরুদাস ব্যানার্জ্জী, শ্রী এন্‌ এল্‌ ঘোষ, হাইকোর্টের বিচারপতি সারদা চরণ মিত্র এবং আরও অনেকের দ্বারা

উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিল। বহিরঙ্গের এই সুষ্ঠু সাজসজ্জা ও পরিপাট্য সত্ত্বেও এই বই যথেষ্ঠ সংখ্যক দর্শক মনকে আকর্ষন করতে সমর্থ হয়নি। কারণ এর এক আভ্যন্তরিক অসুবিধা এই ছিল, যে সেক্‌স্‌পীয়ারকে এক বৈদেশিক ভাষায় রূপান্তরিত করে উপস্থাপনা করা হয়েছিল এবং সে ভাষা এতই বৈদেশিক যে তার উপযোগিতা নষ্ট হয়েছিল। এমন কি ভারতে ব্রিটিশ স্বার্থের বিরাট পরিপোষক ইংলিশম্যান কাগজ যা ব্রিটিশ ছাড়া যা কিছু বিশেষ করে ভারতীয় সব কিছুকেই ঘৃণা করত সেও বিজয়গর্বে লিখেছিল 'বাংলা যেন অফ কাউডর' অসামঞ্জস্যের এক জীবন্ত প্রতীক। কিন্তু এটা প্রশংসা না করে উপায় নেই যে ব্রিটিশ রঙ্গমঞ্চের সব কিছু হাবভাব রীতিনীতির হুবহু নবরূপায়ণ।"

বঙ্গভঙ্গ দেশে এ এক বিরাট পরিবর্তন এনেছিল, এবং এক মহান জাতীয় আন্দোলন আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। গিরিশচন্দ্র তাঁর ঐতিহাসিক নাটক সিরাজউদ্দোলা, মীরকাশেম, শিবাজী প্রভৃতি নাটক জাতীয় অনুপ্রেরণায় পূর্ণ করেছিলেন। এঁরা সকলেই এক একটি বিরাট জাতীয় বীর এবং ভারতবাসীর অন্তরের একান্ত প্রিয়। গিরিশচন্দ্র নাটকের প্রয়োজন মেটাতে তাদেরকে ইতিহাস থেকে একটু এদিক ওদিক সরিয়ে এনে জাতির মনে নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করলেন। এক অসাধারণ শিল্পী গিরিশচন্দ্র তাঁর নাটকের বিষয় বস্তু এমন গভীর নৈপুণ্যের সঙ্গে উপস্থাপনা করেছিলেন যে তাতে করে তিনি আমাদের জাতির জীবনে এক অদম্য অনুপ্রেরণা জাগিয়েছিলেন। এই মহান প্রচেষ্টায় অবশ্য গিরিশচন্দ্র একা ছিলেন না। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতি তাঁর পরবর্তী নাট্যকারগণ তার কল্পনাকে খুবই আন্তরিকতার সঙ্গে কাজে লাগিয়েছিলেন। এর পরেই গিরিশচন্দ্র আবার ধর্ম্মীয় নাটক রচনায় ফিরে এলেন এবং শঙ্করাচার্য ও তপোবল রচনা করলেন। অতি সাধারণ অজ্ঞ লোকেদের কাছে অদ্বৈতবাদ ব্যাখ্যা দ্বারা বুঝিয়ে

দেওয়া এবং বাংলায় নাটকীয় সংলাপের মাধ্যমে তার গুণাগুণের বিচার করা সহজ সাধ্য নয়, যা গিরিশচন্দ্র করেছিলেন, তথাপি এই বই সবচেয়ে বেশী বিক্রী হয়েছিল। তপোবলে দেখান হয়েছে একজন ক্ষত্রীয় কি করে তাঁর নিজের কর্ম্মশক্তির প্রভাবে ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন। জন্ম বা উত্তরাধিকার সূত্রে নয়। নাট্যকার হিসাবে গিরিশচন্দ্রের সুনাম তাঁর নিখুঁত সামাজিক নাটকের থেকেই এসেছিল। সে সকল নাটকে তিনি কলকাতা ও তৎকালীন সামাজিক চিত্রাঙ্কন এবং কতকগুলি বিশেষ বিশেষ চরিত্র চিত্রাঙ্কন দক্ষতার সঙ্গে করেছিলেন। প্রফুল্ল, হারানিধি, বলিদান, শাস্তি কি শান্তি, তাঁর বিখ্যাত সামাজিক নাটক, ব্যঙ্গ চিত্র ও ক্ষুদ্রনাটক।

গিরিশচন্দ্র ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। তাঁর লেখা 'গৃহলক্ষ্মী' তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। নাট্যকলা শিক্ষক হিসাবে তাঁর খ্যাতি, বিখ্যাত নট বা নাট্যকার হিসাবে তাঁর যা খ্যাতি ছিল তার চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না। তাঁর সময়ের প্রায় অভিনেতা অভিনেত্রীই তাঁর কাছে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। তাদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁর মৃত্যুর পর কলকাতায় চারটি সাধারণ রঙ্গমঞ্চ পরিচালনা করেছিলেন। বাংলা রঙ্গমঞ্চের জনক নামটি সত্যিই তাঁর উপযুক্ত একটি সার্থক নাম। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী তাঁর সম্বন্ধে লিখেছিলেন "তিনি বাংলা রঙ্গমঞ্চের জনক ছিলেন, ভাত কাপড় ও শিক্ষা দিয়ে যেমন সন্তানকে পালন করতে হয় তিনি তেমনি করেই বাংলা রঙ্গমঞ্চের জনক হয়েছিলেন। এদেশে থিয়েটারের জন্ম ও উন্নতির মূলে ছিল তাঁর অক্লান্ত পুস্তক প্রণয়ন ও প্রচেষ্টা যা এ দেশের থিয়েটারে প্রাণের সঞ্চার করেছিল। আর সেই জন্যই তাঁর পরবর্তী বংশধররা সকলেই তাঁর বাংলা রঙ্গমঞ্চের জনক নামটি অসীম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

॥ বাংলা রঙ্গমঞ্চের বিকাশ ॥

আঠারোশো পঞ্চান্ন খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে—

বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের নাট্য-অবদান আজ এক পরিণতিতে এসে পৌঁছেচে। পৌঁছেচে যে পরীক্ষা ও নিরিক্ষারক্ষেত্রে, তার একটা প্রারম্ভ ছিল বই কী। এবং অতি বিচিত্র অতি নাটকীয় সেই প্রারম্ভ কালটুকু। সুদূর রাশিয়া থেকে ভাগ্যান্বেষণে যে ব্যক্তি এসেছিলেন এদেশে, আজ তার নাম অনিসন্ধিৎসুদের কাছে অজ্ঞাত নয়; তিনি হ'চ্ছেন হেরাসিম্ বা জেরেসিম্ লেবেডেফ্। এই লেবেডেফ্‌এর সঙ্গে বাঙলা নাট্যভিনয়ের প্রথম স্মৃতি বিজড়িত। তাঁর ভাষা-শিক্ষক গোলক নাথ দাশ মহাশয়ের কথা সবিশেষ জানা যায় না, কিন্তু যেটুকু বিবরণ পাওয়া যায় তার থেকে ধারণা করা অযৌক্তিক হয় না যে, এই গোলক নাথ দাশের প্রেরণা, উৎসাহ ও সক্রিয়-সহযোগীতাতেই গড়ে উঠেছিল, লেবেডেফের সেই ডোমতলা লেনের প্রথম বাঙ্‌লা থিয়েটার।

১৭৯৫ সালের কথা, "দি ডিজগাইজ এবং লভ্‌ইজদি বেষ্টডক্টর" এই দুখানি প্রহসনজাতীয় নাট্যাভিনয় দিয়ে শুরু হয়েছিল বাঙলা থিয়েটারের প্রথম পদক্ষেপ। পরবর্তী কালে, অর্থাৎ এ ঘটনার প্রায় ৭৮ বছর পরের কথা, যখন বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনেত্রী নিয়ে অভিনয়ের প্রস্তাব করলেন মাইকেল মধুসূদন এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সে প্রস্তাবের বিরোধিতা করে সভা ত্যাগ করলেন, ভাবতে অবাক লাগে তার কত আগে ১৭৯৫ সালে গোলকনাথ দাশ ও লেবেডেফ্ সাহেবের যুগ্মপ্রয়াসে বাঙালী অভিনেত্রীরাই অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন স্ত্রী ভূমিকায় ঐ ডোমতলালেনের থিয়েটারে। সামাজিক দিক থেকে দেখতে গেলে ঘটনাটি বিপ্লবাত্মক বই কী।

পরবর্তী নাট্যাভিনয়ের যে সংবাদ আমরা পাই, সেটি হচ্ছে ১৮২২ সালের কথা, "কলিরাজার যাত্রা" বলে একটী নাট্যভিনয়ের উল্লেখ করেছেন ঐতিহাসিকেরা। তবে এ নাট্যাভিনয় মঞ্চোপরি হ'য়েছিল কিম্বা যাত্রার নাটকের মত অভিনয় হয়েছিল, সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। যাত্রাভিনয়ের ইতিহাস অবশ্য আমাদের বিষয় বস্তুর অন্তর্গত নয়। যাত্রাভিনয় বাঙালীর গণনাট্য বা folk drama হ'লেও বাঙালীর থিয়েটার এই যাত্রার প্রেরণা থেকে আসেনি। ইংরেজী নাটক ও ইংরেজী নাট্যচর্চা তৎকালীন শিক্ষিতদের মধ্যে যে প্রেরণা সঞ্চার করে, বাঙলা থিয়েটার তারই প্রতিশ্রুত ফল স্বরূপ। প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায়, যে স্বল্পায়ু হিন্দু থিয়েটার গড়ে উঠে, তাতে ইংরেজী নাটকের অনুশীলনেরই আভাষ পাওয়া যায় মাত্র। পরবর্তী বাঙলা নাট্যাভিনয়ের উল্লেখযোগ্য প্রয়াস করলেন শ্যাম বাজারের নবীনচন্দ্র বসু তাঁর বৃহৎ বাটীকার মধ্যে, এখন যেখানে আছে শ্যামবাজার ট্রাম ডিপো। ১৮৩৩ সালের কথা, বিদ্যাসুন্দর অভিনয় করিয়েছিলেন নবীনবাবু এবং এ অভিনয় চলেছিল প্রায় দুই বছর। এ অভিনয়ে স্ত্রী লোকেরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন। প্রচুর অর্থব্যয় করতেন নবীনবাবু, তার জন্য তিনি যথেষ্ট ঋণ গ্রস্থ হ'য়ে পড়েছিলেন পরে।

এর পরে স্কুল কলেজের বাঙালী ছেলেরা, সেক্সপীয়ারের নাটক থেকে নির্ব্বাচিত দৃশ্যের আবৃত্তি করেছে। নাটকের খণ্ডাংশের অভিনয় করেছে। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা যে, ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার নামে প্রকাশ্য অভিনয় আসরের ব্যবস্থা করেছিলেন, তাতে সেক্সপীয়ারের পুর্ণাঙ্গ নাটক ও ইংরাজ প্রহসন রচয়িতার অখ্যাত প্রহসন অভিনয় করেছিলেন। একজন বাঙালী, ইংরেজী "সাঁ সুচী" থিয়েটারে, সুখ্যাতির সঙ্গে ওথেলোর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। এই যুগের ইতিহাস আলোচনা করলে বুঝতে পারি যে, বর্তমান বাঙলায় প্রচলিত নাটক-অভিনয় ব্যবস্থাই, শুধু

আমরা বিদেশীর দেখাদেখি নকল করিনি, এর শিক্ষা গুরুও বিদেশী পণ্ডিতরা। প্রথম রাশিয়ার লেবেডেফ্ তারপর ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন্, ডাঃ উইলসন, মিঃ ক্লিঙ্গার ও মিস্ এলিস্, এঁরা সবাই ছিলেন ইংরেজ। এত সব আয়োজনের মধ্যেও বাঙালীর নাট্য পিপাসা এতে বিকশিত হবার সুযোগ পাচ্ছে না বুঝে, শিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যে বাঙলা নাট্যাভিনয়ের অদম্য পিপাসা জেগে উঠে। তারই ক্রমবিবর্তনের ফল হ'চ্ছে উনবিংশ শতকের বাঙলা নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। কিন্তু প্রথমেই, বাঙলা নাটকের প্রয়োজন; মঞ্চে অভিনয় যোগ্য কোনও নাটক বাঙলা ভাষায় তখনও লিখিত হয়নি। ১৮৫১ সালের শেষে বা ১৮৫২ সালের প্রথমে, যোগেন্দ্র চন্দ্র গুপ্ত লিখলেন কীর্তিবিলাস নাটক, ১৮৫২ সালে তারাচরণ শিকদার লিখলেন ভদ্রার্জ্জুন, এবং ১৮৫৩ সালে হরচন্দ্র ঘোষ "মার্চ্চেণ্ট অব্ ভেনিস্ অবলম্বনে লিখলেন "ভানুমতী চিত্তবিলাস"। কিন্তু এ নাটক তিনটি অভিনীত হয়নি। ১৮৫৩ সালে কালীপ্রসন্ন সিংহ রচনা করেন "বাবু" নাটক। ১৮৫৪ সাল বাঙ্লা নাটকের ক্ষেত্রে এক স্মরণীয় কাল। রংপুরের জমিদার কালীচন্দ্র চৌধুরী ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে "সংবাদ প্রভাকর "রংপুর বার্তাবহ" প্রভৃতি পত্রিকায় "কুলীনকুল সর্বস্ব" নামক একখানি মনোহর নাটক রচনার প্রতিযোগিতা আহ্বান করেন ৫০ টাকা পারিতোষিক বিনিময়ে। বাঙ্লা সাহিত্যের অক্ষয় কীর্তি স্থাপনাকারী রামনারায়ণ তর্করত্ন, যিনি পরে "নাটুকে রামনারাণ" নামে আখ্যাত হ'লেন, রচনা করলেন তাঁর সম্পূর্ণ মৌলিক যুগান্তকারী নাটক—কুলীন কুল সর্বস্ব। তদানীন্তন কুখ্যাত কৌলিন্য প্রথার বিষময় ফল দেখিয়ে এবং ঐ প্রথাকে ব্যঙ্গের কশাঘাতে জর্জরিত করে সেদিন রামনারায়ণ যে নাটকটি রচনা করেছিলেন, আজ তা' কী সাহিত্যের ক্ষেত্রে, কী নাট্যশালার ইতিহাস রচনায় এক কীর্তিস্তম্ভবিশেষ। এ নাটক অবশ্য অভিনীত হয়েছিল কয়েক বছর পরে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে। তখনকার কলকাতার নতুন বাজারে রামজয় বসাক মহাশয়ের বাড়ীর

প্রাঙ্গণে। অবশ্য অনেকের মতে এর আগে; তবে ঐ ১৮৫৭ সালেই ৩০শে জানুয়ারী তারিখে অভিনীত হয় অভিজ্ঞান শকুন্তলা” নাটক সুবিখ্যাত সাতুবাবুর বাড়ীতে, নন্দ কুমার রায়ের লেখা, মহাকবি কালিদাস থেকে নেওয়া। এই নাটক মুদ্রিত হয় ১৮৫৫ সালে।

ফিরে আসি আবার “কুলীন কুল সর্বস্বের” কথায়। কলকাতায় এ-নাটক আরও দুবার অভিনীত হয় এবং পরে চুঁচূড়াতেও অভিনীত হ'য়েছে—নরোত্তম পাল মশায়ের বাড়ীতে ১৮৫৮ সালের ৩রা জুলাই তারিখে। কিন্তু এ নাটকের প্রথম অভিনয় যে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল জনপ্রতিনিধি মণ্ডলীর কাছে, তার তুলনা মেলা ভার। সামাজিক কুপ্রথার মূলে কুঠারাঘাতই শুধু নয়, বাঙলা নাট্যানুশীলনের ক্ষেত্রে এ-নাটকের অভিনয় এক বিশেষ অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করেছিল বলা যায়।

এ নাটকে প্লট বলতে যা বোঝায় তা ছিল না, এমন কি নাটকের সংঘাত বা conflict ও তেমন স্পষ্ট নয়, কিন্তু চরিত্র সৃষ্টি এমন জীবন্ত যে, এ নাটক সমান উপভোগ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ এ নাটক যুগের সংস্কার প্রয়াসকে মূর্ত করে দিয়ে গেছে। ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত, নব্যবাঙালীর ইয়ং বেঙ্গল নামে যে, সংস্কার প্রয়াসী যুব সম্প্রদায় তখন দেখা দিয়েছিলেন তাঁদের কাছে এ-নাটক এক নতুন দরজা খুলে দিয়েছিল। তাঁরা নাটককে সামাজিক কুপ্রথার সংস্কার-সাধনে অন্যতম হাতিয়ার বলে গ্রহণ করলেন বলা যায়।

এই যে নাটক ও নাট্যাভিনয়ের ক্রমবিকাশ, তার মূলে ঐ কুলীন কুলসর্বস্ব নাটক। সামাজিক সংস্কারের মূলে রামনারায়ণের যে অবদান, তা অবিস্মরণীয়। নিজে ব্রাহ্মণ হ'য়েও সে যুগে কুখ্যাত এক ব্রাহ্মণ্য প্রথার-বিরুদ্ধে দাঁড়াতে তিনি যে, নির্ভীক হৃদয় ও সৎ-সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন, সেদিনকার বাঙালী সমাজ ও পরি প্রেক্ষিতের কথা চিন্তা করলে, বিস্মিত বোধ না করে পারি না। তৎকালীন সমাজের দর্পণও বলা যায়—কুলীন কুলসর্বস্বকে।

নাটক এবং সমাজ চিত্র, উভয় দিক থেকেই কুলীন কুলসর্বস্ব এক অভিনব পথিকৃৎ।

॥ পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ ॥

পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের একটা হিসাব দিতে আমাকে অনুরোধ করা হয়েছে। গোড়াতেই বলে রাখি যে এ সম্বন্ধে আমার জ্ঞানের পরিধি সীমাবদ্ধ। কারণ বাংলার বাইরে এ বিষয়ে আমার জ্ঞান ভাণ্ডার শূন্য। কাজেই এ নিয়ে আমার পর্যালোচনা পশ্চিমবঙ্গে এর যতটা প্রচলন তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। এখানকার রঙ্গমঞ্চের বৃহৎ ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সহ একটা অতীত ইতিবৃত্ত আছে। প্রায় পয়তাল্লিশ বৎসর যাবৎ আমি বাংলা রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট আছি। প্রথমে একজন শখের অভিনেতা হিসাবে এবং পরে পেশাদারী নট হিসাবেই। অতএব আমি মনে করি যে এ সম্বন্ধে কিছু বাস্তব তথ্য আমি দিতে পারব।

এ কথা দ্বিধাশূন্য ভাবেই বলা যেতে পারে যে আমাদের যে ধরণের মঞ্চাভিনয় এখন হচ্ছে তা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত পুরাতন যাত্রার কোন নব সংস্করণ নয়। বরঞ্চ বলব যে, ধরণ-ধারণ ও কাজে বৈশিষ্ট্যে এ হলো ইংরাজী রঙ্গমঞ্চের নকল।

পাশ্চাত্য রঙ্গমঞ্চের প্রভাব আমাদের দেশের রঙ্গমঞ্চের উপর এত বেশী পড়ল কি করে তার কারণ অনুসন্ধান করতে বেশী দূর যেতে হবে না। ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে জবচার্ণক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কলকাতা, একটা ব্রিটিশ উপনিবেশ ছাড়া আর কিছুই নয়। এবং যে উপনিবেশ সুন্দরবনের ধার বরাবর হুগলী নদীর তীরবর্তী জলাভূমি নিয়েই গড়ে উঠেছিল, বাঙ্গালী এবং ইংরাজ বাসিন্দারা উভয়েই ক্রমশঃ সেখানে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য এগিয়ে আসতে লাগলেন। এই নতুন শহর তখন

দুই অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ল—ভারতীয় এবং ইউরোপীয়। তখন সেখানে সভ্য জীবনযাপনের কোন সুযোগ সুবিধা ছিল না। বিশেষ করে ভারতীয়দের জন্য। ইউরোপীয়দের ছিল একটা সুরাগৃহ, সেখানে ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অফিসারদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে বা শহর পরিদর্শন করতে যে সব বিদেশী নাবিকেরা আসত, তাদের আপ্যায়নের জন্য একটি ছোট রঙ্গমঞ্চ ছিল। বাংলার সংস্কৃতি তখন নবদ্বীপ, মুর্শিদাবাদ, কৃষ্ণনগর, বর্দ্ধমান এবং হালিসহর প্রভৃতি ক্ষুদ্রাকৃতি ছোট ছোট পার্শ্ববর্তী শহরের সঙ্গে আবদ্ধ ছিল। পলাশীর যুদ্ধেই মুসলমান শাসনকর্তাদের অদৃষ্ট নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল এবং ইংরাজেরা এদেশে আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হয়েছিল। পলাশীর যুদ্ধের পরেই যে রাজনৈতিক জাগরণ আরম্ভ হয়েছিল তারই পটভূমিকায় দেখা দিল ১৭৭০ সালের সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষ। ইত্যবসরে ইংরাজ কলকাতায় বেশ সুদৃঢ় ভিতের উপর দাঁড়িয়েছে। এ অবশ্য কতকগুলি কুটিরের সমষ্টি এবং এখানে সেখানে বিক্ষিপ্ত দুচারটি পাকা বাড়ী ছাড়া আর কিছুই নয়। তারপর ক্রমে বিশ্বাস ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে লোকেরা পাকাপাকি ভাবে গৃহ নির্মাণ করতে আরম্ভ করল এবং ভবিষ্যৎ এই সুবৃহৎ শহরের আকৃতি ক্রমেই পরিস্ফুট হতে লাগল।

শহর স্থাপনা এবং তার ক্রমোন্নতির পনের বছরের মধ্যেই এখানে হেরাসীম লেবেডেফ্ নামে এক দুঃসাহসী রাশিয়ান ব্যবসায়ী এলেন। তিনি তাঁর ভাষা সহযোগী গোলক নাথ দাসের সহায়তায় ইংরাজী নাটক 'ডিজগাইসে'র (ছদ্মবেশ) বঙ্গানুবাদ করলেন, স্ত্রী ও পুরুষ দুই জাতির শিল্পীদের সংগ্রহ করে, নাট্য কলা বিদ্যায় প্রশিক্ষণ দিলেন। একটি রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ করলেন এবং অবশেষে ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর তার উদ্বোধন করলেন। এই রঙ্গমঞ্চ উদারপন্থী ও সম্ভ্রান্ত ভারতীয় ও ইউরোপীয়দের সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা করল, আট টাকা ও চার টাকা প্রবেশ মূল্যের বিনিময়ে।

পাশ্চাত্য ধরণের একটি সুসজ্জিত রঙ্গমঞ্চের যা কিছু প্রয়োজন তা সবই সেখানে ছিল। মঞ্চ, পোষাক, সীন, এবং আজ কালকার ধরণের নানাপ্রকার উপবেশন ব্যবস্থা সহ নিখুঁতভাবে সজ্জিত একটি প্রেক্ষা-গৃহ। এই প্রারম্ভিক সময়ের দিক দিয়ে এ ছিল একটা অসাধারণ সাফল্য এবং এর পৃষ্ঠপোষকদের এক অনন্য সাধারণ সাংগঠনিক ক্ষমতা বিশেষ করে ঐ যুগে অভিনেত্রী সংগ্রহে প্রমাণ রেখেছিল। এটা যে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তির পক্ষে চিন্তার বাইরে যে কতটা দক্ষতা তখন প্রয়োজন হয়েছিল ওই সকল স্ত্রী-লোকদের রঙ্গমঞ্চে অভিনয়োপযোগী করে গড়ে তুলতে। এই প্রকারে লেবেডফ এক বিরাট কর্ম সম্পাদন করলেন, যাতে অসাধারণ নৈপুণ্যের প্রয়োজন ছিল। এবং এ জন্য পরবর্তী অভিনেতা, অভিনেত্রীরা এবং রঙ্গমঞ্চের দর্শকদের সকলেরই তাঁর নাম সপ্রশংস কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করবেন।

লেবেডফ হঠাৎ একদিন এই শহর ছেড়ে চলে গেলেন, যেমন হঠাৎ একদিন এসেছিলেন। তাঁর চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে থিয়েটারের আয়ুষ্কালও শেষ হল। এব পর এই শহরে রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে কোন ক্রিয়া কলাপ কেউ দেখতে পেল না ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত, যখন প্রসন্ন কুমার ঠাকুর হিন্দু থিয়েটার খুললেন। যদিও এর নাম হিন্দু থিয়েটার তথাপি এর যা কিছু ব্যবস্থাপনা ও সংগঠন সবই ছিল ইউরোপীয় রঙ্গমঞ্চের অনুকরণে। লেবেডফের নাট্যপ্রচেষ্টার পরে কেউই ইউরোপীয় ষ্টাইলে ছাড়া কোন নাট্য সংগঠন বা প্রচেষ্টার কথা চিন্তাই করতে পারত না। কারণ এই ধরণটাই এই শহরেব আলোকপ্রাপ্ত বা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল। প্রসন্ন কুমারের হিন্দু থিয়েটার ভারতীয় জনসাধারণের মনে জর্জিয়ান থিয়েটারের ষ্টাইলটা বেশ একটা ছাপ রেখেছিল, যা পরের অল্প সময়ের ব্যবধানে মুছে ফেলতে পারা যায়নি। এ ছাড়াও কলকাতা থিয়েটার, চৌরঙ্গী থিয়েটার এবং এই সময়ের অন্যান্য ইউরোপীয় থিয়েটারগুলি ঐ একই জর্জিয়ান ষ্টাইলে চলত এবং ভারতীয়

থিয়েটারগুলি তাই অনুকরণ করত। এমন কি প্রথম ভারতীয় থিয়েটারের কাঠের রঙ্গশালা লুইস থিয়েটারের অনুকরণে নির্মিত হয়েছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে পাশ্চাত্য ভঙ্গী বা ধরণ যা এখানে এসেছিল তা টিকে থাকতেই এসেছিল এবং এখনও পর্যন্ত আমাদের মধ্যে টিকে রয়েছে আমাদের নিজের মত হয়েই। এই হিন্দু থিয়েটারও স্বল্পকাল স্থায়ী হয়েছিল। এর পরে একটি বা দুটি নাট্য প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয়েছিল, কিন্তু তারা কেউই বেশী দিন টিকে থাকতে পারেনি।

সত্যিকার নাট্য প্রচেষ্টা আরম্ভ হয় উনবিংশ শতাব্দির মধ্যভাগে। এই সময় ১৮৫২ সালে প্রথম বাংলা মৌলিক নাটক রচিত হয় এবং এর অভিনয় শখের নাট্যদল কর্তৃক হতে থাকে এবং তা শুধু কলকাতাতেই নয়, ঢাকা, হুগলী, বরিশাল প্রভৃতি আরও অনেক স্থানে। কলকাতায় এই রকম শখের দল সংগঠিত হল প্রায় প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং প্রতি মহল্লায়। এতগুলি শখের দলের নাট্য প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কোন সুব্যবস্থিত সাংগঠনিক প্রচেষ্টা তখনও হয়নি, বা স্থায়ী নাট্য কৃষ্টি গড়ে ওঠেনি যদিও এই সকল অভিনয় শিক্ষিত সম্প্রদায় কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছিল। তবুও এগুলির সম্পাদনায় স্বাভাবিক ত্রুটি ছিল এবং এতে শৃঙ্খলা ও যথোপযুক্ত শ্লীলতার অভাব ছিল। যাহা হউক, কালক্রমে একটি শখের থিয়েটারের দল "ন্যাশনাল থিয়েটার" নামে প্রথম বাংলা পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করেছিল ১৮৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে। অল্প সময়ের মধ্যে এই শহরে আরও পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ গজিয়ে উঠল। এরাই নাট্য ইতিহাসের ঐতিহ্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হ'ল এবং সাধারণ রঙ্গমঞ্চ হিসাবে এই প্রদেশের লোকের মনে নাট্যশিল্পের প্রতি একটা আকর্ষণ ও রুচি জন্মাতে সাহায্য করল। সারা বছর ধরে এগুলিতে অভিনয় চলত। চার থেকে পাঁচটি রঙ্গমঞ্চ সর্ব্বদাই চালু রাখা হোত।

সেই সময় থেকে অনেক রঙ্গমঞ্চই বন্ধ হয়ে বিস্মৃতির অতলে চলে গেছে। এবং ততগুলিই আবার আত্মপ্রকাশ করে তাদের স্থান পূরণও করেছে। পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ দেশের রাজনৈতিক অগ্রগতিতে অনেক সহায়তা করেছে। এদেশের চাষীদের প্রতি ব্রিটিশ নীলচাষ কারবারীদের অকথ্য অত্যাচার ও নির্য্যাতনের বিরুদ্ধে একটা দারুন প্রতিবাদ ও চ্যালেঞ্জ ও যুদ্ধংদেহি ভাব নিয়ে এই থিয়েটার আরম্ভ হয়েছিল। এই সব থিয়েটার সমাজসংস্কার বিষয়ে প্রচেষ্টা চালিয়েছিল এবং জনসাধারণের মনে একটা রাজনৈতিক চেতনার সঞ্চার করেছিল। এই সকল থিয়েটার যে একটা অন্তর্নিহিত শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এদের ভবিষ্যৎ সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হয়ে গভর্ণমেণ্ট শেষ পর্যন্ত ১৮৭৬ সালে ড্রামাটিক পারফরমেন্স আইন পাশ করলেন। এবং তাতে এই কথাগুলি ছিল—"গভর্ণমেণ্ট এই মত পোষণ করেন যে, যে কোন নাট্যাভিনয়, তা যদি কারুর মর্মপীড়াদায়ক বা কুৎসাত্মক, অথবা সরকারের প্রতি মানুষের মনে অসন্তোষের উদ্রেককারী অথবা যে কোন বেসরকারী ব্যক্তি বা দলের পক্ষে বেদনাদায়ক অথবা অন্য কোন রকমে জনসাধারণের স্বার্থের পরিপন্থী হয় তাহলে গভর্ণমেণ্ট সেই অভিনয় বন্ধ করে দিতে পারবেন।"

এই আইনে আরও নিষেধাজ্ঞা ছিল—যদি কোন ম্যাজিষ্ট্রেট যুক্তিসঙ্গতভাবে বিশ্বাস করেন যে কোন গৃহ, ঘর অথবা জায়গা ব্যবহৃত হচ্ছে বা ব্যবহৃত হবার উপক্রম হচ্ছে নাট্যাভিনয় সংক্রান্ত আইনের দ্বারা নিষিদ্ধ কোন অভিনয়ের জন্য, তাহলে তিনি আদেশ জারি করে যে কোন পুলিশ কর্মচারীকে ক্ষমতা দিতে পারবেন যে সেই কর্মচারী তার প্রয়োজনানুযায়ী সাহায্যকারী পুলিশ নিয়ে দিনে বা রাত্রিতে দরকার হলে জোরপূর্বক তথায় প্রবেশ করতে পারবেন এবং সেই উদ্দেশ্যে সমবেত সকল লোককেই গ্রেপ্তার করে আনতে পারবেন। এই আইনের খসড়া ১৮৭৬ সালের ২৫শে মার্চের

ইণ্ডিয়ান গেজেটে প্রকাশিত হয়েছিল এবং বড়লাট লর্ড লিটন্ কর্তৃক ডিসেম্বর মাসে আইনে পরিণত হয়েছিল। এই খস্‌ড়া আইনের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। এবং অমৃতবাজার পত্রিকা ১৪ই ডিসেম্বর ১৮৭৬ সালে এর প্রতিবাদে লিখেছিল, আমরা প্রকৃত পক্ষে বর্তমান শাসনের চাপের তলায় জীবন্মৃত অবস্থায় আছি, এবং গভর্ণমেণ্ট যদি এই রকম দমনমূলক আইনের দ্বারা শাসনকার্য চালাতে থাকেন তাহলে, আমাদেরকে এমন জায়গা খুঁজতে হবে যেখানে গভর্ণমেণ্টের কোন কটাক্ষই আমাদের স্পর্শ করতে পারবে না।"

থিয়েটারের পৃষ্ঠপোষকেরা এবং অভিনেতৃবর্গ এই আইন অগ্রাহ্য করলেন এবং গ্রেপ্তার বরণ করে বিচারার্থ আদালতে প্রেরিত হলেন। দেশবরেণ্য ডব্‌লিউ, সি, ব্যানার্জীর দ্বারা পরিচালিত হয়ে দেশের বড় বড় আইনবিদরা তাদের পক্ষ সমর্থন করলেন এবং পরিশেষে তাঁরা মুক্তি পেলেন। এই প্রকারে এই আইনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলল এবং সেন্‌সর ব্যবস্থাও প্রবর্তিত হল। এই ব্যবস্থা এত দূর পর্যন্ত অগ্রসর হ'ল যে "মাদারল্যাণ্ড" বা "মাদারকানট্রি" নামের কোন নাটকই সেন্‌সরের নীল পেন্‌সিলের আঁচড় ছাড়া অনুমতি পেতো না।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে পেশাদারী থিয়েটার একটা সুনির্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন করল এবং জনমত যাতে একটা সুনির্দিষ্ট রূপ পায় তার জন্য সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলল। সেই বছর থেকেই পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ জনচেতনাকে জাগ্রত ও আকাঙ্ক্ষিত পথে পরিচালিত করতে একটা শক্তিশালী সংস্থারূপে কাজ করতে লাগল। আমাদের বৈদেশিক শাসকবর্গ এটা গভীরভাবে অনুভব করলো, এবং বাংলা রঙ্গমঞ্চ এবং নাটক যা জনসাধারণের মনোভাবের বাহন হিসাবে কাজ করছে তার অগ্রগতির একটা কার্য্যকরী প্রতিরোধ ব্যবস্থা চিন্তা করতে প্রবৃত্ত হ'ল। এই উদ্দেশ্যে জঘন্য আইন পাশ হওয়া সত্বেও বাংলা রঙ্গমঞ্চ তার স্বাভাবিক গতিশীলতা নিয়ে অগ্রসর

হতে থাকল, যা তার নানা প্রকার কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেল। এইরূপে যে সকল নাটক রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপিত হল তাতে বৈদেশিক প্রভুদের সেই সকল একান্ত বশংবদ অনুগতদের চিত্রিত করা হোত, যারা হলেন ভারতীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কিন্তু পুরো মাত্রায় আত্মকেন্দ্রিক, ও দাসমনোবৃত্তি সম্পন্ন এবং যাঁরা আত্মোন্নয়ন ও ক্ষমতা লাভের জন্য নিজের দেশের স্বার্থ বলি দিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন না। এই সকল অর্ধশিক্ষিত, কিন্তু ধনী ও আত্মকেন্দ্রিকদের কার্য্যকলাপ, আচার ব্যবহার রঙ্গমঞ্চে ভীষণভাবে সমালোচিত হোত এবং জনসাধারণ তা দেখে প্রশংসায় ফেটে পড়ত। পরবর্তী লক্ষ্যবস্তু ছিল স্বগ্রামপরিত্যাগ কারী জমিদারগণ, যারা তাদের গৃহ ও জমিদারী নায়েব গোমস্তার হাতে পরিত্যাগ পূর্ব্বক শহরের জাঁক জমকের মধ্যে সুখমন্থরগামী জীবনযাপন করতেন এবং অর্থসম্পদের অপব্যবহার পূর্ব্বক অতিরিক্ত ভোগবিলাসে মত্ত থাকতেন এবং অন্যদিকে গরীব প্রজাদের উপকারার্থে কোন কিছুই না ক'রে শুধুমাত্র উৎপীড়ন ও স্বেচ্ছাচার-মূলকভাবে তাদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করতেন। নাটকে তাদের রক্তশোষক হিসাবে চিত্রিত করা হোত, তাদের অপকর্ম্ম ক্ষমার অযোগ্য এবং প্রায়শ্চিত্তের বাইরে। এই সমস্ত নাট্যাভিনয় সাফল্য লাভ করেছিল। পরবর্ত্তী লক্ষ্যবস্তু ছিল বাংলার সেই লোক সমাজ যারা নিজেদের ঐতিহ্য এবং ব্রিটিশ প্রভুদের ঐতিহ্যের মাঝে দোল খাচ্ছিলেন, কিন্তু ঝোঁকটা ছিল ব্রিটিশ প্রভুদের দিকেই বেশী। এই প্রভুদের পোষাক পরিচ্ছদ আদবকায়দা কথাবার্তা এঁরা অতীব হীণভাবে অনুকরণ করতেন সামাজিক অগ্রগতির দোহাই দিয়ে। এই ইংরাজীভাবাপন্ন বাংলা সমাজকে এই সকল নাটকে দারুণভাবে সমালোচনা করা হয়েছিল এবং দর্শকরা মঞ্চে এই সকল সীনের অভিনয় দেখে উল্লাসে উচ্চরবে ফেটে পড়ত। যে যুগে মদ্যপান দোষাবহ বলে গণ্য করা হোত না, তখন পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ মিতব্যয়ীদের হয়ে লড়েছিল। দর্শকদের মধ্যে শিক্ষিত এবং বুদ্ধিমান অংশ এর ভূয়সী

প্রশংসা করেছিল। আমাদের অনিষ্টকর পণ-প্রথাও নাটকে কঠোর ভাবে নিন্দিত হয়েছিল এবং তা দেখে গরীব পিতামাতারা একটু পরিতৃপ্তির নিশ্বাস ফেলতে পেরেছিলেন। এ সকলই জনসাধারণের মনে একটা স্থায়ী ছাপ রেখেছিল।

এই প্রকারে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ শুধুমাত্র আমোদ বিতরণ ও জনগণের চিত্তবিনোদন কেন্দ্র হিসাবে কাজ করেছিল তা নয়, সমাজ শিক্ষার বাহন হিসাবেও গণমানসে এক অভূতপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করেছিল। এক কথায় রঙ্গমঞ্চ একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। কাজেই এই সকল রঙ্গালয়ে ধনী, দরিদ্র, ক্ষুদ্র, বৃহৎ, গুণী, অগুণী এবং যে কোন মতাবলম্বী যে কোন শ্রেণীর লোকেরাই যখন তখন আসতেন। শ্রোতৃবর্গ, অতএব, সমাজের নানা শ্রেণীর লোক দ্বারাই গঠিত ছিল। হাইকোর্টের বিচারপতিরা, ছাত্রবৃন্দ এবং তাদের অধ্যাপকগণ, দোকানদারগণ, আইনজীবিগণ ও কেরাণীকুল নিয়ে হরেক রকমের দর্শক সমাগম সেখানে হোত।

জনসাধারণের স্বার্থের অনুকূলে সংগ্রামযোগ্য যে কিছু ব্যাপার তা সে সামাজিক, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক যাই হোক না কেন রঙ্গমঞ্চ তা নিয়ে লড়াই করত এবং জনসাধারণের প্রতি পবিত্র কর্ত্তব্য যা এদের উপর ন্যস্ত ছিল তা সম্পূর্ণরূপে পালন করত। পুরাণ, প্রাচীন গল্প, ইতিহাস অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল এবং জনসাধারণের চাহিদা মেটাতে অতীব সাফল্যের সঙ্গে রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপিত করা হোত। এতে থাকতো ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরায় সমারোহ যাতে আমাদের জাতীয় বীরেরা উচ্চপ্রশংসিত হয়ে দর্শকদের চোখের সম্মুখে প্রতিভাত হয়েছেন। এই সব বীরত্ব সূচক ঘটনা অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকদের সম্মুখে উপস্থাপিত করায় দর্শকরাও একটা জাতীয় অনুপ্রেরণায় পূর্ণ অন্তর নিয়ে ঘরে ফিরতেন। তখনকার নাটকে— সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্ম্মীয় দলাদলির কোন স্থান ছিল না। যাঁরাই দেশের জন্য আত্মোৎসর্গ করেছিলেন এবং জীবন দান করেছিলেন,

সম্প্রদায় বা ধর্ম্ম নির্বিশেষে তাঁরাই হতেন তখনকার নাটকের বিষয়-বস্তু। তাই মহারাণা প্রতাপ সিংহ, ছত্রপতি শিবাজী, টিপু সুলতান, রণজিৎ সিংহ, বাহাদুর শাহ, রাণী লক্ষ্মীবাঈ, এবং সংগ্রাম সিংহ প্রভৃতিকে নিয়ে তখনকার নাটক রচিত হোত। বাংলার সিরাজ, মীরকাশেম, প্রতাপাদিত্য, কেদার রায় প্রভৃতি বাদ যাননি, এমন কি অক্ষর পরিচয়হীন সম্প্রদায় যারা ইতিহাস পড়ে কোন কালেই এই সকল চরিত্র সম্বন্ধে জানতে পারত না তারা শুধুমাত্র অভিনয় দেখেই এই সকল ঐতিহাসিক চরিত্র সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে সক্ষম হোত। উৎসব উপলক্ষে যে সকল লোক সুদূর মফঃস্বল বা পল্লী অঞ্চল থেকে আসতেন এমন কি যাঁরা কালীঘাটে তীর্থ করতে বা পুণ্য সঞ্চয় করতে আসতেন তারাও অন্যান্য পাঁচটা নামকরা দ্রষ্টব্য বস্তু যেমন 'যাদুঘর, পরেশনাথের মন্দির, ইত্যাদি দেখার সঙ্গে একরাত্রি থিয়েটার দেখাও অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য করতেন। যদিও এই সকল থিয়েটারে যে নাটক পরিবেশিত হোত তাতে বাহ্যতঃ পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গী কিছুটা থাকতো। তবুও তাতে যে মনোভাব প্রকাশ পেতো তা সম্পূর্ণ ভারতীয়।

পৌরাণিক নাটকগুলি যথেষ্ট সংখ্যক মহিলা দর্শক আকর্ষণ করত। তীক্ষ্ণ ধর্মীয় মনোভাব, যা লোকেরা প্রায় ভুলতে বসেছিল আবার তা পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠল। শ্রীচৈতন্য, সন্ত তুলসীদাস, জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্য এবং রামানুজের জীবনী এবং তাঁদের যুগান্তকারী শিক্ষা ও উপদেশ তৎকালীন ছিন্ন বিছিন্ন হিন্দু সমাজকে আবার সুসংবদ্ধ করার কাজে শক্তিশালী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। থিয়েটার একটা সত্যিকারের ধর্ম্মোপদেশ প্রচার মঞ্চে পরিণত হয়েছিল। এবং এই রঙ্গমঞ্চ ধর্ম্মীয় শিক্ষাগুরু ও সংস্কারক জগৎপূজ্য মহামান্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব, স্বামী বিবেকানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র সেনের মত মহা মনীষীদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। আজকের থিয়েটার, তৎকালে যে সকল মহা মহা সাহিত্যরথী বাংলায় জন্মেছিলেন এবং

যাঁদের নাটক তখন মঞ্চস্থ হোত তাদের কাছে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ। বাংলায় পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের এই আদি যুগে, মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্রের মত লোকেরা এবং আরও অনেকে রঙ্গমঞ্চের সাফল্যের দিকে যথেষ্ট অবদান জুগিয়েছিলেন। এরপরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং অন্যান্যরা সক্রিয় ভাবে সহযোগিতা করেছিলেন নাট্য সাহিত্যের ক্রমোন্নতির ও স্থায়িত্বের জন্য। থিয়েটারে তখন স্যার গুরুদাস প্রভৃতির ন্যায় মহৎ ব্যক্তিরা প্রায়ই যেতেন এবং এঁরা সকলেই রঙ্গমঞ্চকে একটা বিরাট শিক্ষাকেন্দ্র বলে মনে করতেন। এবং যুগাবতার মহান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবও ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে এই মতই ব্যক্ত করেছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় উপাচার্য এবং কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার গুরুদাস গিরিশচন্দ্র ঘোষের ম্যাকবেথের অভিনয় দর্শন করে বলেছিলেন—"শেকস্‌পীয়ারের অননুকরণীয় ভাষাকে অন্য ভাষায় অনুবাদ করা অতীব কঠিন কাজ, কিন্তু গিরিশ-চন্দ্র সে কাজ অতি সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন, তাঁর অনুবাদ অনেক বিষয়ে মূলগ্রন্থের সঠিক রূপান্তর। ইংরাজী সাহিত্যের দিকপাল পণ্ডিত অধ্যাপক এন্, এন্, ঘোষ বলেছিলেন যে গিরিশ-চন্দ্রের ম্যাকবেথের অনুবাদ এই বিয়োগান্ত নাটকের ফরাসীভাষার অনুবাদের চেয়ে ভাল। 'ইংলিশম্যান' নামক সংবাদপত্র, ভারতীয় সব কিছু সম্বন্ধে যে পত্র উন্মাদগ্রস্থ, সেও ১৮৯৩ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারীর সংখ্যায় ম্যাকবেথের অভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেছিল। সে লিখেছিল"কাউডরের বাঙ্গালী সভ্য একটি অসামঞ্জস্যের মূর্ত প্রতীক কিন্তু ইংরাজী রঙ্গমঞ্চের ধরণ ধাঁচ ও কলাকৌশল প্রযুক্ত অভিনয় পর্যায়ের এ এক জীবন্ত অনুকরণ।" স্যার এডউইন আরনল্ড্ ক্যালকাটা থিয়েটার কর্তৃক বুদ্ধদেবের অভিনয় দর্শনে প্রীত হয়ে যথেষ্ট প্রশংসা করেছিলেন। এই নাটক তাঁরই "লাইট অফ এশিয়া" পুস্তক থেকে নেওয়া হয়েছিল ১৮৮৫ সালে।

বাংলার পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ শুধু যে ভারতীয়দের আকৃষ্ট করত তা নয় এমন কি বহু সম্ভ্রান্ত বিদেশীয়রা যাঁরা সরকারী কাজে বা অন্যবিধ শাসনকার্যে এখানে আসতেন তাঁরাও আকৃষ্ট হতেন। উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীদের এটা একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে এখানে এলেই তাঁরা রঙ্গালয়ে একবার উপস্থিত না হয়ে ফিরতেন না।

লর্ড এবং লেডি লিটন্ তৎকালীন বাংলার ছোট লাট স্যর রিচার্ড টেম্প্‌ল্ সহ একবার "বেঙ্গল থিয়েটার" পরিদর্শন করেছিলেন এবং ১৮ই জুন, ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে শকুন্তলার অভিনয় দেখে অত্যন্ত খুশী হয়েছিলেন। এই প্রথম একজন বড়লাট ভারতীয় রঙ্গালয় পরিদর্শন করলেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ২৩শে জানুয়ারী লর্ড এবং লেডি ডাফরীণ তৎকালীন বাংলার ছোটলাট সহ বিবাহবিভ্রাটের অভিনয় দেখে বলেছিলেন "লণ্ডনের রঙ্গমঞ্চেও এমন শক্তিশালী অভিনয় কদাচিৎ দেখা যায়।" লেডি ডাফরীণ আডয়ার ভাইস্ রিগ্যাল লাইফ ইন্ ইণ্ডিয়া পুস্তকে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে উল্লেখ করেছিলেন, বেঙ্গল থিয়েটার তৎকালীন যুবরাজ প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের জ্যেষ্ঠপুত্র রাজকুমার এলবার্ট ভিক্টরকে যিনি পরে সপ্তম এডওয়ার্ড নামে ইংল্যাণ্ডের রাজা হয়েছিলেন তাঁকে ও রাজা পঞ্চম জর্জের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে কয়েকটি সিনের অভিনয় দেখিয়েছিল। তারপরই এই থিয়েটার সম্মানিত নাম গ্রহণ করেছিল "রয়্যাল বেঙ্গল থিয়েটার।" এতদিন ধরে পেশাদারী থিয়েটার দেশের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অসংখ্য শখের নাট্যদল ও উপদলকে পরিচালনা করেছিল। ক্লাব, স্কুল ও কলেজ, সাহিত্য সংঘ, অফিস এবং কল্যাণ সংস্থাগুলি থিয়েটারের অত্যধিক টিকিট বিক্রী হওয়া সব বইয়েরই অভিনয় করত। শুধু তাই নয়, তাদের অভিনয়ের ধরণ ধাঁচ ইত্যাদি সবই অনুকরণ করত। তারা এদের পোষাক পরিচ্ছদও ভাড়া করে নিত যাতে মূল পুস্তকের নিখুঁত অনুকরণ সম্ভব হয়। তাদের উন্মত্ততা এতদূর এগিয়েছিল যে সেই

সাধারণ রঙ্গমঞ্চের সিন-সিনারী গুলিও এরা ভাড়া করে আনত, যে মঞ্চে তাদের নির্বাচিত মূল গ্রন্থ অভিনীত হয়েছিল।

১৯৪২ সাল পর্যন্ত পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ তাদের ব্যবসায়িক অগ্রগতির মধ্য দিয়ে তাদের কাজ ও জাতির প্রতি কর্ত্তব্য সম্পাদন করেছিল তার মধ্যে সুদিন দুর্দিন দুইই তারা দেখেছে। এর পরই দেখা দিয়েছিল মারাত্মক দুর্ভিক্ষ যা বাংলার লোকেদের হতভম্ব করে দিয়েছিল। তারপরেই এল বোমা বর্ষণের দুর্দিন এবং জনগণের শহর ত্যাগের হিঁড়িক এবং সর্ব্বগ্রাসী আঁধারের যবনিকা নেমে এল শহরের সর্ব্বত্র। তারপর যুদ্ধান্তে, প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক লোকেরা ফাঁফানো অর্থের মজা লুটে ভাগ্য ফেরাতে লাগল। লোকেদের সৌভাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গমঞ্চও সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। জনগণ তখন টাকা খরচ করতেই ব্যস্ত। নাটকগুলিও কোন রকম শিল্প-বিষয়ক উন্নতির চেষ্টা ছাড়াই এবং এবং নৈতিক উন্নয়ন বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন থেকেই অভিনীত হতে লাগল।

১৯৫২ সাল পর্যন্ত এই রকমই চলল, এবং জনসাধারণেরও থিয়েটার সম্বন্ধে তাদের উৎসাহে ভাঁটা পড়ল। কারণ আর কোন নতুন নাটকের অভিনয়ই হল না। ১৯৪৮ সাল থেকে শুধুমাত্র নামকরা অভিনেতা ও অভিনেত্রী সংযোগে পুরাতন নাটকের সংযুক্ত অভিনয়ই বছরের পর বছর হয়ে চলল। এই সময় পূর্ব্ববঙ্গ থেকে বাস্তুহারারা দলে দলে এই শহরে এসে জমায়েত হতে থাকল, এবং তারা যে কোন মূল্যেই থিয়েটার দেখতে লাগল। কারণ তাদের মধ্যে অনেকেই সুসজ্জিত আলোকোজ্জ্বল সাধারণ পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ দেখেইনি। শুধু তারা শুনেছিল এবং খবরের কাগজে এই সকল জনচিত্তজয়ী নাটক এবং খ্যাতনামা শিল্পীদের কথা পড়েছিল। কাজেই তারা এখন স্বচক্ষে দেখতে চাইল সেই সকল সুপরিচিত জনপ্রিয় নাটকের অভিনয় একই মঞ্চে যথা সম্ভব বেশী নামকরা শিল্পী সমন্বয়ে সম্পন্ন হয়ে। এই মত্ততা যখন কেটে গেল, এবং জনসাধারণের

মধ্যে নতুন নাটকের চাহিদা দেখা দিল, রঙ্গমঞ্চগুলি সে চাহিদা মেটাতে পারল না। এই বিবৃতির যৌক্তিকতা পরে বর্ণিত হবে।

এখন, এই প্রকারে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল। তা পূরণ করতে কতকগুলি নাট্য সংস্থা এই ফাঁকে সুযোগ গ্রহণের জন্য এগিয়ে এল। তারা স্বতন্ত্রভাবে আধা পেশাদারী থিয়েটারের দল সৃষ্টি করে সুযোগ সুবিধা বুঝে বিনা প্রেক্ষাগৃহেই এখানে সেখানে অভিনয় সুরু করে দিল এবং কোন লাভ হলে সমবায় প্রথায় তা ভাগ বাটোয়ারা করে নিতে লাগল। এখনও এরা এই রকমভাবেই সুযোগ সুবিধা মাফিক জনসাধারণের সমক্ষে আরও অভিনয় করে চলেছে আরও জনপ্রিয় হবার জন্য। কিন্তু সমস্ত ব্যবসায়িক প্রেক্ষাগৃহই পেশাদারী থিয়েটার পার্টির দ্বারা অধিকৃত। এবং এই প্রগতিসম্পন্ন দলগুলির মাঝে মাঝে মূল্যবান ইউরোপীয় প্রেক্ষাগৃহ এবং সিনেমা গৃহ সংগ্রহ ক'রে কলকাতায় এবং তার আশে পাশে অভিনয় করা ছাড়া নিজস্ব কোন স্থানই নেই। একটা বা দুইটা নিজস্ব প্রেক্ষাগৃহ তাদের নিশ্চয়ই পাওয়া উচিত। সঙ্গতভাবেই এটা তাদের প্রাপ্য। প্রকৃত পোশাদারী রঙ্গমঞ্চের সত্বাধিকারীরা যেমন প্রমোদকর থেকে রেহাই পায়, এদেরও তেমনি প্রমোদকরমুক্ত ভাবেই অভিনয় করতে দেওয়া উচিত।

অনেকেরই হয়ত জানার আগ্রহ আছে কি করে পেশাদারী থিয়েটারগুলো চলে? পূর্ব্বে এক বা দুইজন মহাজনের মূলধনী কারবার, কখনও যৌথ কারবার হিসাবে প্রয়োজনীয় সব কিছু একই ভাণ্ডারে মজুত রেখে দল চালাতেন। স্বাভাবিক ভাবেই থিয়েটারের অধিকারীরা সর্ব্বস্তরে সমন্বয় সম্পন্ন একটা সুগঠিত দল করতে প্রয়াসী হতেন। অর্থাৎ তারা চাইতেন প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পী প্রতি বিভাগে, যেমন অভিনয়ে, নৃত্যে, সঙ্গীতে এবং মঞ্চসজ্জায়। স্বত্বাধিকারী কারবারী হিসাবে থিয়েটারে সব রকম চরিত্রে অভিনয় করার মত

লোক যেমন নায়ক, নায়িকা গায়িকা, ভাঁড়, ঠগ বা প্রবঞ্চক, হাস্যরসিক প্রভৃতি ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করার মত লোকই তাঁরা রাখতেন যাতে ঐ একই শিল্পীসমষ্টি নিয়ে একই মঞ্চে সব নাটকই অভিনীত হতে পারে। সাধারণতঃ তাঁরা ছুটীর দিনে কিছু অতিরিক্ত অভিনয়সহ সপ্তাহে তিনটি করে অভিনয় দেখাতেন। কোন কোন থিয়েটার প্রত্যেক অভিনয়ে পৃথক নাটক নিয়ে পাঁচ ছয় রাত্রি অভিনয় দেখাত। এই ধরণের অভিনয়ে শিল্পীরা প্রচুর সুযোগ পেতো অল্প সময়ের মধ্যে নানাপ্রকার ভূমিকায় অভিনয় করবার। এই প্রকারে তারা যথেষ্ট সময় পেতো অভিনয়োপযোগী নানাপ্রকার প্রকাশভঙ্গী ও বচনভঙ্গীর পরীক্ষা নিরীক্ষা করবার। কাজেই তারা পরিণত অভিজ্ঞতা নিয়ে তাঁদের নিজ নিজ শিল্প কর্ম্মে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করত। বাংলা রঙ্গমঞ্চের সেই ছিল স্বর্ণযুগ। সে যুগ আর নেই। এখন সবেরই পরিবর্তন হয়েছে। নাটকের অভিনয় এখন দীর্ঘ মেয়াদের ভিত্তিতে চলতে থাকে কখনও কখনও এ অভিনয় আপরাহ্নিক ও ছুটীর দিনের অতিরিক্ত অভিনয় সহ পাঁচ সপ্তাহ ধরে চলে। এইরূপে কখনও তিন থেকে পাঁচশত রাত্রি একাদিক্রমে চলতে থাকে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আর কোন নাটকই মঞ্চস্থ করা হয় না। ভূমিকালিপি নির্ণীত এবং প্রস্তুত করা হয় কোন বিশেষ নাটকে শেষ দিন পর্যন্ত অভিনয় করার চুক্তিতে ভাড়া করা শিল্পীদের মধ্য থেকে। নৃত্য শিক্ষক, সঙ্গীত পরিচালক, এবং মঞ্চসজ্জা শিল্পী সকলেই ভাড়া করা লোক। এদের কাজ থাকে যে ক'দিনই প্রস্তুতিপর্ব্ব চলে সেই ক'দিনই, এবং এর পরে দীর্ঘ দিনব্যাপী সব অভিনয় সাধারণতঃ প্রধান তত্ত্বাবধায়ক বা মঞ্চের সহকারী ম্যানেজারের তত্ত্বাবধানেই হয়। ইনি দলের সংযোগরক্ষাকারী অফিসার হিসাবে কাজ করেন, যন্ত্রশিল্পী হিসাবে নয়। সাফল্যমণ্ডিত বইগুলি কখনও কখনও আর কোনরূপ নব পর্য্যায়ে শিক্ষা বা প্রস্তুতি ছাড়াই একাদিক্রমে দুই অথবা তিন বছর পর্যন্ত চলে। এমনকি এই প্রস্তুতিপর্ব্বের এই সীমিত সময়ের মধ্য

থেকেই কয়েকটি প্রশিক্ষণ বাদও পড়ে যায়। আর এই প্রশিক্ষণের অর্থই হল বিভিন্ন শিল্পীদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন দ্বারা মঞ্চে আগমন নির্গমন, চলাফেরা ইত্যাদি রপ্ত করা। এছাড়া আর কোন বিশেষ প্রকার শিক্ষাদান নয়। কারণ শিল্পীরা নিজেরাই এ বিষয়ে আলাদা ভাবে সময় দিতে নারাজ যেহেতু তারা সিনেমার জন্য ষ্টুডিওর কাজে গভীর ভাবে জড়িত। কর্তৃপক্ষও প্রশিক্ষণের জন্য বেশী সময় দিতে পারেন না, কারণ তাদের রঙ্গমঞ্চে অভিনয় নেই এমন দিনে, প্রায়ই সখের নাট্য-দল কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে ব্যবহৃত হয়। স্বভাবতই তাদের শিক্ষণ প্রাপ্ত পরিণত অভিনয়ও নিষ্প্রান হয়, অর্থাৎ শিল্পীদের প্রাণবন্তভাব বা প্রাণের স্পর্শের অভাব থাকে। অপরপক্ষে পুরাতন অভিনেতারা প্রশিক্ষণের জন্য এবং ভালভাবে অভ্যাস করার অনেক সময় পান। কারণ অভিনয় রজনী ছাড়া রঙ্গমঞ্চ তাদের জন্য খালিই পড়ে থাকে। সখের শিল্পীদল পাবলিক রঙ্গালয়ের অত্যধিক ভাড়া এবং অন্যান্য খরচা বহনে অপারগ বলে তা ব্যবহারের সুযোগ পায় না। স্বভাবতঃই পুরাতন রঙ্গালয়গুলি তাদের নিজেদের ক্ষমতার ক্ষেত্রে খুবই বলিষ্ঠ এবং কলাকৌশলের দিক দিয়েও খুবই নিপুণ।

কাজেই একথা বলা যেতে পারে যে আজকাল সত্যিকারের নাটকীয় দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব রয়েছে পেশাদারী রঙ্গালয়গুলির। অভিনেতৃবর্গ এবং স্বত্বাধিকারীরা কেউই অর্থ ছাড়া আর কোন কিছুই গ্রাহ্য করেন না। পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ থেকে আদর্শবাদীতা অনেক দিন আগেই চলে গেছে। রঙ্গালয়ের মালিকগণ যেন তেন প্রকারেণ দর্শকদের কাছ থেকে কিছু টাকা আদায় করতে চান। কাজেই ব্যবসার প্রতি তাদের সত্যিকার ভালবাসা নেই, তাদের অত্যধিক লাভের দিকেই নজর। এ এক ধরণের ফাট্‌কাবাজী। বর্ত্তমান থিয়েটার পরিচালনার পথের এই বাধা বিঘ্ন এবং অসুবিধাগুলি সরিয়ে এর অধোগতি বন্ধ করতে একটা প্রস্তাব এই রয়েছে যে রঙ্গমঞ্চ এবং তার পরিচালন ভার গভর্ণমেন্ট নিজের হাতে নিয়ে তাদের প্রত্যক্ষ তদারকী

ও ব্যবস্থাপনায় চালাতে পারেন। পাঁচটার জায়গায় যদি সরকার পরিচালিত একটা রঙ্গমঞ্চও হয়, তাহলেও মন্দ পরিচালন ব্যবস্থা, মূলধনের অভাব এবং এই রকম অন্যান্য অসুবিধার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে এবং রঙ্গমঞ্চকে তার পূর্ব্ব-গৌরবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে। আমি নিজে অবশ্য এর সঙ্গে একমত নই। রঙ্গমঞ্চের উপর সরকারের পূর্ণ কর্তৃত্ব নানা কারণে আকাঙ্ক্ষিত নয়। টাকার যোগান পাওয়া যাবে নিঃসন্দেহ। তাতে এই হবে যে সরকারী টাকার প্রাচুর্যে থিয়েটারগুলো অমিতব্যয়ী হয়ে পড়বে। কিন্তু অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী থিয়েটারের প্রতিযোগিতার অভাবে নাটকের গুণ ও ব্যবস্থাপনার অবনতি ঘটবে। আমাদের সরকার পরিচালিত রঙ্গালয়ের সঙ্গে কিছু সংখ্যক বেসরকারী রঙ্গালয় থাকা দরকার। যাতে তাদের মধ্যে একটা কল্যাণকর প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হতে পারে। পূর্ণ সরকার নিয়ন্ত্রনাধীন থিয়েটার বর্তমান অবস্থায় সম্ভব নাও হতে পারে। সরকার যেগুলোকে উপযুক্ত মনে করেন সেই রকম দুই-চারিটি থিয়েটারকে যদি ধারাবাহিক ভাবে অর্থ সাহায্য মঞ্জুর করেন, তাহলেই ভাল হয়। সমবায় প্রথায় রঙ্গালয় চালানই বোধহয় সবচেয়ে ভাল। কিছু ধারাবাহিক সরকারী সাহায্য সহ দুই বা তিনটি বেসরকারী থিয়েটারের মালিকদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে এক যোগে একটি বা দুইটি থিয়েটার চালাতে দেওয়া হোক। অনেক থিয়েটারের দল শুধু যে অর্থাভাবেই দুর্ভোগ ভোগে, তাই নয়, ভাল অভিনেতা এবং সুষ্ঠু প্রশিক্ষণ ব্যবস্থারও অভাব।

সিনেমাগুলো থেকেও আজকাল অনেক অসুবিধা ঘটছে। পূর্ব্বে এত অধিক সংখ্যায় সিনেমা ছিল না। এমনকি তখনকার দিনেও সিনেমা, বহু সংখ্যক দর্শক থিয়েটার থেকে আকর্ষণ করে নিয়েছিল, তবুও থিয়েটারগুলো কোন প্রকারে অস্তিত্ব বজায় রেখে চলছিল। কিন্তু আজকাল থিয়েটার শুধু বহুসংখ্যক দর্শকই হারায়নি বহু প্রতিভাধর শিল্পীকেও হারিয়েছে সিনেমার কল্যাণে। সকল

নামকরা মঞ্চাভিনেতাই ছায়াচিত্রের কাজে হামেশাই চুক্তিবদ্ধ হন। এমনকি নিম্নমানের অভিনেতারাও বেশী লাভের লোভে ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায় ছায়াচিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হন। যন্ত্র শিল্পীরা এবং কারিগরীতে নিপুণ লোকদেরকেও ছায়াচিত্র ব্যবসায়ীরা ভাড়া করে নিয়ে যান। এই সমস্যার হাত থেকে রক্ষা পাবার উপায় উদ্ভাবনের সময় উপস্থিত।

আমাদের জাতীয় কল্যাণমূলক প্রকল্পে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চকেও স্থান দেওয়া হয়েছে, সব চিন্তাশীল ব্যক্তির দৃষ্টিও এদিকে আকৃষ্ট হয়েছে। রঙ্গমঞ্চের এই দিকটা সম্বন্ধে রায় দেবার পূর্বে এটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে প্রকৃত পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের উপর প্রমোদকরের বোঝা চাপান হয়নি, যেমন অন্যান্য থিয়েটার বা সিনেমার উপর আছে। একথা না বললেও চলে যে এদেশের জনমত সৃষ্টির ব্যাপারে কলকাতার পেশাদারী রঙ্গমঞ্চগুলির যথেষ্ট অবদান আছে। সুতরাং তাদের এই কার্যের স্বীকৃতি হিসাবেই গভর্ণমেণ্ট তাদেরকে এই কর থেকে রেহাই দিয়েছে। সম্প্রতি গভর্ণমেণ্টের প্রচার বিভাগ পল্লীবাসীদের আমোদপ্রমোদ বিতরণ বিভাগ বলে একটি ছোট বিভাগ খুলেছে যার প্রধান কাজ হল পল্লী উন্নয়ন ব্যবস্থা করা। তারা গ্রামে গ্রামে, মেলায়, হাটেবাজারে নাটক অভিনয় করে এবং তাতে সমবায় প্রথায় কাজ করার আন্দোলন এবং অন্যান্য জাতিগঠনমূলক কাজ রূপায়িত করা হয়। কৃষকদের যে সকল অসুবিধার মধ্যে কাজ করতে হয় এবং আধুনিক উন্নত পন্থায় কি প্রকারে চাষের কাজ হতে পারে সে সকল বিষয়ও এই অভিনয়ের মধ্যে রূপায়িত হয়। বিরক্তিকর শরণার্থী সমস্যাও কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারও সম্প্রতি একটা শিক্ষণাগার

খুলেছেন। এখানে ছাত্রছাত্রীদের নাচ, গান ও নাটকাভিনয় শেখান হয় এবং একটা সরকারী রঙ্গমঞ্চের পরিকল্পনাও এদের আছে। এই পল্লী উন্নয়ন বিভাগ যে লক্ষ্যে পৌঁছোতে চায় সে লক্ষ্যে পৌঁছোতে কিছুটা সময় লাগবে। এ বিভাগ অতি সম্প্রতি খোলা হয়েছে। এই বিভাগ এখন পেশাদারী নটদের দিয়ে পূর্ণ করা হয়েছে। যে সকল ছাত্রছাত্রী এই শিক্ষাকেন্দ্রে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হচ্ছে, তারা এখানে একটা আশ্রয়স্থল পাবে। পল্লীপ্রমোদবিতরণ বিভাগ তখন অনেক শিক্ষণপ্রাপ্ত লোক পাবে এক সঙ্গে নানা অঞ্চলে কাজ করার এবং পশ্চিম বঙ্গের গ্রামে গ্রামে উন্নয়ন সংবাদ ও কর্মসূচি পৌঁছে দেবার জন্য। শহরের পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের জন্য আরও শ্রম ও যত্ন সহকারে শিল্পীদেরকে এবং কারিগরী কার্যের লোকদেরকে শিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন। এখানেও একাডেমিতে উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত কিছু কিছু ছাত্রের নিয়োগ সম্ভব হতে পারে।

পরিশেষে, আমি সখের থিয়েটারের চেয়ে পেশাদারী থিয়েটার বেশী পছন্দ করি, কারণ সখের থিয়েটার শিল্পীদের প্রতি তেমন নজর দিতে পারে না। কখনও কখনও তাদের কাছে নাট্যাভিনয় ইত্যাদি শুধুমাত্র আমোদ প্রমোদের ব্যাপার হয়ে পড়ে এবং পেশাগত দিকটার কোন মূল্যই থাকে না। আমাদের আশা এই যে এই দুই শ্রেণীর মধ্যে একটা মধ্যবর্তী আধা পেশাদারী দল আছে এবং এরাই কালক্রমে তাদের মধ্যে সমবায় ভিত্তিক উন্নয়ন প্রচেষ্টার সম্প্রসারণ দ্বারা একটা দৃঢ় ভিত গড়তে পারে। যদি সত্যিই এরা উন্নতি করতে পারে তাহলে পেশাদারী থিয়েটার আর একবার বাংলায় তাদের গৌরবময় ঐতিহ্য ফিরে পেতে পারে। একশত সখের দল এবং তাদের হাজার রজনীর অভিনয়ও পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের কষ্টার্জিত ব্যবসায়িক মূল্যকে অতিক্রম করার মত উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে পারবে না। তারা একটা সত্যিকারের শিল্পীকে পূর্ণ-মাত্রায় নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে আনতে মন প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করে। আমরাও

নীরবাচ্ছিন্ন চেষ্টা ও অভ্যাস দ্বারা নাট্য শিল্পের উন্নতিকল্পে একটা ধর্ম্মীয় শ্রদ্ধার ভাব এবং অদম্য উৎসাহের সৃষ্টি করব।

আমি আশা রাখি যে সখের অভিনেতারাও এক সময় খাঁটি পেশাদারী অভিনেতা হবার জন্য কঠোর শ্রম স্বীকার করবে। কাজেই এই কাজটাকে তারা শুধু জীবিকার উপায় বলে বা অবসর সময়ে চিত্ত বিনোদনের নবতর পন্থা বলেও ধরবে না বরঞ্চ একটা অবশ্য পালনীয় ধর্ম্ম বলে একে গ্রহণ করবে।

॥ অভিনয়ের রীতি বা পদ্ধতি ॥

নাট্যশিল্পে বা অন্য যে কোন শিল্পে একজন শিল্পী তার চিন্তার মধ্যে একটা ধারণা পোষণ করে এবং তা সে নিজে একটা বিশেষ ভঙ্গী বা আকার ইঙ্গিত দ্বারা প্রকাশ করে। যে ভঙ্গী বা আকার ইঙ্গিতের দ্বারা সে তার চিন্তা বা মনোভাবকে রূপ দেয় সেইটাই তার বিশেষ প্রকাশ-পদ্ধতি বা স্টাইল। স্টাইলের স্থান চিন্তার উপরে নয় বা চিন্তা থেকে সে মুক্তও নয়। স্টাইলের পূর্বে মনে চিন্তার উদয় হবেই। চিন্তাই স্টাইলের ভিত এবং চিন্তা সৌধের উপরই সে বিশেষ আকার লাভ করে। একটা স্টাইলের প্রয়োগকারীর মনের শক্তি প্রভাব আমাদের মনকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে।

এই শক্তিপ্রভাব পর্যন্ত পৌঁছোতে শিল্পীকে হতে হবে অকপট মৌলিক শক্তির অধিকারী ও বিশেষ ভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত। তাকে বিশেষ ভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত হতে হবে এই জন্য যে সুনির্দিষ্ট অভিজ্ঞতা বা জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশের অনুশীলন এবং প্রকাশ করার অভ্যাস আয়ত্বে আনা ছাড়া সে কিছুতেই তার আত্মীক শক্তিকে শিল্পে প্রতিফলিত করতে পারবে না।

কি তার শিল্প? শিল্পীর শিল্পই নিজেকে এবং তার বিশ্বাস ও পার্থিব সত্যের যে ধারণা অর্থাৎ তার যুগের ও স্বদেশের যে সত্যরূপ তা প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম। থিয়েটার সেই সত্য প্রকাশে অংশ গ্রহণ করে। এক প্রখ্যাত শিক্ষাগুরু সেণ্ট ডেনিস্ এ বিষয়ে বলেছেন, থিয়েটারে প্রকাশের উপায় নির্ভর করে তার গঠনের উপর। বিশেষ করে মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহের সম্পর্কের এবং অভিনয়ের উপর এবং সব কিছুর চেয়ে বেশী নির্ভর করে লেখকের রচনা নৈপুণ্যের উপর।

শিল্পীর কল্পনা একটা শূন্যের উপর কাজ করতে পারে না। কাজ করতে পারে একটা ঐতিহাসিক বাস্তব জগৎ নিয়ে। প্রত্যেক দেশের তার নিজস্ব বিশেষ সংস্কৃতি আছে, যা পরে পরে আগত ঐতিহাসিক যুগের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করে। প্রত্যেক দেশ তার নিজের ঐতিহ্য ও রীতি নীতি গড়ে তোলে। শিল্পী সেইটাই অনুকরণ করে। প্রত্যেক দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কারের এমনি ক্ষমতা যে তার প্রভাব থেকে দূরে থাকার এবং তার সহায়তা এড়িয়ে চলার সাধ্য কারুর নেই।

সকল প্রাচীন দেশেরই একটা নিজস্ব ঐতিহ্য ও রীতিনীতি আছে যা তাদের বিশেষ আচার ব্যবহার থেকেই গড়ে উঠেছে। আধুনিক নতুন দেশগুলো ঠিক এর বিপরীত। তাদের কোন সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য নেই। আমাদের দেশ সুদূর অতীত থেকেই একটা ঐতিহ্য বহন করেই চলেছে।

আমাদের নাট্য শাস্ত্রে অর্থাৎ পুরাকালের ভারতীয় নাট্যকলা বিষয়ক নিয়মকানুনের যে পুস্তক আমরা দেখতে পাই তাতে দেখি যে নাট্য শিল্পের প্রকাশের যে রীতিনীতি (Style), তা চারিটি প্রধান বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। সেগুলি এইরূপ—ভারতী (Bharati-Verbal style) সত্বতী (Sattwati—Grand style) আরাভাতী—(Arabhati—violent style) এবং কৈসিকী (Graceful style)। Verbal style অর্থাৎ বাচনিক পদ্ধতির সম্পর্ক নাটকের পাঠ্য বিষয়ের সঙ্গে—লেখার ধরণ, সংলাপ, পদ্য, গদ্য, আলংকারিক ও রুচিসম্পন্ন ভাষা, নাটকের উচ্চস্তরের চরিত্রগুলির দ্বারা ব্যবহৃত হয়। সাধারণ চরিত্রগুলি কথা বলে কথ্য ভাষায় এবং নিম্নস্তরের চরিত্রগুলি মঞ্চে ব্যবহার করে গেঁও ভাষা। সত্বতী বা Grand style অর্থাৎ দারুণ জমাটি পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হয় আলংকারিক ভাষা এবং ভাবভঙ্গীকে অতিরঞ্জিত করে দেখান হয়। আরাভাতী বা violent style অর্থাৎ বীরত্ব ব্যঞ্জক পদ্ধতির ব্যবহার এসেছিল—যুদ্ধ, শহর অবরোধ,

ভীতি বা সন্ত্রাসের দৃশ্য চিত্রিত করতে—কোন মত্ত হস্তীর কাছ থেকে পলায়ন, সর্বগ্রাসী আগুনের বা জনগণের বিপ্লবাত্মক উত্থানের দৃশ্যও এমন কি মর্মস্পর্শী বা আবেগময় বক্তৃতাও এই পদ্ধতির আওতায় পড়ে। এটা মনে রাখতে হবে যে থিয়েটারে সাধারণতঃ উচ্চকণ্ঠের আবেগময় বক্তৃতার কোন স্থান বা প্রয়োজন ছিল না। কারণ তখন-কার দিনে থিয়েটার নির্মিত হোত প্রধানতঃ সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোকেদের জন্য। আঙ্গুলে গোণা যায় এমন অল্প সংখক লোক অর্থাৎ নাট্যশিল্পের একেবারে সমজদার বা রসগ্রাহীরাই দেখতে আসত থিয়েটার। রঙ্গমঞ্চের মুখটা হোত খুবই প্রশস্ত। মঞ্চের উপর উভয়দিকে কোন পার্শ্বপট থাকত না। মূল প্রেক্ষাগৃহের পার্শ্ব প্রাচীর দ্বারাই দুই ধার আবৃত থাকত। রঙ্গালয়ের প্রায় অর্দ্ধাংশই মঞ্চ শিল্পীদের চলাফেরা ওঠা বসার কাজে ব্যবহৃত হোত এবং বাকি অর্ধাংশ দর্শকদের জন্য নির্দিষ্ট থাকত। দর্শকরা সংখ্যায় অল্পই থাকতেন। সর্বোৎকৃষ্ঠ প্রেক্ষাগৃহে সর্বসমেত যে স্থান থাকত তা হল ৪৮ ফুট X ৪৮ ফুট। এবং মাত্র দুই স্তরে বসবার আসন ব্যবস্থা সন্নিবেশিত হোত। শাস্ত্রে বা নাটক সম্বন্ধে নির্দেশ রয়েছে এমন পুস্তকে এটা বিশেষভাবে উল্লেখ আছে যে কেউই যেন উপরে বর্ণিত আকারের (৪৮´ X ৪৮´) চেয়ে বৃহত্তর প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণ না করেন, কারণ এর চেয়ে বড় প্রেক্ষাগৃহে নাটক অভিনীত হলে, সে অভিনয় শ্রোতৃবর্গকে আকর্ষণ করে রাখবার ক্ষমতা অনেকটাই হারিয়ে ফেলবে। অতি বৃহৎ রঙ্গালয়ে যা কিছুই আবৃত্তি করা হোক বা উচ্চারিত হোক, তা প্রেক্ষাগৃহের দর্শকদের মধ্যে যারা মঞ্চের খুব কাছে থাকবে না অর্থাৎ মঞ্চের থেকে দূরে থাকবে তাদের কাছে খুবই কম শ্রুতিমধুর হবে। কারণ উচ্চারণগুলো শোনাবে অস্পষ্ট। এ ছাড়া যখনই প্রেক্ষাগৃহ খুব বড় হয়, অভিনেতার মুখের ভাবভঙ্গী যার উপর তার মনের বিশেষ অবস্থা বা মনোভাবের যথাযথ প্রকাশ নির্ভর করছে, তা পরিষ্কারভাবে সকল দর্শকদের দৃষ্টিগোচর হয় না।

কাজেই এইটাই বাঞ্ছনীয় যে রঙ্গালয়গুলি মাঝামাঝি সাইজের হওয়া উচিত যাতে আবৃত্তি ও গানগুলি সবই আরও সহজে ও সুস্পষ্টভাবে শুনতে পাওয়া যায়।

সর্বশেষে, কৈসিকী হচ্ছে যাকে ইংরাজিতে বলা হয়েছে Graceful style অর্থাৎ সৌন্দর্য্যময় পদ্ধতি। এর মধ্যে আছে অনেক প্রকারের নৃত্যগীত এবং অভিনীত বিষয় যাতে আছে ভালবাসার অনুশীলন ও তৎসংক্রান্ত আমোদ আহ্লাদ। এই পদ্ধতিতে প্রয়োজন হয় সূক্ষ্ম বাচন নৈপুণ্য এবং উচ্চাঙ্গের প্রকাশ ভঙ্গী।

এই প্রধান রীতিনীতি (Style) গুলো তাদের সবগুলি শাখা-প্রশাখা সমেত ৭ম ও ৮ম শতাব্দি পর্যন্ত খুব শ্রদ্ধার সঙ্গেই অভিনেতারা অনুশীলন করতেন এবং সুদক্ষ শিক্ষকের সাহায্যে শিখতেন। তারপর থেকেই অবনতি আরম্ভ হয়। ক্রমেই নাট্য সংগঠনের সম্পুর্ণ গাঁথুনীটাই ভেঙ্গে পড়ে এবং লোকেরা সূক্ষ্ম নাট্যকলা সংক্রান্ত ঐতিহ্যের কথা ভুলে গিয়েছিল। লোকরঞ্জন ও সংবর্দ্ধনা এবং ধর্মীয় শিক্ষা এক প্রকার এ্যরেনা টাইপ গ্রাম্য থিয়েটারের দলের অভিনয়ের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। এ রকম থিয়েটারের অভিনয় দেখতে দুই থেকে তিন হাজার দর্শক সমাগম হোত এবং মেঝেতে উবু হয়ে বসে তারা পৌরাণিক বইয়ের অভিনয় দেখত। এ বই প্রধানতঃ গান সমৃদ্ধ এবং তার সঙ্গে মাঝে মাঝে থাকত কিছু আবৃত্তি ও হাস্যোদ্দীপক নক্সা। প্রাচীন স্থায়ী স্টাইলের মধ্যে শুধু গ্র্যাণ্ড (Grand) এবং ভায়োলেন্ট (Violent) স্টাইলই অগণিত দর্শকদের সম্মুখে ব্যবহৃত হোত বীর রসাত্মক ও ভয়ঙ্কর সমর দৃশ্যের অবতারণা করতে।

সৌন্দর্য্যের (Graceful) স্টাইল বাংলায় পুনরায় ব্যবহারে এসেছিল ষোড়শ শতাব্দি থেকে যখন নতুন ভক্তিমূলক নাটক অভিনীত হোত। অবশ্য বাচনিক (Verbal) স্টাইল সব রকমের অভিনয়েই থাকত। ঊনবিংশ শতাব্দি এবং তারপর থেকেই বিলিতি

নাটক ও রঙ্গালয়ের প্রভাব এবং বঙ্গসাহিত্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শহরে বাজারে বিলিতি কায়দায় সুনির্মিত ও সুসজ্জিত রঙ্গালয়ে ভারতীয় বিষয় নিয়ে লেখা নাটকের অভিনয় চলতে থাকল। এগুলো কমবেশী ইয়োরোপীয় নাট্যকলা কৌশলের অনুকরণেই হোত। গল্প-গুলো হিন্দু পুরাণ ও ঐতিহাসিক কাহিনী থেকে নেওয়া হোত, সঙ্গীতের পরিকল্পনা এ্যারাবিয়ান নাইট থেকে। এবং যথেষ্ট সংখ্যক সামাজিক নাটক, ব্যঙ্গ-নাটক, এবং প্রহসনও অভিনয়ে থাকত। এই সকল বিবিধ নাটকাভিনয়ে নানা প্রকারের স্টাইল প্রয়োগ করা হোত। যেমন প্রধান উচ্চাঙ্গের স্টাইল—যা হোল ধীরগতিসম্পন্ন, ক্রমোন্নত অমিত্রাক্ষর ছন্দে সমৃদ্ধ এবং আলংকারিক গদ্য এমনভাবে সন্নিবেশিত যে সুস্পষ্ট ভাবে ছন্দবদ্ধ ও সাবলীল তার গতি। এ যেন এক প্রকার কথার সঙ্গীত। এর শক্তি অলৌকিক, সে যেন মন্ত্রের শক্তি। এই শক্তি প্রভাবিত কবিতার ছন্দে দর্শকবৃন্দ মন্ত্রমুগ্ধ হোত। আমরা এমন অভিনেতা দেখেছি যারা অভিনয় দ্বারা শ্রোতৃবর্গকে শুধু মন্ত্র মুগ্ধই করতেন না, গম্ভীর ও উচ্চ কণ্ঠস্বরে ও ছন্দ-বিন্যাস ও প্রয়োগ চাতুর্যে ভাবাবেগ-কম্পিত এক উচ্চগ্রামে পৌঁছে দিতেন। এর পরে ছিল হালকা ধরণ বা স্টাইল। কিন্তু প্রাচীন উচ্চস্তরের স্টাইলের চেয়ে বেশী ছান্দিক ও নাটকীয়, আরও গতিশীল, আলংকারিক ও ও জাঁকাল এ স্টাইল কল্পনা সমৃদ্ধ প্রেমের কাহিনী সম্বলিত নাটকের অভিনয়ে খুবই উপযোগী। আমাদের বিখ্যাত রহস্য উপন্যাস থেকে নাট্যাকারে রূপায়িত অনেক নাটক আছে। আমাদের ঐতিহাসিক নাটকগুলো ঘটনার চেয়ে কল্পনাশ্রয়ী বেশী।

এই স্টাইলগুলোর জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষাপ্রাপ্ত অভিনেতা, যাদের আছে সবল ও সুনিয়ন্ত্রিত বুদ্ধিমত্তা এবং পরিমাপিত কণ্ঠস্বর-মাধুর্য্য। এগুলো আসে একনিষ্ঠ অনুশীলন থেকে। এবং তার চেয়েও বেশী প্রয়োজন নাটকের চরিত্র রূপায়নের জন্য যথাযথ লোককে ভূমিকা বণ্টন আর এ জন্য শিল্পীর শুধু আবশ্যকীয়

যোগ্যতা থাকলেই হবে না, তার চেহারা কণ্ঠস্বর ইত্যাদির উপযুক্ততা দেখা দরকার।

আমাদের সামাজিক নাটকের অভিনয় তৎকালীন রঙ্গমঞ্চের রীতি নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাস্তব ভঙ্গীতেই হোত। তোমরা একে ঊনবিংশ শতাব্দির শেষ প্রান্তিক বাস্তবতা বলতে পার। আমরা জানি যে প্রত্যেকদেশের প্রকৃত বাস্তবতা তার ঐতিহাসিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থেকে সৃষ্টি যা কাল থেকে কালান্তরে প্রতিনিয়ত সংশোধিত হয়ে চলেছে। কাজেই, খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০ সালের বাস্তবতা আর ৫০০ খ্রীষ্টাব্দের বাস্তবতা এক নয়। এই প্রকারে ষোড়শ শতাব্দির বাস্তবতার ধারণা ঊনবিংশ শতাব্দির বা বিংশ শতাব্দির প্রারম্ভিক বাস্তবতার ধারণা এক নয়। অতএব দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যেক যুগের নিজস্ব একটা বিশেষ স্টাইল বা রীতিনীতি আছে, এমন কি যদিও আমরা দৈনন্দিন জীবনে সে বিষয়ে সচেতন নয়। সপ্তদশ শতাব্দি থেকে আজ পর্যন্ত পরে পরে এই কলকাতা শহরে পুরাতন ছায়াচিত্রের কপিগুলি যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা সহজেই দেখতে পাব যে শহর পরিকল্পনার, স্থাপত্যের পোষাক পরিচ্ছদ, আচার ব্যবহার, হাবভাব ইত্যাদির কত পরিবর্তনই না আমাদের অজ্ঞাতসারে ঘটে গেছে। এবং তা ঘটেছে যথাসম্ভব স্বাভাবিক ভাবেই। তা বাস্তব রূপ নিয়েছে। ফ্যাশনের মত স্টাইলও সর্বদা পরিবর্তনশীল। আমি ১৯২০ সালের কথা স্মরণ করতে পারি, যখন আমরা পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে অভিনেতা হিসাবে এসেছিলাম, বাস্তব ভিত্তিক স্টাইল কাজে লাগিয়েছিলাম। এবং আমি ভাবতেও পারিনি যে এরই মধ্যে এটাকে একটা 'যুগ' বলে অভিহিত করা হবে। ১৯২০ সালের বাস্তবতাকে আবার বর্তমান সময়ের বাস্তবতা পেছনে ফেলে এগিয়ে চলেছে, কাজেই রঙ্গমঞ্চের জগতে সমসাময়িক সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সেই সময়ের বাস্তবতা।

আর একটা বিশেষগুণ এই যে বাস্তববাদ সর্বদাই আপোষ করে চলতে চায়। প্রকৃতিবাদ ঠিক তার উল্টো। প্রকৃতিবাদ আপোষ

করতে জানে না। বাস্তববাদ নতুন নতুন ভাবধারার সঙ্গে মিশে একটা পরিবর্তিত আকারে প্রকাশ পায়।—যেমন রঙ্গালয়ের বাস্তববাদ, যাকে ইংলিশম্যান কাগজ রবার্টিজম্ নামে অভিহিত করেছে, এবং আমেরিকান বলেছে 'ব্যালাস্কো' বাস্তববাদ, নির্বাচন মূলক বাস্তববাদ, কৃত্রিম উপায়ে পাওয়া বাস্তববাদ, সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ, গভীরতর বাস্তববাদ এবং অতীন্দ্রিয় বাস্তববাদ।

বর্তমান শিল্পীরা বাস্তববাদের ক্ষেত্রে নানা বক্রপথে ঘুরছে, কিন্তু কখনও এর সীমায় পৌঁছোতে পারছে না। পৌঁছাবার চেষ্টাও তারা করেনি কখনও, বা আরও এগিয়ে গিয়ে বাস্তববাদের বা প্রকৃতিবাদের রাজ্যে প্রবেশের চেষ্টাও করেনি। অর্থাৎ গভীরভাবে অনুভূত ও অতীন্দ্রিয় বাস্তববাদ তাদের অগম্য। এর অর্থ আর এক ধরণের নাটকীয়তা, নব-নাট্য জগতের বাস্তববাদ।

যাই হোক, আমাদের অভিনয়ের এতগুলো রীতিনীতি ছিল, অভিনেতারা সেইভাবেই শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। এদের কতক-গুলির কোন বিশেষ স্টাইল সম্বন্ধে উৎকর্ষ আছে। মোটের উপর তারা সকলেই বেশ গুণ সম্পন্ন শিল্পী। তাদের সব রকম স্টাইলে অভিনয় করার যোগ্যতা আছে। উচ্চস্তরের ও নিম্নস্তরের মিলনান্ত নাটকে তারা সমান যোগ্যতা প্রদর্শনে সক্ষম। আমার নম্র অভিমত এই যে অভিনয়ে আমাদের স্টাইল থাকাই দরকার। আমার স্টাইল ভালবাসার কারণ অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্টাইলই আসল। কারণ শিল্পী তার নিজের কাজের মধ্য দিয়ে যা প্রকাশ করতে চায় স্টাইল তা করতে সহায়তা করে। মানুষটা নিজেই তার স্টাইল। স্টাইল শিল্পীর ব্যক্তিত্বের আসল দিকটাই প্রকাশ করে।

এর পরেও স্বাভাবিক ও কৃত্রিম এই প্রশ্ন রয়েছে। যার জন্য আমি প্রসিদ্ধ সমালোচক ও থিয়েটার সংক্রান্ত প্রবন্ধ লেখক এরিক বেণ্ট্লে সাহেবের লেখা থেকে একটু উদ্ধৃতি দিচ্ছি। তিনি লিখেছেন, আমরা স্বীকার করি যে অন্যান্য শিল্পের মত নাট্যশিল্পেরও কার্যতঃ

অনুকরণ, নির্বাচন, স্বাভাবিকতা ও কৃত্রিমতা, সত্য ও সৌন্দর্য প্রভৃতির অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজন আছে। আমরা চাই নিখুঁত সামঞ্জস্য। 'স্বাভাবিক' এবং 'কৃত্রিম' দুইটি পরস্পর বিরোধী স্টাইল নয়; এরা অভিনয়ে স্টাইলের অভাবেরই নামান্তর। সত্যিকারের বড় অভিনেতার অভিনয়ে স্বাভাবিকতা এবং কৃত্রিমতা দুইই আছে। এর অর্থ এই যে সত্যিকারের বড় অভিনেতা সামঞ্জস্যহীনতাকে সংশোধণ করে সুসামঞ্জস্য করে নিয়েছেন—অত্যধিক কৃত্রিমতাকে সংশোধন করতে স্বাভাবিক হয়েছেন এবং অত্যধিক স্বাভাবিকতায় সামঞ্জস্য আনতে কৃত্রিম হয়েছেন। এ দুইটী শব্দ পরস্পর সম্বন্ধবদ্ধ। খুব একটা জাঁকাল জবাব দিতে ফরবেস সাহেবের লেখা থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া যায়। তিনি আবার শ্রেষ্ঠতম স্বাভাবিক অভিনয় করেন বলে বলা হয়েছে। 'ডুসের' (Duse সম্বন্ধেও একথা খাটে।

তিনি আরও লিখেছেন—"যদি তোমরা তুলনা কর অষ্টাদশ শতাব্দির এবং উনবিংশ শতাব্দির আপেক্ষিক স্বাভাবিকতা, তাহলে তোমাদের বিবেচনা করতে হবে এই দুই পৃথক সময়ে কাকে স্বাভাবিক বলবো এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে এই দুই সময়ে কোন্‌টি স্বাভাবিক। স্বাভাবিকতা স্থান ও কালের সঙ্গে সম্বদ্ধবদ্ধ। অর্থাৎ স্থান ও কালের সঙ্গে এরও পরিবর্তন ঘটে।

থিয়েটারের সমগ্র ইতিহাস স্পষ্টতই দেখিয়ে দিচ্ছে যে রীতিনীতি পাল্টাচ্ছে। অর্থাৎ একটা নিয়ম যাচ্ছে এবং তার স্থানে আর একটা আসছে।

॥ যাত্রা ॥

যাত্রার সঙ্গে পরিচয় করতে এবং যুগ যুগান্তর ধরে এর যে বিবর্তন ঘটেছে তার একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিতে আমাকে কয়েক শতাব্দি পিছু হটতে হবে। এদেশের আদিমযুগের আধিবাসীদের কোন কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পোল নৃত্য-প্রথার বহুল প্রচলন ছিল। এজন্য এরা অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে একটা লম্বা কাষ্ঠদণ্ড লম্বা-লম্বীভাবে পুঁতে, সেটাকে ফুল দিয়ে সাজাতো এবং গ্রাম থেকে শোভা যাত্রা করে দলে দলে এসে সর্বসাধারণের সেই পূজা প্রাঙ্গণে মিলিত হোত। তারা ঢাক করতাল, বাঁশের বাঁশী প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্র সহকারে গাইতে গাইতে ও নাচতে নাচতে আসত এবং সেই কাষ্ঠদণ্ডটি কয়েকবার প্রদক্ষিণ করত। এই প্রথায় ছিল গান গাওয়া, নানা প্রকার মুখোস পরে তামাসা দেখান এবং উৎসব শেষে তারা আবার নিজ নিজ গ্রামে ফিরে যেতো, যেমন এসেছিল তেমনই।

এই 'পোল' পূজা শুধু দ্রাবিড়িয়ানদের (অনার্য) দ্বারা অনুষ্ঠিত হোত, তাই নয়, আর্যরাও এদেশে এসে এই পূজানুষ্ঠান করতেন। আর্যদের বিজয় পতাকা উত্তোলন সময়ে যে কাষ্ঠদণ্ড ব্যবহৃত হোত, সেই পতাকাদণ্ড হিসাবে তারা কাষ্ঠদণ্ডের পূজা করতেন এবং দ্রাবিড়িয়ান দস্যুদলের বিরুদ্ধে প্রত্যেক বিজয়োৎসবই তারা পালন করতেন।

পোল পূজার অবশেষ আমাদের দেশের এই অংশের 'গাজন' উৎসবের মধ্যে এখনও বেঁচে আছে। এই উৎসব হিন্দুর পঞ্জিকা অনুযায়ী বৎসরের শেষ প্রান্তে অনুষ্ঠিত হয়। এরপর যখন এই দুই সংস্কৃতি (অনার্য ও আর্য) সংস্কৃতি মিলে মিশে কিছুটা একাকার

হয়ে গেল, তখন মূর্তি পূজা আরম্ভ হল। মূর্তি গুলোকে দেবতার পদে অধিষ্ঠিত করে মন্দিরে মন্দিরে পূজা করা হতে লাগল এবং বৎসরের নানা ঋতুতে এই সব দেবতাদের সম্মানে উৎসব পালিত হতে থাকল। যাত্রাও এক প্রকারের ধর্মীয় উৎসব। 'যাত্রা' একটি দ্রাবিড়িয়ান শব্দ। ঐ ভাষায় 'যাত্রা' শব্দের অর্থ ভাষাতত্ত্ববিদের মতে গমন অর্থাৎ যাওয়া। আর্য্যরাও এই অর্থে এই শব্দের ব্যবহার করতে থাকেন। নানা প্রকারের যাত্রা ছিল—যেমন ভাবে দেবমূর্তি গুলি প্রকারভেদ হোত, সেই অনুযায়ী কারুকে ভক্তরা আনতো গাড়ীতে করে, কারুকে রথে, কারুকে পাল্কীতে এবং কারুকে বা আনতো শিবিকায়। শহরের বড় বড় রাস্তা পরিক্রমা এবং মন্দির প্রাঙ্গণ প্রদক্ষিণ করার পর শোভাযাত্রীরা চক্রাকারে বসে তাদের দেবতার স্তুতিবাদসূচক গান করতেন—এই গানে সেই দেবতার অবদানের গৌরব গাঁথা ও স্তোত্র ইত্যাদিতে পূর্ণ থাকতো, অর্থাৎ সেই দেবতা সম্বন্ধে কোন কাহিনীর আবেগময় গান। যাকে আমরা 'পালা গান' বলি। এ গান অবশ্য শেষে বিবিধ অলংকারে ভূষিত হোত—একক এবং মিলিত কণ্ঠে বসে, দাঁড়িয়ে, এবং সুন্দর মনোজ্ঞ নৃত্য সহকারে পরিক্রমা পূর্বক এ গান হোত।

পঞ্চদশ শতাব্দির শেষ প্রান্ত পর্যন্ত আমাদের দেশের লোকেরা এই প্রকারের ভক্তিমূলক আমোদ প্রমোদে উল্লসিত হোত। তারপরেই সংস্কৃত নাটকের ঐতিহ্য এবং প্রভাব অনুভূত হতে লাগল এবং যাত্রাও নতুনভাবে রূপায়িত হতে লাগল। প্রবেশ বহিরাগমন দুই অঙ্কের মধ্যবর্তী বিরতি, সাজসজ্জা, এবং আরও নানাপ্রকার শিল্প সংক্রান্ত ও খুটিনাটি বিষয় ক্রমশঃ এতে সন্নিবেশিত হল। গদ্যে উপযুক্ত সংলাপের অভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এগুলো গান দিয়ে রচিত হোত।

সাধারণতঃ এই সব অনুষ্ঠানে দেবতার ভক্তরাই অংশ গ্রহণ করতেন কিন্তু যখন সুমধুর কীর্তনের সুরে গাওয়া কৃষ্ণযাত্রা জনপ্রিয়

হতে আরম্ভ করল, তখন এর চাহিদার আর বিরতি ছিল না, এমন কি সব রকম লৌকিক উৎসবানুষ্ঠানে এর চাহিদা ছিল। ক্রমে এতে ব্যবসায়িকতা এসে প্রবেশ করল। দেশের প্রায় সর্বত্রই সুদক্ষ শিক্ষকদের পরিচালনায় বিখ্যাত বিখ্যাত যাত্রাদল সংগঠিত হতে লাগল। এগুলো চলেছিলও খুব ভাল। তখন দেশের সর্বত্র দারুণ রাজনৈতিক সঙ্কটের স্রোত বয়ে চলেছিল এবং এই জাগরণের মুখে মারাঠা অভিযান আরম্ভ হয়েছিল। রাজতন্ত্রের দ্রুত পরিবর্তন, ইংরেজের সঙ্গে পলাশীর যুদ্ধ এবং তাদের ক্ষমতায় আসীন হওয়া এবং সর্বশেষে, সবচেয়ে বড় ঘটনা ছিল ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষ। এই দুর্ভিক্ষ সমগ্র দেশকে ভীষণভাবে অভিভূত করেছিল এবং একটা ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ে গিয়েছিল। লোকেরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে দুর্ভিক্ষ পীড়িত অংশ ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিল। যাত্রা এবং অন্যান্য সকল প্রকারের আমোদ বিতরণ সংস্থা একেবারেই অকেজো হয়ে পড়েছিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দির শেষাংশে শাসন ব্যবস্থায় নব জীবনের সাড়া জেগেছিল এবং সংস্কৃতি ও সংবর্দ্ধনা সংস্থা ইত্যাদি পুনরুজ্জীবিত হয়ে ছিল ; কিন্তু এই সময়ের মধ্যে আমরা ইয়োরোপীয় সভ্যতার কবলে পড়ে গিয়েছি। ঊনবিংশ শতাব্দির প্রারম্ভে ভারতবর্ষীয় বালকদের ইংরাজি শিক্ষা দেবার চেষ্টা হয়েছিল। ১৮১৭ সালে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং সেখানে ইংরাজি নাটক পড়ান হোত। এই শহরে এবং এর আশেপাশে কয়েকটি ইংরাজি থিয়েটারও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বাংলার নব্য ছাত্রদের ইংরাজি নাটকে এবং মঞ্চাভিনয়ে বেশ রুচিবোধ জন্মাতে লাগল। যাহা হউক যাত্রাকে এই শতাব্দির মধ্যভাগে প্রচণ্ড উৎসাহের সঙ্গে পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছিল এবং ভারতীয় ও ইয়োরোপীয় নানাপ্রকার নব নব সাজসজ্জা—অর্কেষ্ট্রা অর্থাৎ ঐক্যতান বাদনসহ প্রস্তাবনা ও মধ্যবিরতির গান ইত্যাদিতে ভূষিত হয়ে এক নব রূপে প্রতিভাত হোল ও আধুনিক যাত্রা নামে অভিহিত হতে লাগল। যদিও গান

ও বাক্য ইত্যাদি খুবই উচ্চাঙ্গের ছিল তবুও নাটক ও অভিনয়ের মান নাটকোপযোগী ভাষার অভাবে খুব উন্নত ধরণের হতে পারেনি। তাতে ছিল কিছু ছন্দবদ্ধ কাব্যিক ভাষা, কিছু অসংবদ্ধ কবিতার ভাষা এবং কিছু কিছু রসিকতাপূর্ণ নক্‌সা। উনবিংশ শতাব্দির তিন চতুর্থাংশের শেষ দিকে বহু সংখ্যক ভাল এবং ধনী অপেশাদার যাত্রা দল অপেরা পার্টি নামে শহরের নানা অঞ্চলে স্থাপিত হয়েছিল। এ গুলো স্থাপিত হয়েছিল প্রধানতঃ শিক্ষিত ধনী লোকেদের পৃষ্ঠপোষকতায়। এখানে শুধু প্রাচীন উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতই ব্যবহৃত হোত তাই নয়, উচ্চাঙ্গের অলংকার বহুল গদ্য, এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দ যা পৌরাণিক গল্পের উপস্থাপনে খুবই উপযোগী, তাও অত্যন্ত কারুণ্যব্যঞ্জকভাব সহকারে গম্ভীর উচ্চকিত কণ্ঠসহ ব্যবহৃত হোত। এই প্রকারে ক্রমশঃ সখের যাত্রাদল গড়ে উঠেছিল এবং তারা প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে অর্থাৎ বিংশ শতাব্দির এক চতুর্থাংশ পর্যন্ত প্রাধান্য বজায় রেখেছিল। তারপর থেকেই তাদের অবক্ষয় বা অবনতি আরম্ভ হল এবং পরিশেষে ক্রমবর্দ্ধমান রক্ষণব্যয় বাহুলতা এবং তৎসহ ধনীলোকদের পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে একেবারেই বিলুপ্ত হোল। পেশাদারীদলগুলো নিজেদেরকে নতুন করে গড়ে নিল ও নাটকাভিনয়ে রঙ্গমঞ্চের কায়দার দিকে বেশী ঝুঁকতে আরম্ভ করল এবং এই কারণে এদেরকে "থিয়েট্রিক্যাল যাত্রা পার্টি" বলা হোত। যদিও এরা সমতল্‌ জমিতে একটি সাময়িক নির্মিত ক্রীড়াঙ্গনে পুরাতন যাত্রার কায়দায় অভিনয় করত।

পূর্বে যাত্রার বই পৌরাণিক এবং ধর্মীয় বিষয় নিয়ে রচিত হোত। এখন পুনর্গঠিত যাত্রার অভিনয় পৌরাণিক, ঐতিহাসিক এবং সামাজিক নাটক নিয়ে হয়। এই নিয়মই চলছে, এবং বেশ জনপ্রিয় ও দেশের সর্বত্রই জনসাধারণ কর্তৃক সমাদৃত। 'ব্যালাড' সঙ্গীত বা পালাগানের থেকে আরম্ভ করে আধুনিক যুগের পুনর্গঠিত যাত্রা পর্যন্ত এই হল যাত্রার বিবর্তনের মোটামুটি ইতিহাস।

এখন আমরা যাত্রার অন্যান্য দিকের প্রতি দৃষ্টি দেব। সর্বদা বাংলার পল্লী অঞ্চলের জনসাধারণের চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা হিসাবে একমাত্র যাত্রাই আছে। কিন্তু বৃহৎ শহর কলকাতায় যাত্রা কিছুটা অবহেলিত। যদিও এই শহরেই বেশীর ভাগ যাত্রাদলের জন্ম। অবশ্য এখন যাত্রা কলকাতাতেও, বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদের পৃষ্ঠপোষকতায় নাট্য সংগঠনীর একনিষ্ঠ চেষ্টায় আসর জমিয়ে তুলছে। নাট্য সংগঠনীকে ধন্যবাদ। গত বৎসর কলকাতায় বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে বাংলার সুবিখ্যাত এবং নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের পবিত্র স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে আয়োজিত নাট্যোৎসবে যাত্রার সগৌরব উল্লেখ ছিল। এই প্রকারে যাত্রা এই বৃহত্তম শহরের সর্বত্র শিক্ষিত দর্শকদের মধ্যে ক্রমশঃ অধিকতর জনপ্রিয়তা অর্জন করছে।

রঙ্গ-মঞ্চে অভিনয় করার দরুণ থিয়েট্রিক্যাল যাত্রা দলগুলি খাঁটি যাত্রা হিসাবে তাদের অনন্যতা কিছুটা খর্ব করেছে। কাজেই এটা অনুভূত হয়েছিল যে চিরাচরিত প্রথায় যাত্রার অভিনয় করতে হবে, এবং সেই অনুযায়ী, ঠাকুর পরিবারের পৈতৃক বাসগৃহ থেকে কয়েকগজ দূরে কলকাতায় রবীন্দ্র কাননে (পুরাতন বিডন্ স্কোয়ার) কলকাতার লোকেরা প্রথম যাত্রা-উৎসব দেখতে পেল। এই ঠাকুরবাড়ীর চতুঃসীমার মধ্যে নতুন ভবনে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদের কর্তৃপক্ষ (বর্তমান লেখক যার সভাপতি) বঙ্গীয় নাট্য সংগঠনীকে প্রচুর সাহায্য করেছেন, বিরাট মণ্ডপ নির্মাণ পূর্বক এই যাত্রা উৎসব পালন করতে। পশ্চিম বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী পি, সি, সেন এই উৎসবের উদ্বোধন করেন। ৩০শে আগষ্ট ১৯৬২ সালে তাদের প্রথম অভিনয়ের সঙ্গে এই বিরাট যাত্রা উৎসবের অধিবেশন আরম্ভ হয়

এবং ক্রমাগত চলতে থাকে ২০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এখানে তিন থেকে চার হাজার লোকের বসবার জায়গা ছিল। কলকাতাবাসী পূর্বে কখনও যাত্রার এত বড় সমাবেশ দেখেনি। এই উৎসবে বত্রিশটি নাটকের উপস্থাপনা হয়েছিল এবং তার মধ্যে ছিল সামাজিক, ঐতিহাসিক, ধর্মীয় এবং পৌরাণিক নাটক। যাত্রায় অভিনীত নাটকের বিষয়বস্তুর সযত্ন বিশ্লেষণ দ্বারা দেখা গেছে যে তারা অতীত এবং বর্তমানের মানবিক বিষয়-বস্তুর সব কিছু শাখা প্রশাখাই অন্তর্ভুক্ত করেছে। যারা ধরে নিয়েছেন যে যাত্রা পুরাতন ও আদিম যুগের বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত এক প্রকার আদিম শিল্প, যার দ্বারা শুধু পুরাতনপন্থী একদল লোকের চিত্ত বিনোদন সম্ভব হতে পারে তারা এখন এই অতি আধুনিক সুর এবং সাম্প্রতিক মানব চিন্তার প্রবণতা দেখে নিশ্চয়ই খুশী হবেন। তাতে করে এই হবে যে আধুনিকপন্থীদের এদিকে আকৃষ্ট না হবার কোন কারণ থাকবে না। এর উপস্থাপনার কায়দাটাই আলাদা যা আধুনিক লোক সাধারণতঃ দেখতে অভ্যস্ত হয়। একটি আধুনিক বিষয় এই প্রকারে পুরাতন পোষাকে উপস্থাপিত হয় এবং আধুনিক নাট্যামোদীরা এটাকে একটা অদ্ভুত কিছু বলে ভাবতে পারে, কারণ তারা এতে অনভ্যস্ত। এ অভিনয় আরম্ভ হয় মুক্তাঙ্গনে, মেঝেতে নির্মিত রঙ্গক্ষেত্রে, এবং দর্শকবৃন্দ চতুর্দিক ঘিরে বসে, এবং তাদের পেছন দিকে কোন পর্দা থাকে না। কোন দৃশ্যের অভিনয় কালে সেই দৃশ্য সংক্রান্ত কোনো পর্দা বা বস্তুর অভাব উপযুক্ত ভাষার আবরণে বর্ণনা বা বিবৃতি দ্বারা পূরণ করা হয়—কলকাতার বর্তমান অধিবেশন এই যুগ-পুরাতন প্রথা পরিত্যাগ করেছে, এবং মণ্ডপের মাঝখানে একটি উন্নত মঞ্চ করেছে নাটকাভিনয়ের জন্য এবং এর থেকে সেতুর মত করে একটি ঢালু রাস্তা দর্শকদের মধ্যে দিয়ে সাজঘরের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে। দর্শকেরা বসে উন্নত মঞ্চের চতুর্দিক ঘিরে এবং এ মঞ্চ আজকালকার জাপানী কাবুকী থিয়েটার অথবা গ্রীকদের এম্পি থিয়েটার অথবা

সেকস্‌পীয়ারের যুগের এলিজাবেথান থিয়েটারের মত কাজ করে। ঐক্যতান অথবা জুড়ী গানের—যা এক সময় যাত্রার এক বিশিষ্ট নিয়ম ছিল—উল্লেখ করতেই হবে। উকিল বা আইন ব্যবসায়ীরা আদালতে উপস্থিত হবার সময় যে রকম চাপকান পরেন, সেই রকম চাপকান পরিহিত একদল লোক নিয়ে এই জুড়ীদল গঠিত। এরা কোন একটা বিশেষ নাটকীয় মুহূর্তের পরেই গাইবার জন্য ওঠে, যার সঙ্গে মূল নাটকের রীতিমত সম্পর্ক আছে। এক অভিনয়ের মধ্যে অভিনেতাদের কিছুটা অবসর দেবার জন্য কোন অঙ্ক শেষে বা বিরতির সময়ে গান করে শুধু। দর্শকবৃন্দের মনোযোগ নাটকের প্রতিক্রিয়ার দিকে আকৃষ্ট করে রাখবার জন্যই যে এরা গান করে তা নয়, নাটকীয় আবহাওয়া এবং মূল সুরটাকেও বজায় রাখে এবং বারোজন গায়ক দ্বারা গঠিত একদল চারণ তা অনুসরণ করে। এই জুড়ীগানের সব চেয়ে মূল্যবান দিক হোল এই যে এতে পুনঃপুনঃ অনুশীলন প্রয়োজন হয় কারণ এই জাতীয় সঙ্গীত বা ঐক্যতান গান কোন দক্ষ লোকের দ্বারা গাওয়ান হোত না। এই জন্য কষ্টসাধ্য অনুশীলন দরকার ছিল। জুড়ীগান নামে পরিচিত এই ঐক্যতান গান পুরাতন গ্রীকদের বিয়োগান্ত নাটকে যে ঐক্যতান গান ছিল তার সঙ্গে সমগোত্রীয়। এর মধ্য দিয়েই নাটকের মূল সুর পরিস্ফুট হয়।

যেমন সাধারণতঃ ভাবা হয়, যাত্রার উপস্থাপনার পদ্ধতি ততটা সহজ নয়। এর পৃষ্ঠপোষকরা সাধারণতঃ সেই অঞ্চলের ধনী ব্যক্তিরাই হয়ে থাকেন। এরাই যাত্রাদলের পালনকর্তা এবং এঁরাই সব ব্যয়ভার বহন করেন, বিশেষ করে যখন অনুশীলনের পর অনুশীলন চলতে থাকে। যাত্রাভিনয়কে ত্রুটিহীন বা নির্দোষ করবার জন্য এই অনুশীলন করতেই হয়।

এই স্বল্প পরিসরের মধ্যে সম্পূর্ণ অর্থপ্রকাশক এই প্রবন্ধকে পূর্ণতা দেবার জন্য—এই অদ্ভুত অভিনব যাত্রাদল সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা দরকার। যাত্রার ঐক্যতান বাদকদলের জন্য অপরিহার্য রকমে দরকার

পাখোয়াজ ঢোলক এবং বেহালা। কারণ শুধু এরাই খাঁটি যাত্রাগানের আবহাওয়া সৃষ্টি করে। এদের বাদ দিলে যাত্রার অনেকটা সৌন্দর্যহানি ঘটে। অন্যান্য সঙ্গীতের মধ্যে আছে গ্রামীণ সুরে কীর্তনগান, একক গান এবং যাত্রার সখীদের জন্য নৃত্যছন্দের গান। ১৮৫০ সাল থেকে সখের যাত্রাদলগুলো এ বিষয়ে পেশাদারী যাত্রাদলের চেয়ে অনেক বেশী কৃতিত্ব দেখিয়েছে।

যাত্রায় ঐক্যতান-বাদকের দল গঠিত হোত ১২ থেকে ১৫ জন লোক নিয়ে। এরা সাধারণতঃ খুবই গুণ-সম্পন্ন যন্ত্রশিল্পী। আজকাল এ রকম যন্ত্রশিল্পী আর দেখা যায় না। এই বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে বেহালা সবচেয়ে জনপ্রিয়। এর প্রচলন এত বেশী ছিল যে রাস্তার গাইয়েরা পর্যন্ত এই বেহালা বাজিয়ে গান করে করে ভিক্ষা করত। গানের সঙ্গত এবং যাত্রার ঐক্যতান বাদনের যন্ত্রহিসাবে ক্লারিওনেট (এক প্রকার বাঁশী) আর একটি জনপ্রিয় বাদ্যযন্ত্র। করতাল, ঢোল মৃদঙ্গ, তবলা এবং পাখোয়াজও অত্যন্ত আবশ্যকীয় বাদ্যযন্ত্র। এগুলি ছাড়া কেনো ঐতিহ্য সম্পন্ন যাত্রাদল চলতেই পারে না।

যাত্রায় যে অভিনয় হয় তা সাধারণতঃ থিয়েটারের মত, যদিও এর নিজস্ব একটা বিশেষ ধরণের কলাকৌশল আছে। যার মধ্যে রয়েছে বৃত্তাকারে তৈরী যাত্রা—আসরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত এবং চতুর্দিকব্যাপী চলাফেরার সুশোভন চলনভঙ্গী ইত্যাদি।

এর অভিনয় সাধারণতঃ রাত্রিতে ৭।৮ ঘণ্টা ধরে চলার পর ভোরে শেষ হয়। কখনও বা দেখা গেছে প্রাতঃকালে আরম্ভ হয়ে বিকাল পর্যন্ত চলেছে। আজকাল এই অভিনয়কাল অনেক কমান হয়েছে।

পুস্তকের বিষয়বস্তু অনুযায়ী পোষাক নির্বাচন করা হয় এবং এর পোষাক থিয়েটারের পোষাকেরই মত। উপর থেকে, পার্শ্ব থেকে এবং মেঝে থেকে আলোর কলাকৌশল প্রয়োগ করা হয়। কিছুটা স্তিমিত আলোক ব্যবহার করা হয়। এই রকমই কলকাতার অধিবেশনে দেখা গিয়েছিল। পুরাতন যাত্রায় এ সব দেখা যায় না।

যাত্রায় এই সব জিনিষ নতুন আমদানী। সাধারণতঃ যাত্রায় বসার ব্যবস্থা হয় জমিতে আসন বিছিয়ে। কিন্তু সাম্প্রতিক কলকাতার উৎসবে বসার ব্যবস্থা হয়েছিল চেয়ারে এবং গ্যালারীতে। এ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অভিনব এবং সেই জন্যই ত্রুটি অন্বেষী কলকাতাবাসী সমেত বহু দর্শক আকর্ষণ করতে পেরেছিল। কলকাতার লোকেরা সিনেমা থিয়েটারে যাওয়ায় অভ্যস্ত বলে মেঝেতে বসায় অসুবিধা বোধ করে। এবং মেঝেতে বসার ব্যবস্থার দরুণই যাত্রা অতীতে শিক্ষিত লোকদের বেশী আকর্ষণ করতে পারেনি। কারণ গঞ্জে, বাজারে জনসাধারণের বাৎসরিক পূজা উৎসবের অঙ্গ হিসাবে যে যাত্রাভিনয় হত তাতে বসার ব্যবস্থা মাটিতে থাকত বলেই তারা যেতে চাইত না। এর পৃষ্ঠপোষক দোকানদাররই। কয়েকটি মাত্র চেয়ারের ব্যবস্থা থাকত পেছন দিকে, স্থানীয় জমিদার, উচ্চপদস্থ সরকারী-বেসরকারী কর্মচারী ও বিশেষভাবে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের জন্য।

পশ্চিম বাংলায় অনেক নামকরা যাত্রার দল আছে এবং এদের বেশীর ভাগই কলকাতার অধিবেশনে যোগদান করেছে। পূজার পূর্বে সাধারণতঃ তারা বাংলার সীমানায় এবং বিহারে কয়লার খনি অঞ্চলে তাদের আসর বসায়। তারা আসামের চা-বাগানগুলিতেও ভ্রমণ করে। এই অধিবেশন সাধারণতঃ শরৎকালে ও শীতকালে আরম্ভ হয়, যখন ফসল ঝেড়ে কেটে ঘরে তোলা হয়। বর্ষাকালটাই এদের প্রস্তুতির সময়।

পরিশেষে আমি বলতে চাই, যাত্রা যতই আধুনিকীকরণ করা হোক, যতটাই নতুনত্ব এতে আনা যাক, বা মাইক্রোফোন ব্যবহার, আলোকসম্পাত এবং বসার ব্যবস্থার যতটাই উন্নতি সাধন করা হোক না কেন, পুরাতন যাত্রার কলাকৌশল আধুনিক যাত্রার চেয়ে অনেক ভাল। কোন ধনী ব্যক্তিই পুরাতন যাত্রা হিসাবে এর পৃষ্ঠপোষকতা করতে এগিয়ে আসবেন না। কাজেই এটা পরিষ্কার যে, যাত্রা দুর্দিনের মধ্যে এসে পড়েছে। চতুর্দিকে একটা আর্থিক সঙ্কটের দরুণ

সখের যাত্রাদলের সংখ্যাও খুবই কমে যাচ্ছে। উপর উপর কিছু উন্নতি দেখা গেলেও একথা বলতেই হবে যে যাত্রা তার প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। পুরাতন যাত্রার সে উৎসাহ উদ্দীপনাও আর চোখে পড়ে না। আধুনিক যাত্রা থিয়েটারেরই আর একটা দিক এবং গ্রাম্য লোকশিল্প হিসাবে এর যা বৈশিষ্ট্য তা আজ একেবারেই বিলুপ্ত।

।। আমার অভিজ্ঞতা এবং রবীন্দ্রনাথের অভিনয় ।।

রবীন্দ্রনাথের নাটক সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হয়েছে, যদিও এখনও অনেক বলার আছে। নাট্যকার হিসাবে রবীন্দ্রনাথ প্রচুর লিখেছেন, এবং যদিও তাঁর কিছু কিছু নাটকের অভিনয় অত্যন্ত শক্ত, তথাপি অনেক বইই অভিনীত হয়েছে, এবং অত্যন্ত সাফল্য উৎকর্ষের সঙ্গেই তা হয়েছে। তাঁব প্রারম্ভিক নাট্য প্রচেষ্টায় বৈদেশিক লেখকদের বিশেষ করে সেকস্‌পীয়রের প্রভাব পড়েছিল কিন্তু এই ধারা পরে বদলে যায়, এবং তিনি নাটকে স্বদেশী নাট্যোপকরণ ঢোকাতে থাকেন। বাংলার লোক সমাজে প্রচলিত যাত্রা ও পালাগান তাঁর নাটকে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁর নাটক রচনা পাশ্চাত্য ধারায় আরম্ভ হয়ে স্বদেশী ধারায় এসে শেষ হয়; এবং তিনি নাট্য শিল্পের সকল দিক নিয়েই পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছেন, যেমন কল্পনা সমৃদ্ধ প্রেমের নাটক, গীতিনাটক, নৃত্যনাটক পাঠ্যনাটক প্রহসন, গীতবহুল যাত্রাধর্মী নাটক, আদর্শ প্রতিষ্ঠার শিক্ষা মূলক নাটক, ভাবব্যঞ্জক নাটক ইত্যাদি।

তিন প্রকারের অভিব্যঞ্জনা আছে। যেমন যুদ্ধপূর্ব, যুদ্ধকালীন এবং যুদ্ধপরবর্তি। তাঁর লেখা প্রথম প্রকার নিয়েই যেমন দেখা যায় মুক্তধারা এবং রক্তকরবীতে। অধুনা আমাদের দেশের নাট্যকারেরা দাস মনোবৃত্তি নিয়ে—পাশ্চাত্যের ভাবধারার অনুকরণ করে চলেছেন। সেইজন্য বাংলা নাটকের মৌলিকতা ও স্বাদ-বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয়েছে। শুধু রবীন্দ্রনাথই এই সময়ের বাংলা নাট্যকাবের থেকে স্বতন্ত্র এবং অতুলনীয়। তাঁর লেখায় তিনি পর-রীতি অনুসরণ করেন নি। তিনি নতুন নতুন সৃষ্টি করেছেন এবং নবরূপে রূপায়িত করেছেন।

তাঁর পুরাতন নাটকগুলিকে তাঁর প্রগতিশীল নাট্যচেতনার সঙ্গে সামঞ্জস্য আনতে। কাজেই নিজেই তিনি বিবিধ রচনায়, প্রবন্ধে, চিঠিতে, ডায়েরীতে এবং নাটকের প্রস্তাবনায় যেমন নির্দেশ দিয়েছেন সেই ভাবেই তার নাটকগুলি উপস্থাপিত করতে হবে, অবশ্য যদি আদপেই আমরা সেগুলিকে নির্ভুল ও রাবীন্দ্রিক ধাঁচে করতে চাই। রবীন্দ্রনাথ কাজেই নিজের ধাঁচেই রঙ্গমঞ্চের পরিকল্পনা করেছিলেন। সে হবে এমন জায়গা, যেখানে এক স্থানে বাংলার নিজস্ব লোকগীতি, নৃত্যনাটিকা, যাত্রা, পাঁচালী, ইত্যাদি হতে পারবে। যে মঞ্চ তিনি পরিকল্পনা করেছিলেন তা বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ করেনি। যদি ঠিক ভাবে রূপায়িত হোত তাহলে নাট্য জগতে সে হতো আর এক বিস্ময়। নটীরপূজা -যা জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে মঞ্চে অভিনীত হয়েছিল যাতে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বৌদ্ধ সন্ন্যাসী উপালীর ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন—তিনি প্রেক্ষাগৃহ থেকে সরাসরি মঞ্চে গিয়ে উঠেছিলেন। এবং সেই ভূমিকার সংলাপে যে চিন্তাধারা বিস্তৃত সেই অনুযায়ীই অভিনয় করেছিলেন। এটা হয়েছিল জাপানের কাবুকী মঞ্চের 'হানামিচীব' নিয়মে।

এই শতবার্ষিক উৎসব বৎসরে প্রত্যেকেই তার নিজের ধারা ইচ্ছানুযায়ী রবীন্দ্রনাটকের অভিনয় কবছে এবং রবীন্দ্রনাথ যে সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পটভূমিকায় এগুলি লিখেছিলেন তা অগ্রাহ্য করেই তা করছে। তাতে করে তারা কবিস্বীকৃত জীবনাদর্শকে কলুষিত করছে এবং রবীন্দ্র নাটকের মর্ম্ম অনুধাবনে ব্যর্থ হচ্ছে। কাজেই রবীন্দ্র নাটকের আসল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হচ্ছে। যদি এগুলি সঠিকভাবে উপস্থাপিত করতে হয়, তাহলে সর্বাগ্রে রবীন্দ্রনাথের ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে একটি রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ করতে হয়। আমি মনে করি তার নাটকের অভিনয় বিশ্বকবির বিশেষভাবে পরিকল্পিত রঙ্গমঞ্চে ছাড়া অন্য কোথাও হতে পারে না। সাধারণ পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ এই উদ্দেশ্যে আদৌ উপযুক্ত নয়।

যারা আমার মত পেশাদারী অভিনেতা নয়, তাদের পক্ষে, রবীন্দ্র নাটকের উপস্থাপনার সঠিক পদ্ধতি হৃদয়াঙ্গম করা খুবই শক্ত। রবীন্দ্র-নাটক অভিনয় কালে একজন অভিনেতার যে মনোভাবের উদয় হয়, এবং সে সম্বন্ধে তার যে অভিজ্ঞতা তা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। আজকের কোন পেশাদারী অভিনেতা আমাকে এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করেন নি। তথাপি আমি জানাব এ সম্বন্ধে আমার কি মনোভাবের উদয় হয় এবং কেমন করে আমি এটাকে অনুভব করি।

১৯২৩ সালে আমি আর্ট থিয়েটারে ছিলাম। ঐ বছরের আগষ্ট মাসের ২৫, ২৭ এবং ২৮ তারিখে রবীন্দ্রনাথ এম্পায়ার থিয়েটারে 'বিসর্জন' নাটকের অভিনয় করেন। এই এম্পায়ার থিয়েটারই এখন রক্সী সিনেমা নামে অভিহিত। বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রধান শিল্পী, নাট্যকার এবং পরিচালক শ্রীঅমৃতলাল বসু "ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ"-এ লিখেছিলেন—রবীন্দ্রনাথের নাটক জনসাধারণের মনে এখনও কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। অধিকন্তু অনেকে এ অভিনয় দেখার কোন আবশ্যকতাই বোধ করেন নি। তাঁরা বলেন যে এগুলো জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীর নিজস্ব ধরণে সখের অভিনয়, এবং সেই জন্যই এ একপ্রকার স্বতন্ত্র ধরণের অভিনয় বলেই ধরতে হবে, সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রচলিত ধারা এখানে দেখতে পাওয়া যায় না। অত্যন্ত কৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষিত লোকেরাই মঞ্চে এই অভিনয় দেখেছিল। এগুলো সাধারণ লোকেদের জন্য নয়। যিনি নিজে একজন বিখ্যাত নট ছিলেন সেই অমৃতলালের এই প্রবন্ধ পড়ে লোকেরা বিস্মিত হয়েছিল। সহসা জনসাধারণ উৎসাহিত হয়ে উঠল। তারা ভাবল, অমৃতলাল যখন অত প্রশংসা করেছেন, তখন নিশ্চয়ই এতে দেখার মত বস্তু আছে। এমন কি বাংলা সাহিত্যের সুবিখ্যাত ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র এত উৎসাহিত বোধ করেছিলেন যে তাঁকে বলতে হয়েছিল যে তিনি এ অভিনয় দেখবেনই, নাহলে তিনি মরেও

শান্তি পাবেন না। তিনি শ্রীঅমল হোমকে লেখা তাঁর এক চিঠিতে একথা স্বীকার করেছেন। আমরাও এটা দেখতে অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হয়েছিলাম। দেখতে নিমন্ত্রিতও হলাম এবং 'বক্সে' আসন গ্রহণ করলাম। এই সময় এক ভদ্রলোক চুপি চুপি আমাদের কাছে বললেন, যখন অভিনয় চলতে থাকে তখন কারুরই প্রশংসা সূচক হাততালি দেওয়া উচিত নয়। এই ভদ্রলোক এক 'বক্স' থেকে অন্য 'বক্সে' ঘুরে ঘুরে দর্শকদের অনুরোধ করতে লাগলেন যে তারা যেন নীরবে বসে অভিনয় দেখেন। পর্দা উঠে গেল এবং দেখা গেল কবি জয়সিংহের ভূমিকায়, দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর রঘুপতির এবং রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর অবতীর্ণ হয়েছেন রাজার ভূমিকায়। নাটক হিসাবে বিসর্জনে কোন গান ছিল না। কিন্তু কয়েকটি জনপ্রিয় গান রবীন্দ্রনাথ নিজেই এতে জুড়ে দিয়েছিলেন এবং শ্রীমতী সাহানা দেবী সেগুলি গেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ৬২ বৎসর। কিন্তু তিনি মঞ্চে এমন সহজ নমনীয় দেহভঙ্গীতে ও সুন্দরভাবে চলা ফেরা করতে লাগলেন যে কেউ ভাবতেই পারেনি যে তাঁর অতখানি বয়েস হয়েছে। তাঁর ঝুলন্ত শ্মশ্রু চারধারে পাকিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল এবং কালো রং করা হয়েছিল। অভিনয় চলাকালীন কেউই হাততালি দিল না। কেউ জায়গা ছেড়ে উঠল না বা একটা কথাও বলল না। সমগ্র প্রেক্ষাগৃহ নীরব এবং নিশ্চল। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল দর্শকরা মুগ্ধ হয়ে শুনছিল—তারা যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে নীরব হয়েছিল।

ভাল অভিনেতার ব্যক্তিত্ব থাকা দরকার। যাদের তা নেই তারা বড় অভিনেতা হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথও তাঁর 'ইয়োরোপ যাত্রীর ডায়েরী'তে এই অভিমতই ব্যক্ত করেছেন, "আমি আজ 'লিসিয়াস' থিয়েটারে গিয়েছিলাম। স্কটের লেখা 'ব্রাইড অফ ল্যামারমুর' থেকে নাটকে রূপান্তরিত বই সেখানে অভিনীত হয়েছিল। নায়কের ভূমিকায় ছিলেন আর্ভিং। তার উচ্চারণ ছিল অস্পষ্ট।

কায়দা করণ ভাবভঙ্গী ছিল অদ্ভুত। তথাপি তিনি শ্রোতাদের হৃদয় জয় করেছিলেন এক অভিনব উপায়ে।”

ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত নাট্য সমালোচকরা খ্যাতনামা আর্ভিং এর পরিষ্কার ব্যক্তিত্বের বিস্ময়কর গুণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছিলেন, যদি অভিনয় থেকে এই বিশেষ গুণটিকে সরিয়ে নেওয়া হয় তাহলে তার অভিনয়ে আর কিছুই থাকে না। রবীন্দ্রনাথ অভিনেতা হিসাবে এই বিশেষ গুণটির অধিকারী ছিলেন।

সেদিন সে অভিনয়মঞ্চে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে অধিকতর প্রাণবন্ত ব্যক্তিত্ব আর ছিল না। তার প্রশস্ত ললাট, সমুজ্জ্বল চোখ, উন্নত নাসা এবং সুস্পষ্ট বাচনভঙ্গী, তাঁর সুমিষ্ট কণ্ঠ সমস্তই ছিল বড় অভিনেতার উপযোগী। যখন তিনি অভিনয় করতেন তাঁর সমুজ্জ্বল আঁখি ঔজ্জ্বল্যে চমক দিতে থাকত, যেন বিদ্যুতের ঝলক লাগছে। এ সকলই ঈশ্বর প্রদত্ত গুণ। এই সুদক্ষ অভিনেতার দিক থেকে জোর পূর্বক নাটকীয় প্রভাব বিস্তারেব কোন চেষ্টাই ছির্ল না। আমি ভেবে পাই না, তাঁর অভিনয় কি যাদু মন্ত্রের প্রভাবে অমন প্রাণবন্ত হোত!

পাশ্চাত্য নাট্য কলাকৌশলের মধ্যে “শিল্পীব মিতব্যয়িতা” বলে একটা কথা আছে। এব অর্থ এই যে অভিনেতাদের চলাফেরা উচ্চারণ ও বাক্যে কোথাও কোন রকম অতিরঞ্জন থাকবে না। রবীন্দ্রনাথের অভিনয় আমাকে এই কথার সত্যতা স্মরণ করিয়ে দেয়। তাঁর চোখের পাতা নাড়াবার জন্য কোন চেষ্টার প্রয়োজন হোত না। তাঁর অভিনয় সমগ্রভাবে শিল্পীর মিতব্যয়িতার এক আদর্শ কেতাব বললেই হয়। খুব ভাল অভিনয়ের জন্য যে গভীর মনোসংযোগের প্রয়োজন তা তাঁব মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় ছিল। কিন্তু তখন তাব গভীরতা পরিমাপ করতে পারতাম না। এর অভিজ্ঞতা অবশ্য, আমি অর্জন করেছিলাম পরে ১৯২৬ সালে যখন রবীন্দ্রনাথের নাটক “শোধবোধ” মঞ্চস্থ করবার জন্য প্রস্তুতি চলছিল।

নাটকের নায়ক সতীশ তার অফিসের তহবিলের টাকা আত্মসাত করার পর আত্মহত্যার চেষ্টা করছিল। এর পূর্বে সে তার বাগানের চারাগাছের পাতা বেত্রাঘাতে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলছিল, এখানটার অভিনয় একটু অন্যরকম ভাবে করার দরকার ছিল। আমরা যদি এই ভূমিকায় অভিনয় করতাম, তাহলে এতে একটা অতিরঞ্জিত নাটকীয় প্রভাব সৃষ্টি করতাম। ঠিক ভাবে অভিনয় করার জন্য আমি কবিকে অনুরোধ করেছিলাম ঐ জায়গাটা একটু আমার কাছে পড়তে। আমি বিশ্বাস করি তাঁর পরিমাপ করা পাঠ অনুযায়ী অভিনয় করলেই নাটকীয় প্রভাব সৃষ্টি করা যাবে। এর একটু বেশী বা কম করলেও হবে না। তিনি সম্মত হলেন এবং পড়লেনও।

যখন তিনি ঐ অংশটা পড়ছিলেন, তিনি এতবেশী ঐ চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন যে পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে অচেতন ছিলেন। যে বেদনা নায়কের মনকে বিদীর্ণ করছিল, সেই মুহূর্তে তাঁর মানসপটে তা ফুটে উঠেছিল। গভীরভাবে আমার মনে এ ইচ্ছা এসেছিল যে কি করে আমি কবির মত করে ঐ কথাগুলো বলতে পারি, যাতে অভিনয়ে অবশ্যম্ভাবী অতি নাটকীয়তা বর্জন করা যায়। এমন গভীর মনোনিবেশ আমি কোথাও দেখিনি, যে গভীরতা আমাদের চারিপাশের পরিবেশকে একেবারে ভুলিয়ে রাখে।

তাঁর আর একটা বড় গুণ এই ছিল যে তিনি তাঁর অভিনয়ে এক মনোমুগ্ধকর শক্তি ফুটিয়ে তুলতেন এবং তা দর্শকবৃন্দের মনের উপর এক যাদুমন্ত্রের প্রভাব বিস্তার করত। বিখ্যাত রাশিয়ান পরিচালক নেমিরোভিচ্ ডান-চেভেক বলেছিলেন যে বড় অভিনেতা হতে হলে থাকা চাই ব্যক্তিত্ব, শিল্পচাতুর্য, সারল্য, মনোসংযোগ, এবং সর্বোপরি মোহিনী শক্তি। তিনি লিখেছিলেন একজন অভিনেতা কল্পনাশক্তি, বুদ্ধিমত্তা এবং রুচিবোধের পরিচয় দিতে পারে, কিন্তু তার দর্শকদের উপর প্রভাব, তার ধারণ ক্ষমতা কোন এক স্থানে এসে থেমে যাবেই, অন্যদিকে যার অভিনয়ে মনোমুগ্ধকারী শক্তি আছে, সে দর্শকবৃন্দকে

শেষপর্যন্ত মুগ্ধ করে ধরে রাখবেই। এই মনোমুগ্ধকর শক্তি কি কারুর মধ্যে দিয়ে দেওয়া যায়? প্রশিক্ষণের ভিতর দিয়ে কি এই শক্তি অর্জন করা যায়?

এই গুণগুলো প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে অর্জন করা যায় না। তিনি আরও বলেছিলেন এই যে মুগ্ধকারী যাদুশক্তি এ অভিনেতার নিজস্ব, এ তার সহজাত। বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা এ শক্তি লাভ করা যায় না। দর্শকেরা সমগ্রভাবে এই মোহিনী শক্তির উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতি দুই বুঝতে পারে।

এটা সম্ভব হয়েছিল কারণ কবি একজন ব্যঞ্জনাময় শিল্পী এবং এবং উচ্চস্তরের রসবেত্তা। সাধারণ অভিনেতা হয় আবেগের সঙ্গে অভিনয় করে আর না হয়তো পরিস্থিতি বুঝে সেই অনুযায়ী অভিনয় করে কিন্তু পুরাতন পদ্ধতি অনুযায়ী রস সৃষ্টির চেষ্টা করে না। রসের সৃষ্টি হয় ভাব বিভব এবং অনুভব থেকে। কবি এই 'রস' থিয়োরী অনুসরণ করে অভিনয় করতেন। কেউ যদি স্থায়ী সঞ্চারী ও সাত্বিক ভাব এবং বিভব আয়ত্বে আনতে না পারে তাহলে সে কিছুতেই রস থিয়োরী অনুসরণ করে অভিনয় করতে পারবে না। যাঁরা ভাবেন যে নিরলস ও একনিষ্ঠ চেষ্টার দ্বারা ভাল অভিনেতা হওয়া যায়, তারা ভুল করেন। রবীন্দ্রনাথের অন্তরাত্মা ছিল রসময় এবং আবেগপূর্ণ এবং অভিনয় করবার সময় তিনি সেই রস আর আবেগ দিয়েই তা করতেন। কাজেই তাঁর অভিনয় অত প্রাণবন্ত ও উৎকৃষ্ঠ হোত।

১৯২৫ সালে ষ্টার থিয়েটার 'গৃহপ্রবেশ' মঞ্চস্থ করবে বলে স্থির করল। আমি আমাদের একজন সঙ্গীতজ্ঞকে (অর্গ্যান বাদক) জোড়াসাঁকোয় কবির বাড়ীতে প্রায়ই নিয়ে যেতাম তাঁর কাছ থেকে এই নাটকের জন্য গানের স্বরলিপি ঠিক করে আনতে। কবি মধুর কণ্ঠে গাইতেন আর সে শুনতো এবং প্রায়ই কবিকে সেই গান পুনঃ পুনঃ গাইতে অনুরোধ করতো। যাতে সঠিক এবং নির্ভুল স্বরলিপি নিতে পারে। কবি কখনও বিরক্ত হতেন না। ক্লান্তিবোধ করতেন

না বা তাঁকে কখনও বিব্রতও দেখাত না। নাটকের নায়ক যতীনের ভূমিকায় আমার যে সংলাপ ছিল তিনি আমাকে তা পড়ে দিতেন। যখন এ কাজ সম্পূর্ণ হোত তাঁকে স্পষ্টতই খুশী দেখতাম এবং তাঁর চোখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠতো। তিনি মৃদু হেসে বলতেন "ভাল।" দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরও ষ্টার থিয়েটারে আসতেন গানে প্রশিক্ষণ দিতে এবং আমাদের সঙ্গীতজ্ঞ কর্তৃক গৃহীত স্বরলিপি সঠিকভাবে চলছে কিনা তা দেখতে। অনুশীলন পুরাদমে চলছিল। দৃশ্যপট ইত্যাদির পরিকল্পনা গগনেন্দ্রনাথই করেছিলেন এবং তাঁর নির্দেশেই তা তৈরী হোল। ১৯২৫ সালের ২৫শে ডিসেম্বর এ বই প্রথম মঞ্চে অভিনীত হোল। তৃতীয় অভিনয়ের দিন ছিল ২৯শে ডিসেম্বর এবং সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপিত হোল যে কবি নিজেই এই অভিনয় দেখতে ষ্টারে আসছেন। তিনি প্রথম সারিতে আসন গ্রহণ করলেন এবং পরে পেছনে গিয়ে বসলেন দোতলায় ঝুল বারান্দায় ড্রেসসার্কেলে। যবনিকা পড়তেই আমি কবির কাছে ছুটে গেলাম এবং অভিনয় দর্শনে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলাম। কবি মৃদু হাসলেন এবং অভিনয় দেখে খুশী হয়েছেন বোঝা গেল। পরিহাস করে বললেন "এখানে কি করে তোমরা অভিনয় করবে? নীচের তলায় মেঝেতে নিরবচ্ছিন্ন পায়ের শব্দ এবং উপরে আমি শুনতে পেলাম ট্রামগাড়ীর শব্দ। এত গোলমালের মধ্যে কি করে তোমরা মনোসংযোগ করতে পার?" আমি পূর্বেই তোমাদের তাঁর গভীর মনোসংযোগের কথা এবং আমরা যারা তাঁর কাছে প্রশিক্ষণ নিতে যেতাম, তাদের প্রতি তার সহানুভূতির কথা বলেছি। তিনি আমাদের বললেন তার পরের দিনই তাঁর বাড়িতে আস্তে এবং আমরাও গভীর আগ্রহের সঙ্গে সেই পরের দিনের অপেক্ষায় রইলাম এবং ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে গিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হলাম। তিনি অনেক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করলেন্। এই আলোচনার সময় তিনি সংলাপেরও কিছু কিছু পরিবর্তন করতে চাইলেন। আমাকে পুনরায় গিয়ে তা বাড়ী নিয়ে আসতে বললেন।

আমি গিয়েছিলাম এবং তিনি আরও কিছু নতুন সংলাপ পাতার উপরের দিকে এবং পাশের মার্জিনে যোগ করে দিয়েছিলেন। কোনো কোনো পাতায় তাঁর নিজের সম্পাদনাও রইল। নাটকের এই কপিটা এখনও আমার কাছে কবির স্নেহের নিদর্শন হিসাবে সযত্নে রক্ষিত আছে। এর পরে আরও সংযুক্তি হয়েছিল এবং আর দুইটি সম্পূর্ণ নূতন চরিত্র তিনি যোগসৃষ্টি করেছিলেন। তার একটি হোল এক ছোট বালিকা "টুকরী" এবং দ্বিতীয়টি এক স্ত্রীলোক বৈষ্ণবী। এই প্রকারে পুনরায় মঞ্চস্থ করার পূর্বে ঐ পাণ্ডুলিপিতে অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হোল। আমি তাঁর কাছে সপ্তাহে দুই তিনবার করে যেতাম ষ্টারে আমাদেরঐনাটকের অভিনয় সম্বন্ধে তাঁকে ওয়াকিফহাল রাখতে। তিনিও এ শুনতে আগ্রহান্বিত ছিলেন এবং কখনও কখনও আমাকে পুনরায় দেখা করতে বলতেন। তিনি নাটকের সংলাপে আরও সংযোজন করলেন এবং আমাদের অনুশীলনও চলতে থাকল। একদিন তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন—তুমি সর্বদাই চিৎ হয়ে শুয়ে অভিনয় করেছ, কখনও কি উঠতে ইচ্ছা হয় না? আমি উত্তরে 'না' বলেছিলাম।

আমরা নাটকটিকে তিন অংশে ভাগ করে নিয়েছিলাম। প্রথম অংশের অভিনয় হয়েছিল চেয়ারে অর্ধশায়িত অবস্থায়। দ্বিতীয় অংশে আরাম কেদারায় শায়িত অবস্থায় এবং তৃতীয় অংশে বিছানায় সম্পূর্ণ শুয়ে। নাটকের নায়ক যতীন যদি উঠতো, নাটকে যে বেদনার সুর আছে তা নষ্ট হোত। এ একটি আধা বাস্তব-ধর্মী উপদেশক নাটক। প্রত্যেক লোকের মধ্যেই একটা কবি মন আছে। এবং সেই মনের বাসনা কখনও পূর্ণ হয় না। তা বাস্তবে রূপায়িত হয় না এবং সেই ত ট্রাজেডি। দর্শকেরা নাটকের তাৎপর্য এবং মূল বেদনার সুর বুঝতে পারেনি এবং কাজেই প্রেক্ষাগৃহ আদপেই জনাকীর্ণ হয়নি। কাজেই ফ্রি এবং কম্‌প্লিমেণ্টারী পাশ অবাদে বিতরণ করতে হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ ষাট খানার মত নাটক লিখেছিলেন—প্রত্যেক নাটক

ভিন্ন ভিন্ন ধরণের। প্রত্যেকখানারই বিষয়বস্তু এবং সুর আলাদা। এরা সবই বিবিধ আকারের এবং প্রকারের। কাজেই তাদের উপস্থাপনাও সমভাবে ভিন্ন ভিন্ন ধরণের এবং অভিনয়ও হবে সেই রকমই ভিন্ন ধরণে। তাঁর লেখার ধরণ ধাঁচ এক বই থেকে অন্য বইয়ে বদলে গেছে। এবং কখনও কখনও একই বইয়ে প্রথমে যে ষ্টাইল আরম্ভ হয়েছে পরে তা পরিত্যক্ত হয়েছে অথবা সম্পূর্ণ নতুন ভাবে রূপায়িত হয়েছে। অন্য যে কোন নাট্যকারের লেখার রীতি নীতি বা পদ্ধতি সহজে বোধগম্য হয়, অবশ্য যদি আমরা একটু অনুসন্ধিৎসু চক্ষু নিয়ে লক্ষ্য করি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। তাঁর নাটকের সংখ্যার বিশালতা এবং ধরণের বিভিন্নতার জন্য। সেগুলিকে সঠিক ভাবে উপস্থাপিত করতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণে পুস্তকের সঙ্গে তাল রেখে তা করতে হবে। প্রত্যেক নাটকই প্রত্যেকটা থেকে স্বতন্ত্র ধরণে হবে।

॥ কলকাতায় চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রাথমিক প্রচেষ্টা ॥

এমন কি এই দেশেও আজকাল চলচ্চিত্র নির্মাণ কার্য দ্রুত পদক্ষেপে অগ্রসর হচ্ছে, এবং আমরা এই ব্যবসায়ে সুদিনের ভিতর দিয়ে চলেছি। পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান বা সমীক্ষা দ্বারা দেখা যাবে প্রতি বছর গড়ে ষাটটি করে বাংলা ফিলম্ তৈরী হচ্ছে এবং কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দশটি ফিলম্ তৈরীর ষ্টুডিয়ো আছে। শহরে এবং শহরের বাইরে শতশত ছবিঘর স্থাপিত হয়েছে এবং এদের সকলেরই সুদিন চলছে। এর মধ্যে কতকগুলি আবার আশানুরূপ সৌখীন এবং শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। সমীক্ষা করলেই প্রমাণ পাওয়া যাবে যে কোটি কোটি টাকা এই শিল্পে খাটানো হচ্ছে এবং হাজার হাজার লোক এই সম্পর্কিত নানা শিল্পে, যেমন ফিলম্ তৈরি, ফিলম পরিবেশন, প্রদর্শন ইত্যাদি থেকে অন্ন সংস্থান করছে। ফিলম্ তৈরি শিল্প সাংঘাতিক ভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। এখন সংগত ভাবেই বলা যেতে পারে যে এ এক বিশাল শিল্প। আমাদের মধ্যে অনেকেই যারা অতি বৃদ্ধ এবং আমরা যারা যাদুঘরের গ্যালারীতে আসন লাভের সৌভাগ্যে সন্তুষ্ট না হয়ে এখনও সিনেমা জগতের দ্বারদেশে ক্লান্তভাবে পদচারনা করছি তাদের মন পশ্চাদগামী হয়ে পয়ত্রিশ বছর পিছিয়ে এমন এক যুগে চলে যায়, যা অনেকের কাছে অন্ধকারময় ও নৈরাশ্যজনক বলে মনে হবে। তখন এই রকম উচ্চ প্রাচীরওয়ালা এস্‌বেস্‌টসের ছাদযুক্ত গুদাম ঘরের মত বিজুলী সাজে সজ্জিত উচ্চ তড়িৎশক্তি সম্পন্ন সৌধ এখন যাকে বলা হয় চলচ্চিত্র নির্মাণশালা বা ষ্টুডিয়ো, তা এই শহরের কোথাও দেখা যেতো না।

শিল্প তৈরীর কাজ তখন লোকের অজানা ছিল না এবং তখনও ষ্টুডিয়োতে ফিল্‌ম্‌ তৈরী হোত। তবে আজকাল যা প্রত্যেক লোকে দেখে সে রকম তখন ছিল না। তখন ৯ ইঞ্চি উঁচু মঞ্চযুক্ত দুই তিনটি মাত্র ষ্টুডিয়ো ছিল। 'তাতে মঞ্চের দুই ধারে পনের ফুট উঁচু কাষ্ঠদণ্ড সারিবদ্ধ ভাবে দুধারে সাজান থাকত এবং তাতে সূর্য্যালোক নিয়ন্ত্রন করা যায় এমন পর্দা লাগান থাকত অর্থাৎ সূর্য্যালোক ভেতরে আনাও যেতো এবং ভেতরে আসা বন্ধ করাও যেতো। কলকাতার উপকণ্ঠে একটি বাগান বাড়ীতে এটা স্থাপিত হয়েছিল। বোর্ডের উপর রূপালী কাগজ সেঁটে আলোর প্রতিক্ষেপক নির্মাণ করা হোত। এবং তা অতীব শুভ্র আলোবিকিরণকারী শক্তিশালী আলোকের কাজ করত। বেহালার চিত্র নির্মাণশালা—যেখানে আমরা 'সোল অফ এ স্লেভ' (ক্রীতদাসের আত্মা) চিত্রায়িত করেছিলাম—শুধু কলকাতায় নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে তা অতুলনীয় ছিল। উইলিয়ম ফক্সের পরিকল্পিত মুক্তাকাশ ষ্টুডিয়ো 'ফার্নাণ্ডেলের' আদর্শেই এটা তৈরী হয়েছিল। এটাকে ২০ ফুট উঁচু দুইটি দেওয়াল পরস্পরের সঙ্গে আড়াআড়িভাবে সমকোনে সংস্থাপনপূর্বক চারটি অংশে বিভক্ত করা হয়েছিল। প্রত্যেকটি দেওয়ালে ১৪ ফুট × ১৮ ফুট এবং ১২ ফুট × ১৫ ফুট মাপের কতিপয় খোলা খিলান ছিল যার উপরিভাগে দেওয়ালগুলির সংযোগস্থলে একটা করে ঘুরবার আবর্তন যন্ত্র ছিল আয়নার—প্রতিক্ষেপক ধরে রাখবার জন্য। এগুলো ব্যবহৃত হোত পশ্চাত দিকে উজ্জ্বল আলো প্রতিক্ষেপনের জন্য এবং কয়েকসারি রূপার মত সাদা প্রতিক্ষেপক ছিল শিল্পীদের অনুকৃতি প্রতিফলিত করতে। এছাড়া ছিল পূবে ও পশ্চিমে তিনতলা দুইটি গম্বুজ। ভেতর দিক থেকে মইয়ের সাহায্যে এতে ওঠা হোত। এর মধ্যে সরাসরি সূর্য্যের আলো ধরার জন্য লাগান ছিল আর্শির প্রতিক্ষেপক এবং তারা পালাক্রমে সূর্য্যরশ্মি পাঠাত দেওয়াল শীর্ষে আবর্তন মঞ্চের প্রতিক্ষেপক যন্ত্রে। চিত্রায়নের কাজ চলত খোলা

আকাশের নীচে কিন্তু সরাসরি সূর্য্যালোকে নয়। আমরা কাজ করতাম ছায়ায়। প্রাতঃকালে এদিকে এবং বিকালে সূর্য যখন পশ্চিম দিগন্তে চলে যেতো আমরা উল্টোদিকের প্রকোষ্ঠে উচ্চপ্রাচীর সৃষ্ট প্রচুর ছায়ার মধ্যে কাজ করতাম।

আমাদের পারস্পরিক কায়িক শ্রমের সমস্ত কাজই আমরা নিজেরাই করতাম, কারণ আমাদের শ্রমিক নিয়োগের আর্থিক সঙ্গতি ছিল না। আমার সহযোগী এবং বন্ধু স্বর্গীয় প্রফুল্ল ঘোষ—যিনি পরে বম্বে ও কলকাতার খ্যাতনামা পরিচালকদের একজন হয়েছিলেন —তিনি নিজেই সেলাইয়ের কলে পোষাক' তৈরী করতেন। আমি করতাম শিল্পীদের সাজগোজের কাজ। আমরা ব্যবহার করতাম হলুদ বর্ণের তৈলাক্ত রং এবং অন্যেরা ব্যবহার করত জলবং জিন্‌ক্‌অক্সাইডের সঙ্গে ক্রোম ইয়োলো মিশিয়ে। কিন্তু তৈলাক্ত রং লাগানোর পক্ষে খুবই মসৃন এবং একটা বেশ কোমল মখ্‌মলের মত মসৃন বর্ণ অর্থক্রোমেটিক ফিলম্‌ ফুটিয়ে তোলা হোত।

কখনও আমাদেব কাজের জায়গায় ক্যামেরাম্যান (ছবি গ্রহণকারী) ক্লান্তিবশতঃ ক্যামেরা বহনে অসমর্থ হলে আমাদেরকেই ক্যামেরা বহন করতে হোত। কোন সহকারী ক্যামেরাম্যান বা ক্যামেরা বহনের কুলী ছিল না। আমাদের ক্যামেরা অবশ্য ছোট এবং হাল্‌কা ছিল। এটা ছিল কুড়ি ফুট পর্যন্ত চিত্রগ্রহনোপযোগী 'ময়' ক্যামেরা। তখনও অবশ্য ৪০০ ফুট পর্যন্ত শক্তিযুক্ত দামী ক্যামেরাও ছিল, যেমন এল, জে, এর, "ডেব্রিজ" এবং 'কে' টাইপ ক্যামেরা, দাম ১৫০০ টাকা থেকে ৩০০০ টাকা পর্যন্ত। সর্বাপেক্ষা দামী ক্যামেরা ছিল 'বেল' এবং 'হাওয়েল' ক্যামেরা, দাম প্রায় ১০.০০০ টাকা। আমরা এই সব সৌখীন ক্যামেরার কথা চিন্তা করতেই পারতাম না।

সময় যতই অতিবাহিত হয় এই শিল্প ততই স্থিতি লাভ করতে থাকে এবং জনগণের সিনেমা প্রবণতাও বাড়তে থাকে। সিনেমা

উৎপাদক কোম্পানীগুলিও প্রচুর অর্থ রোজগার করতে লাগল কিন্তু চলচ্চিত্র নির্মাণশালার কাঠামোর বা উন্নততর যন্ত্রপাতি ব্যবহারের দ্বারা কারুকলার উৎকর্ষের দিকে কোন চেষ্টাই হোল না। এদেশে এই শিল্পে শীর্ষস্থানীয় এবং পথ প্রদর্শক 'ম্যাডান কোম্পানী' সর্বঋতুর উপযোগী করে একটা ষ্টুডিয়ো নির্মাণের সঙ্কল্প গ্রহণ করল। এবং এটাকে করতে চাইল তারা আর্মার্ড গ্লাস প্লেট ও মার্কারী ভেপার ল্যাম্প দ্বারা সজ্জিত। মেঝে নিরেট কংক্রীটের তৈরী এবং লৌহ কাঠামোও নির্মিত হোল, কিন্তু অতিরিক্ত শক্তিসম্পন্ন আর্মার্ড গ্লাস পাত যা বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়, তার অভাবে অনাচ্ছাদিতই রয়ে গেল। কারণ এই পাতগুলো কলকাতার বাজাবে মিলত না।

কর্ণওয়ালিশ সিনেমাগৃহে স্থাপিত বেঙ্গল থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানীর জন্য সমস্ত সাজসরঞ্জামসহ একটি ঘুর্ণমান অভিনয় মঞ্চ ইংল্যাণ্ড থেকে অর্ডার দিয়ে আনান হয়েছিল, কিন্তু কোন থিয়েটারেব দলই তখন কর্ণওয়ালিশ সিনেমা গৃহে কাজ করছিল না। অথচ এই সিনেমাগৃহেব মাপেই এই মঞ্চের অর্ডাব দেওয়া হয়েছিল। এর জন্য আর কোন জায়গা না পেয়ে এটা ওইখানেই বসান হয়েছিল। এমন কি ঐ একই আলোকসজ্জা জার্মানীর 'এফা'র কাছ থেকে আমদানী করা হয়েছিল। এগুলিও ঐ কর্ণওয়ালিশ থিয়েটারেব শূন্য রঙ্গমঞ্চে প্রেবণ করা হোল। কিন্তু কি করে এগুলোকে কাজে লাগান যায়? ফ্রামজী ম্যাডানের মনে এক চিন্তার উদয় হয়েছিল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে কর্ণওয়ালিশ বঙ্গমঞ্চকে দিনের বেলায় চলচ্চিত্র নির্মাণের ষ্টুডিয়ো হিসাবে ব্যবহারের আদেশ দিলেন। আমি তখন ম্যাডান ফিল্ম কোম্পানীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলাম এবং 'ইরানের রাণী' থেকে প্রযুক্ত 'মিশরের রাণী' চিত্রে রূপায়ণের কাজে লেগে গেলাম। এটা তখন রঙ্গমঞ্চে দারুণ জনপ্রিয় বই হিসাবে চলেছিল। আমি মূল রঙ্গমঞ্চে আমার যে ভূমিকা তাতেই অবতীর্ণ হলাম।

আমরা সিনেমা দৃশ্য রূপায়িত করতাম সকাল আটটা থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত। আর এ হোত প্রত্যেক কাজের দিনে, অর্থাৎ শনিবার রবিবার এবং ছুটির দিনগুলি বাদ দিয়ে যখন সিনেমা প্রদর্শন আরম্ভ হত তিনটায়।

প্রেক্ষাগৃহে রঙ্গমঞ্চের ঠিক সম্মুখের পথটার উপর উচ্চ মঞ্চ তৈরী করে সিনেমার কাজ করা হোত। ক্যামেরা থেকে ছবি তোলার কোন কৌণিক পরিবর্তন যদি প্রয়োজন হোত তাহলে কর্মরত লোকেরা ঐ ঘূর্ণমান মঞ্চকে ঘুরিয়ে দৃশ্যোপযোগী করে নিত। বড় করে দেখানোর জন্য সন্নিকটস্থ ছবিগুলি প্রধানতঃ 'লেন্‌স্‌' বদল করে তোলা হোত। কদাচিৎ ক্যামেরা মঞ্চের উপর নেওয়া হত। এইভাবেই আমরা 'মিশরের রাণী'র নির্মাণকার্য শেষ করলাম কিন্তু এই পরীক্ষাকার্য খুব সাফল্য অর্জন করলো না। কাজেই এটা পরিত্যক্ত হল। এর পরে এই আলোগুলো ম্যাডানের টেরিটিবাজারের গুদামে রাখা হয়েছিল এবং ওই দুর্ভাগ্যজনক ঘূর্ণমানমঞ্চ কর্ণওয়ালিশ্ সিনেমায় নিয়ে যাওয়া হল। এই সিনেমাগৃহের নির্মাণকার্য তখন চলছিল। এটা একটা সুসজ্জিত সাবলীল আবর্তনযোগ্য শব্দহীন ঘূর্ণমান মঞ্চ, কিন্তু তাতেও কোন কাজ হল না। শেষ পর্যন্ত এর যে কি ঘটল কেউ তা জানে না। ভারতবর্ষে বিদেশ থেকে আনা প্রথম ঘূর্ণমান মঞ্চের এই ছিল পরিণতি। এর এই পরিসমাপ্তির কথা কেউ জানল না, কেউ এর জয়গানও গাইল না এবং এর শোচনীয় মৃত্যুর জন্য কেউ অনুশোচনাও করল না।

এর পরে আরও কয়েকটি বছর নির্বাক ছবিই তৈরী হয়েছিল। তার উন্নতিও হয়েছিল এবং তা পূর্ণ বিকশিত হবার উপক্রমও করেছিল। ঠিক সেই সময় সবাক চলচ্চিত্রের ঘূর্ণিঝড় এর উপর চরম আঘাত হানল। তারপর এল বম্বে থেকে 'আলম-আরা' কিন্তু সেই সময়ের মধ্যে কলকাতায়ও সবাক চলচ্চিত্র নির্মাণের যন্ত্রপাতি এসে গেছে। আমেরিকা এবং ইয়োরোপ থেকে ম্যাডানেরা সম্পূর্ণ

যন্ত্রপাতি ও তা ব্যবহারের কারুশিল্পী ইত্যাদি আমদানী করলেন। একটা শব্দ গ্রহণোপযোগী ষ্টুডিয়ো ছাড়া সবই ছিল। আমরা ছোট ছোট বই, নির্বাচিত দৃশ্য ইত্যাদি জনপ্রিয় মঞ্চাভিনীত নাটক থেকে নিতে আরম্ভ করলাম। কারণ কোনো তৈরী চিত্রনাট্য পাওয়া গেল না। এমন লোক পাওয়া গেল না যে এটা তৈরী করতে পারে। কাজেই মঞ্চে অভিনীত কোন জনপ্রিয় নাটকের ভাল দৃশ্য নির্বাচন করে বিখ্যাত মঞ্চাভিনেতাদের দ্বারা ক্যামেরার সামনে প্রায় চার মিনিট অভিনয় করিয়ে চিত্রগ্রহণ করাই নিরাপদ বলে বিবেচিত হত। কারণ যদিও সাজসরঞ্জাম এসেছিল তবুও বড় ষ্টুডিয়ো বা সম্পাদনার প্রকোষ্ঠ ইত্যাদির কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি, সেগুলি তখন কেবল তৈরী হতে আরম্ভ করেছিল। নির্বাক ছবির উপযোগী যে ক্যামেরা গৃহ ছিল তা মাত্র ৪০০ ফুট দীর্ঘ ফিল্‌ম্ রাখার পক্ষে উপযুক্ত যেখানে সবাক চলচ্চিত্র ফিল্‌মের দৈর্ঘ্য অন্ততঃ ১০০০ ফুট। ওই নির্মাণাগারের সাজসরঞ্জাম, সবই নির্বাক ছবির ফিল্‌ম্ ডেভেলপিং ট্যাঙ্ক (ছবি ধৌত ও বিকশিত করবার জন্য ছোট পুকুর) ফিল্‌ম রাখার তাক, ৪০০ ফুট দীর্ঘ ফিল্‌মেরই উপযোগী ছিল। কাজেই চিত্রে রূপায়িত অংশ সংক্ষিপ্ত করারই প্রয়োজন ছিল। আমরা ষ্টুডিয়োর অভাব বোধ করিনি। কারণ আমাদের স্থান নির্বাচনের জন্য বাইরে টালিগঞ্জ বা রসা ময়দানের কোথাও যেতে হত। যেখানে তখনও নানারকম লতা গুল্ম ও গাছগাছালীর ও অগভীর পুকুর শুদ্ধ অনেক প্রশস্ত স্থান ছিল। আমরা সেখানেই ক্যামেরায় আমাদের ছবি রূপায়ণের কাজ করতাম। কোনো আভ্যন্তরীণ ছবি তোলার দরকার হলে মঞ্চ-মিস্ত্রী তা কোন সান-বাঁধান মেঝেতে নির্মাণ করতো কিন্তু তা সুরক্ষিত কাঁচের পাতের অভাবে অনাচ্ছাদিতই থাকত। সাজ সরঞ্জাম সবই কোরিন্থিয়ান থিয়েটার থেকে ম্যাডানের মোটর লরীতে করে টালিগঞ্জে নিয়ে যাওয়া হোত। তাদের সাজগোজের আয়না ফিট করা দ্রবাদি, তাক,

প্রভৃতি বহন করার জন্য বাক্সও ছিল। এই প্রকারে এই ছবি তোলার দল পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গিয়ে তাদের চিত্র নির্মাণের কাজ করতে পারতো। এই হোল কলকাতায় সবাক চিত্র নির্মাণের প্রারম্ভিক যুগ।

দুই দশকের মধ্যে এই শিল্পের উন্নতি চরমে পৌঁছালো। এই ফিল্ম এখন বৈদেশিক চলচ্চিত্র উৎসবে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এর থেকেও বোঝা যায় না যে আমরা এই শিল্পের যান্ত্রিক কলা কৌশলের দিক দিয়ে দোষত্রুটি মুক্ত। কলকাতা এক সময় বম্বের সব চেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল এবং বাংলা, হিন্দি, উর্দ্দু এবং পাঞ্জাবী ফিল্মই শুধু নির্মাণ করেনি, অসংখ্য তামিল ও তেলেগু ছবিও করেছিল, এবং কিছু কিছু অসমীয়া ও ওড়িয়া ছবিও। দুঃখের বিষয় এখন এখানে শুধু বাংলা ছবির কাজই চলছে এবং সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চলা হচ্ছে শুধু বলিষ্ঠ গল্পের গুণের উপর নির্ভর করে কিন্তু যান্ত্রিক শিল্পকলার দিক দিয়ে অন্যান্য ছবির চেয়ে আমরা পশ্চাদগামী। কেন এমন হল? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুভ ও অনুকুল সময়ে ষ্টুডিয়ো মালিকেরা তাদের নিজেদের ছবি তৈরীর কাজ বন্ধ করে তাদের ষ্টুডিও ভাড়া দিয়ে দিলেন স্বাধীনচেতা ছবিনির্ম্মাতাদের কাছে আরও নিশ্চিত এবং অধিক লাভের আশায়। এগুলো ব্যাঙের ছাতার মত গণনাতীত সংখ্যায় গজিয়ে উঠেছিল এবং দিবা-রাত্রির কর্মসূচি নিয়ে বিরামহীন কাজ চালিয়েছিল। অতিরিক্ত মেঝে বা ফিল্ম্ মঞ্চের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল এবং সমস্ত সংরক্ষিত এবং ফেলে রাখা সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি বিরামহীন ভাবে কাজে খেটেছিল। সন্দেহ নেই যে এতে তাদের প্রচুর অর্থাগম হয়েছিল। কিন্তু তাতে যন্ত্রপাতি জীর্ণ হয়ে পড়েছিল। তাদের কিছু কিছু বদলে ফেলাও হয়েছিল এবং কিছু স্থানীয় ভাবে পুরাতন যন্ত্রাংশের দ্বারাই মেরামত করা হয়েছিল, কারণ কোন নতুন যন্ত্রাংশ পাওয়া যায়নি। তারপর যেগুলো স্থানীয়

বাজারে পাওয়া যায়নি তার জন্য অর্ডার দেওয়া হয়েছিল। এবং সেগুলোও যুদ্ধ শেষ হবার অনেক পরে এসেছিল। যে টাকা এক সময় জলস্রোতের মত এসেছিল তা এখন বিরল হয়ে পড়ল, এবং তাদের পকেট খালি করে উবে গেল। কাজেই অর্ডার দেওয়া সাজসরঞ্জামের কিছুটা নেওয়া হোল এবং বাকিগুলো অবহেলিত রয়ে গেল। কতকগুলি 'মাইক্রোফোন' বা ধ্বনীউচ্চতাবর্দ্ধক যন্ত্র এল কিন্তু তাদের কাজে খাটাবার দণ্ড এল না। কাজেই সেই পুরাতন মাইক্রোফোনই রয়ে গেল। এগুলো ২০ বছর ধরে কাজ করে করে মরিচা ধরে গিয়েছিল এবং এগুলোতে অনাবশ্যক আওয়াজ হোত। লণ্ঠন এসেছিল কিন্তু তাদের উচ্চশক্তিসম্পন্ন শুভ্রালোক বিকিরণকারী বাল্ব আসেনি। এমন কি কতকগুলি ক্যামেরা এসেছিল কিন্তু তাদের "ডলী" এবং "ট্রলীগুলো" এত পুরানো এবং জীর্ণ যে তড়িৎশক্তি দ্বারা তাদের আর কোন কাজে লাগান গেল না। যদি সমগ্র যন্ত্রপাতির নল ও 'লক' পুনঃস্থাপন করা না হয় তাহলে উৎপাদনের কাজ দারুণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। যাঁরা সত্য সত্যই পশ্চিমবঙ্গে এই শিল্পের উন্নতির কথা ভাবেন তারা নিশ্চয়ই এর ভবিষ্যতের অন্ধকারময় দিকটার কথা গভীরভাবে চিন্তা করবেন। যদি বাংলার স্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে বাংলার শৃঙ্খলাপূর্ণ আদর্শ পল্লীজীবন নিয়ে দুই একখানা ভাল ছবি নির্মিত হয়, ধরা যাক, এই যেমন বাংলার বেণুকুঞ্জে এক বনময় আদিম পরিবেশে পর্ণকুটির, এক শান্ত স্নিগ্ধ আবহাওয়ায় কুমুদ শোভিত দীঘিকায় ঈষৎ কম্পিত ক্ষুদ্র তরঙ্গ দল অথবা সুশোভন শাড়ী পরিহিতা এক কৃষ্ণাঙ্গী পল্লীবধূ নিশাবসানে শুভ্র প্রাতে তার গৃহদেবতার বেদীপাদমূলে সলজ্জ ভীরু পদক্ষেপে চলেছে এবং এই প্রকার আরও কিছু কাব্যিক ফলপ্রসু বস্তু নিয়ে ছবি নির্মিত হলেও এটুকু বলতে পারা যাবে না যে এই শিল্প এখানে কারুকলার দিক দিয়ে দোষত্রুটি মুক্ত।

এমন কি বলিষ্ঠ গল্পোকরণও আমাদের পুরাতন ঐতিহ্য চিরকালের

জন্য বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হবে না। একদিন এর মৃত্যু ঘটবেই সেই সাঙ্ঘাতিক পরিণতির কথা আমাদের চিন্তা করতেই হবে।

চলচ্চিত্রকে কারুকলার দিক থেকে নির্দোষ করতে হলে আমাদের ষ্টুডিয়োগুলিকে অবিলম্বে নব সাজে সজ্জিত করে পুনর্বিন্যাস করতে হবে। বাঙালী শিল্পীর সহায়তায় এবং ভাল বাংলা গল্প অবলম্বনে বম্বে আজকাল বাংলা চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে আরম্ভ করেছে। এই সকল বম্বের তৈরী ছবি গল্প ও কারুকলার দিক দিয়ে মোটামুটি নির্দোষ হওয়ায় ত্রুটিযুক্ত বাংলা ছবি তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতেই পারবে না। এই প্রকার বম্বে ছবি পশ্চিম বাংলায় জয়মাল্য লাভে সমর্থ হবেই এবং অতি শীঘ্রই বাজার ছেয়ে ফেলবে, যদি না আমরা তাদের চিৎকার করে থামিয়ে দিই। কাজেই আমাদের চলচ্চিত্র নির্মাণশালাগুলিকে সর্বরকমে আর্থিক সাহায্য দেওয়া দবকার যাতে সেগুলোকে সুষ্ঠুভাবে পুনর্গঠিত করা যায়। এই শিল্পেব অর্থসাহায্যকারীরা কি তা করতে প্রস্তুত? যদি তারা তাদের অর্থসম্ভার নিয়ে অনতিবিলম্বে এগিয়ে না আসেন, তাহলে কলকাতার চলচ্চিত্র-নির্মাণশালার ইতিহাস অতীতের ইতিহাসে পরিণত হবে এবং শুধু মাত্র চলচ্চিত্র জগতের গবেষক ছাত্র-ছাত্রীদেব পড়ার ও মনে রাখবার বস্তু হয়েই থাকবে।

॥ পরীক্ষামূলক থিয়েটার ॥

থিয়েটার কখনও বদ্ধজলার মত স্থির হয়ে এক জায়গায় থাকতে পারে না। একে চলতে হয় সময়ের সঙ্গে তাল রেখে এবং চতুর্দিকে যা ঘটছে তার প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হয়। প্রাণশক্তি সঞ্চারিত করতে একে যুগের সঙ্গে পা ফেলে এগুতে হবে। সময়োপযোগী হতে একে নতুন নতুন রীতিনীতি ও কলাকৌশল নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা চালাতেই হবে—তা সে পোষাক সম্বন্ধেই হোক, আর নাটক রূপায়ণের অভিনবত্বের দিক দিয়েই হোক বা উপস্থাপনার দিক দিয়েই হোক। আর এইভাবেই অন্যান্য দেশে পরীক্ষামূলক থিয়েটাব উদ্ভুত হয়েছে।

সমস্ত সভ্য জাতির মধ্যে নাটকের জন্ম থেকে, পেরিক্লিয়ান গ্রীস থেকে আজ পর্যন্ত হিন্দু ভারতে, সুদূর প্রাচ্যে, অথবা চীন জাপানে, অথবা পশ্চিমের পুবাতন বাসভূমিতে নাটকের উপস্থাপনা সেই দেশের রীতি নীতি ও ঐতিহ্য অনুযায়ীই হয়েছে। ইকেবিয়ান থেস্‌পিস্‌ অথবা ভরতমুনির থিয়েটার আলোকপ্রাপ্ত চীন দেশে সম্রাট হুয়েন সাং এর পরিচালনায় থং রাজবংশেব অপেরা এবং জাপানেব রহস্যজনক 'নো' নাটকের অভিনয়, তৎদ্দোশীয় প্রথাগত বৈশিষ্ট্যেব আঁধার।

আজকের দিনে, যেখানে পুরাতন প্রথা ও রীতিনীতি বেশ কিছুটা বজায় আছে সেই চীন ও জাপানের কথা বাদ দিলে সভ্যজগতের সর্বত্র নাটকের যে জন্মগত ঐতিহ্য প্রথা বা রীতি নীতি তা সবই বিগত শত শত বর্ষের তিমির তলে হারিয়ে গেছে। বহুকাল পূর্বেই এর আমূল পরিবর্তন হয়ে গেছে। নাটক আজ আর সেই পুরাতন রীতি

নীতি ও প্রথানুযায়ী উপস্থাপিত হয় না। অত্যুৎসাহী লোকেরা বনেদী জাঁকজমকপূর্ণ ক্রমোন্নত আসন শ্রেণী সমন্বিত বৃত্তাকার পার্বত্য এবং পুরাতন ঐতিহ্য সহকারে নৈষ্ঠিক রঙ্গমঞ্চের পুনরুজ্জীবন থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করে পুরাকালের হেলেনিক নাটকের পুনরুজ্জীবনের জন্য পরীক্ষাকার্য চালিয়েছিলেন।

ভারতের পুবাতন ঐতিহ্য অস্পষ্টতার কুজ্‌ঝটিকাতলে পুরাপুরি হারিয়ে না গেলেও অভ্যাসের অতল গহ্বরে তলিয়ে গেছে। প্রাচীন কালের লোকেদের থিয়েটার নিজেদের এক বিশেষ পদ্ধতিতে হত। কারণ থিয়েটার সবই ছিল তখন ধর্মীয় রীতিনীতি এবং আনুষ্ঠানিক প্রথা থেকে উদ্ভূত। এবং ইহা প্রধানতঃ যতটা নির্ভরশীল ছিল আদর্শ আকার প্রকার এবং সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির উপর ততটা এর স্বাভাবিক প্রগতির উপর নয়।

পুরাকালেব শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উৎকৃষ্ট শ্রেণীর থিয়েটারের কথা বাদ দিলে লোকরঞ্জক নাটক যেমন জনসাধারণের পরিকল্পনা উদ্ভূত বামলীলা, কৃষ্ণলীলা (যাত্রা) এবং এই রক্মেব আরও অনেক লোকনাট্য সবই ছিল বিশেব কোন দেশের বিশেষ রীতিনীতি ও প্রথাগত।

পিকচার ফ্রেম থিয়েটারেব কল্পিত স্বাভাবিকতাব পাগলামী পৃথিবীর সর্বত্র যেমন প্রভাব বিস্তার করেছিল, তেমনি করেছিল এখানেও। আমাদের দেশে এ জিনিষ প্রসার লাভ করল, যখন আমরা লোকরঞ্জনের মাধ্যম হিসাবে পিকচার ফ্রেম থিয়েটারের ইয়োরোপীয় পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিলাম। এটা শুধু আমাদের দেশেই চালু হয়নি। পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও চালু হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দির প্রারম্ভ থেকেই রঙ্গমঞ্চ ক্রমশঃ তাদের ষ্টেজ বক্স (বসিবার আসন বিশেষ) 'এপ্রণ' ইত্যাদি বাদ দিয়েছিল। এই থিয়েটারের ষ্টেজের মুখটা সঙ্কুচিত করে অলঙ্কারযুক্ত ছবির ফ্রেমের মত করা হয়েছিল। আধুনিক নাটকগুলি সবই খাঁটি

রঙ্গমঞ্চের সীমিত গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হল। দেশীয় প্রথানুযায়ী মঞ্চের মুখের কাছে চতুর্থ দেওয়াল নির্মিত হল। এটাকে বলা চলে উঁকি মেরে দেখবার মত উন্মুক্ত স্থান, যার মধ্য দিয়ে দর্শকরা মঞ্চের অভিনয় দৃশ্য এবং অন্যান্য ঘটনাবলী দেখতো। অতি উচ্ছ্বাসপূর্ণ কৃত্রিমতায় ভরা নাটক থেকে রূপায়িত করে বাস্তবধর্মী নাটক বানিয়ে অভিনয় করা হত। বাস্তবতা তখন ছিল এক কুয়াসাচ্ছন্ন অস্পষ্ট নামের আচ্ছাদনে ঢাকা বহুল অব্যবহৃত শব্দ। শব্দটা লোকের মুখে মুখে চলত কিন্তু এর কোন বিধিবদ্ধ আইনকানুন বা অর্থ ছিল না। ইয়োরোপের প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিই গবেষণা দ্বারা বের করবার চেষ্টা করতে লাগলেন—বাস্তবতা কথাটার সত্যিকারের অর্থ কি? ইবসেনের বাস্তবতা অথবা আরও খানিকটা পিছিয়ে ব্যাভেরিয়ার স্যাকেসা-মাইনিন্‌জেন এর ডিউকের থিয়েটারের বাস্তবতা, প্রথাগত ঐতিহ্যপূর্ণ থিয়েটারকর্মীদের চক্ষুরুলোচক। এসব নিয়ে এখনও প্যারিসের আঁদ্রে আঁতোয়া (Andre Antoine), লণ্ডনের গ্রীন (Griene)এবং অন্যান্য থিয়েটারে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। এই বাস্তবতাই পরিশেষে আশ্চর্য রকমে পরিবর্তিত হয়ে স্বাভাবিকতায় রূপান্তরিত হয়েছিল ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে মস্‌কৌ এর থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা ষ্ট্যানিস্লাভস্‌কী এবং নেমিরোভিচ ডাঞ্চাঙ্কের হাতে। এই মস্‌কৌ থিয়েটারেই অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে বাস্তব জীবনকে রূপায়িত করা হত।

অষ্টাদশ শতকের পরীক্ষামূলক থিয়েটার আন্দোলনের উদ্দেশ্যই হল বাস্তবধর্মী নাটকের জগতে বিপ্লব সৃষ্টি করা এবং ইয়োরোপ ও আমেরিকার বহু নাটকে নবজীবন দান। এর প্রেরণা আসে ফরাসী বাস্তবধর্মী উপন্যাস থেকে।

এই আন্দোলনের প্রারম্ভে ইবসেন ইয়োরোপের পশ্চিমাঞ্চলে অপরিজ্ঞাত ছিলেন। এমিল জোলার লেখায় ও উপন্যাসে তার স্বাধীনতাপ্রেমিকতা ও উদার দৃষ্টিভঙ্গী নাটকপ্রেমিকদের বাস্তবধর্মী

বিষয়ের চিত্রায়ণেজীবনধর্মীতা মঞ্চে ফুটিয়ে তোলার কল্পনা ও বাসনাকে আরও দ্রুততর করেছে। এর থেকেই রঙ্গমঞ্চের নাটকগুলি সামাজিক দিক দিয়ে সচেতন হয়েছে। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসে আঁদ্রে আঁতোয়াঁ কর্তৃক থিয়েতর লাইবর্ উদ্বোধনের সঙ্গে এ আন্দোলন সুরু হয়েছিল। পুরাকালের রঙ্গমঞ্চের সেই বাকপটুতা বা বাক্যজাল বিস্তার এবং নানা প্রকার নাটকীয় ভাবভঙ্গী বর্জন করে নাটকীয় চরিত্রের সঙ্গে বাস্তবের সামঞ্জস্য বিধান করে একাত্মবোধ সৃষ্টির দ্বারা অভিনয়ের পদ্ধতির জন্মদাতাই হলেন এই আঁদ্রে আঁতোয়াঁ। এব থেকে এক নতুন ধরণের মঞ্চসজ্জার প্রসার লাভ হল সন্দেহ নেই এবং আঁতোয়াঁ নিজেই একদিন বলেছিলেন যে পরিচালক হিসাবে তিনিই সর্বপ্রথম মঞ্চের দরজায় হাতল, কড়া ইত্যাদি ব্যবহার করেছিলেন। পৃথিবীর সব চেয়ে সৌখীন প্যারিস শহরের শিল্প কেন্দ্রে এই পরীক্ষামূলক থিয়েটাব স্থাপনের পূর্বে আঁতোয়া প্যারিস গ্যাস কোম্পানীতে একজন কেরানী ছিলেন এবং আট বছর ধরে কঠোর জীবন সংগ্রামেব ঋণে ও দুশ্চিন্তায় জর্জরিত হয়েছিলেন।

পরিশেষে "থিয়েতর লাইবর্" বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তার কাজ সম্পুর্ণ করে বন্ধ হয় এবং তৎকালীন নাট্যজগতে পরীক্ষা নিরীক্ষার এক উজ্জ্বল দীপশিখা সে জ্বেলে রেখে যায়। সমালোচকের ভাষাতেই—থিয়েতর লাইবর্' ইয়োরোপের সমসাময়িক থিয়েটার-গুলিকে ক্রটিমুক্ত করে এক নতুন রূপ দিয়ে গেছে। সত্যিই থিয়েতর্ লাইবর্এর ইতিহাসই ইয়োরোপের তৎকালীন রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস। প্যারিস থিয়েটারের বাস্তবতার ঢেউ ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের রাজধানীতেও প্রভাব বিস্তার করেছিল। বার্লিন শহরেই এর দ্বারোন্মেচন হোল Freie Biihne বা মুক্ত থিয়েটার দিয়ে। মুক্ত থিয়েটারের কল্পনা করা হয়েছিল থিয়েটারগুলিকে তাদের বহুযুগের পুরাতন ঐতিহ্য পদ্ধতি এবং ব্যবসায়িক লক্ষ্য থেকে মুক্ত করার

উদ্দেশ্যে। ইবসেনের ঘোষ্ট (Ghost) নিয়ে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ডঃ অটো ব্রাউম্ এর পরিচালনায় এ চেষ্টা হয়েছিল। পরীক্ষামূলক থিয়েটারের একটা বড় কাজ করাই ছিল মুক্ত থিয়েটারের নীতি এবং উদ্দেশ্য। আর সে কাজ হোল নাট্য পরিকল্পনায় এবং তার কারুকলা কৌশলে সমালোচকের স্বার্থ বজায় রাখা এবং তার আকারপ্রকার ইত্যাদিতে একটা বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন আনা। এই সংবাদ বার্লিন থেকে ভিয়েনায় এবং সেখান থেকে লণ্ডনে ছড়িয়ে পড়ল। এবং লণ্ডনে জে, টি, গ্রীন সাহেবের নেতৃত্বে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রথম মুক্ত থিয়েটার জন্মলাভ করেছিল। বার্ণার্ড শ্-এর ভাষায় এই লোকই বাঁধে প্রথম ছিদ্র সৃষ্টি করেছিলেন। গ্রীন নিজে লিখেছিলেন "ইবসেনকে আনতে আমি মহাসমুদ্র এনেছি" এবং তিনি ইবসেনের "ঘোষ্ট" দিয়ে তার থিয়েটার আরম্ভ করেছিলেন।

পরবর্তী কয়েক বছরে ইয়োরোপের সর্বত্র বহু-সংখ্যক পরীক্ষা-মূলক থিয়েটার জন্মলাভ করেছিল। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে মস্কৌএর বিশ্ব-বিখ্যাত আর্ট থিয়েটার আলেক্সী টলস্টয়ের 'জার ফয়দর' নিয়ে আরম্ভ হয়েছিল। লেডি গ্রেগরী, জর্জ মুর এবং ডবলিউ, বি, ইয়াটস্ কর্তৃক আইরিশ থিয়েটার 'লিটার‍্যালী' এবং ডাবলিনের জ্যাবে থিয়েটার (অধুনা লুপ্ত) জন্মলাভ করেছিল। রঙ্গমঞ্চের বাস্তবতায় সন্তুষ্ট না হতে পেরে এবং এক যুগ ধরে জীবনের কঠোর বাস্তব দিক মঞ্চে উন্মোচিত করে পরীক্ষানিরীক্ষাকারী ও পৃষ্ঠপোষকেরা থিয়েটারের আকার প্রকার ও দেহকে বাদ দিয়ে নতুন বাস্তবতায় শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাদের যুক্তি ছিল এই জীবন্ত অভিনেতা মঞ্চে উপস্থিত থাকায় রঙ্গমঞ্চ জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত বলে, বাস্তবতার ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করা নিতান্তই অনাবশ্যক। এরূপ ধারণা থেকেই থিয়েটারকে আর একবার মুক্ত করা হয় উহার থেকে জীবনের বাস্তবতা খুঁজে বার করতে। এই প্রকারে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে বার্লিনের

ক্লাইনেস্ থিয়েটারে (Kleines Theatre) ম্যাক্স্ রাইনহার্ড পরীক্ষার কাজ আরম্ভ করেন। তিনি শত শত নাটক প্রযোজনা করেছিলেন। লিটল্ থিয়েটার এবং পাঁচ হাজার লোকের স্থান সংকুলান হবার মত এরেনা (Arena) থিয়েটারও তিনি সংগঠিত করেছিলেন। তিনি খোলা জায়গায় এবং গীর্জায় তার নাটক প্রযোজনা করেছিলেন। "দি মিরাক্ল্" এর মত নির্বাক নাটকের দুই হাজার অভিনয় সহ মনোবিজ্ঞানভিত্তিক ক্ষুদ্র ভঙ্গুর চার পাঁচটি চরিত্র সম্বলিত বহু নাটিকা তিনি মঞ্চস্থ করেছিলেন। তিনি কল্পনাবাদী সহজবোধ্য নাটকের নব রূপকার ও আদর্শবাদী বলে অভিহিতও হয়েছিলেন। একজন সহজবোধ্য নাট্যকার হয়েও তিনি চিরকালের হাতেকলমে পরীক্ষাকারী।

পুনরায় ১৯০৯খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসে ফিরে গিয়ে "দ্যা আর্ট থিয়েটারে" আমরা দেখতে পাই জ্যাক কোপিয়োঁ ও তার সহযোগিতায় চার্লস্ ডুলিন লুই জাঁভে, ডস্টোভেইস্কীর ভাই কারিনা জেভকে। এর পর তারা সংগঠন করেছিলেন থিয়েটার 'ভিউ কলোম্বিয়ে থিয়েটার এরপর নাম করা যায় জার্মান থিয়েটারের মালিক ও সংস্কারক, পরিচালক লেস্পোল্ড্ জেসনার, বার্লিনের শ্যাউস্ পি-এলহউসের, বার্লিনের ইউগেন ফেলিং যিনি ভল্কস্ বিয়েনে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাসে-মনস্ নামক শ্রমিক শ্রেণীর থিয়েটার সংগঠিত করে মহাদেশে বিরাট প্রতিভা ও শক্তিবিশেষ ছিলেন। প্যারিসে সিয়েক ম্যাড্রানো নামক সার্কাস থিয়েটার, রাশিয়ায় যুদ্ধ পরবর্তী শ্রমিকদের বিপ্লবাত্মক থিয়েটার দল—সবই ছিল শক্তির উৎস বিশেষ। যেমন ম্যায়েরহোল্ড ছিলেন তার গঠনমূলক নীতিসহ ছান্দিক নাট্যকার। আলেকজাণ্ডার তাইরোবের অনুসৃত নীতি ছিল—ছান্দিক গতির সঙ্গে তাল রেখে সমস্ত দৃশ্যের পরিকল্পনা করা। পরে তিনি কিউবিক ষ্টাইলে সালোমী (Salome) নামে নাটক ক্যামেরণী থিয়েটারে অভিনয় করেছিলেন, এবং বাকানালে-ইউজিন-ভক্টনোগভ তার নিজের থিয়েটারে নিজের

নামের জয়গান করেছিলেন। নিকোলাই অখ্‌লপ্‌কভ দর্শকবৃন্দের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগযুক্ত তার নমনীয় রঙ্গমঞ্চ সহ সর্বশেষ এপেক থিয়েটারের উদ্ভাবক। আরউইন পিসেয়েটা এবং বার্টন ব্রেখ্‌ট্‌, আমেরিকায় দৃশ্য-পরিকল্পনাকারী নরম্যান বেল্‌গেডার, রবার্ট আর্থার জোন্‌স্‌, মর্ডেকাই গোভেলিক্‌স্‌ ও আরও অনেকে থিয়েটারে বাস্তবতার দিক দিয়ে অনেক অবদান জুগিয়েছিলেন। তারা নাট্যরসহীন অথচ অতি মাত্রায় নাটকীয়তাপূর্ণ অভিনয়কে সত্যকার নাট্যাভিনয়ে রূপান্তরিত করে বাস্তবতা ফুটিয়েছেন, নব আকারে সংগঠন ও বাচনভঙ্গীর গবেষণামূলক কার্যের মধ্য দিয়ে। পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চ আজ পঁচাত্তর বৎসর আগে যেমন ছিল তার চেয়ে অনেক বেশী সৌখীন ও উন্নত হয়েছে।

ভারতবর্ষ এদিকে বেশী চেষ্টা চালায় নি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের নাটক নিয়ে নিজের মত করে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন। নাট্যাভিনয়ে তিনি বিশুদ্ধ সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু দর্শকদের কাছে সহজবোধ্য করে তুলতে দরকার এগুলিকে সম্পুর্ণ নাটকীয় করে তোলা। নাটক রচনা এবং উপস্থাপনায় নতুন পদ্ধতির প্রবর্তন এখানে খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে; কিন্তু এর জন্য সময় চাই, একদিনে কিছু করা সম্ভব নয় তা সে রিপোর্ট পড়েই হোক আর বিদ্রোহী রেণেশাঁসের বই পড়েই হোক। নতুন কোন নাট্য পদ্ধতির উদ্ভারন করতে আবশ্যক বিরামহীন অনুশীলন ও পরীক্ষা নিরীক্ষা।

ভারতীয় থিয়েটারের আজন্মের পালনক্ষেত্র কলকাতায় আগে থেকেই কিছু নিরীক্ষাকারী রয়েছেন। তাঁরা তাঁদের উপস্থাপিত নাটকে কিছু নতুন আলোক সম্পাতের চেষ্টা করছেন। কিন্তু অর্থসঙ্গতি এবং সুযোগ সুবিধার অভাবে তারা শোচনীয়ভাবে বাধাগ্রস্থ। আরও সুস্পষ্ট মনোযোগ এদিকে দেওয়া দরকার। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তিন বছরের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা সহ একটা

অভিজ্ঞতা অর্জন নাট্যশিক্ষার শিক্ষায়তন স্থাপন করেছেন। কিন্তু অভিনেতাকে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয় এবং নাট্যকলাকৌশলের সাফল্যলাভে যে পরিমার্জিত শিক্ষা তার প্রয়োজন সে তুলনায় শিক্ষাব্যবস্থায় যে সময় দেওয়া হয়েছে তা অতীব অপ্রতুল। একটা পরীক্ষামূলক থিয়েটারের জন্য আমাদের প্রয়োজন একটা উপযুক্ত রঙ্গমঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহ তৎসহ একটি বক্তৃতাকক্ষ, একটা পাঠাগার, একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার। সুবিধার জন্য, রঙ্গমঞ্চ একতলার মেঝেতে নির্মিত হবে এবং কারখানা ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাশালা হবে তার নীচের ভূগর্ভ প্রকোষ্ঠে, বক্তৃতা কক্ষ হবে লাইব্রেরির উপর এবং অফিস বসবে সম্মুখের দিকে নীচের তলায়, এখানে সাজসরঞ্জাম অভিনয়ের গুণাবলী, নৃত্য, কারুকলা ও বৈদ্যুতিক উৎকর্ষ বিষয়ক পরীক্ষা নিরীক্ষা চলবে। যে সকল ছাত্র ছাত্রী এই শিক্ষায়তন থেকে সাফল্যের সঙ্গে বেরিয়ে আসবে এবং বাইরের যারা সাফল্য অর্জন করে এখানে আসবে তারাই এই গবেষণাকার্যে যোগ দিতে পারবে। এ বিষয়ে অভিজ্ঞ ও মৌলিক জ্ঞানসম্পন্ন বড় বড় ব্যক্তিদের বিদেশ থেকে আমন্ত্রণ করে এনে গবেষক ছাত্রদের সম্মুখে বক্তৃতা দেওয়ার এবং তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কিছুদিন আগে ব্যক্তিগতভাবে আমার এ বিষয়ে বিখ্যাত জার্মান পণ্ডিত ডামষ্টর্ডের ইগন ভিয়েট্রার সঙ্গে তাঁর এদেশ সফর কালে আলাপ হয়েছিল। যদি পাঁচ বৎসরের জন্য পরীক্ষাকার্য চালান যায়, তাহলেই পরীক্ষামূলক থিয়েটার একটা সত্যিকারের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পারে।

এই মহান কার্যের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তা আসতে পারে সাধারণের চাঁদা থেকে। পৌর প্রতিষ্ঠান, ষ্টেট গভর্ণমেণ্ট এমন কি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকেও সাহায্য পাওয়া যেতে পারে যদি সঠিক পরিকল্পনা রচনা করা যায়।

আমি থিয়েটার সম্বন্ধে সুপণ্ডিত ব্রেখট্ সাহেবের মতামত উদ্ধৃত

করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। তিনি বলেছিলেন—স্বাভাবিক ঘটনাবলীকে তাদের অবিকৃত সঠিক সত্য রূপে প্রতিভাত করার যে ক্ষমতা তা আয়ত্বে আনা সহজ কাজ নয়। শিল্পীকে তাহলে নতুন উদ্দেশ্যের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে তার পদ্ধতিকে সমগ্রভাবে নবরূপে রূপায়িত করতে হবে।

॥ প্রথম সামাজিক নাটক ॥

বাংলা রঙ্গমঞ্চের জনক স্বর্গীয় গিবিশচন্দ্র ঘোষ রচিত প্রথম সামাজিক নাটক 'প্রফুল্ল' ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ও ষ্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছিল। বাংলা রঙ্গমঞ্চের ক্ষেত্রে এই প্রকার নাটক এই প্রথম। সামাজিক ব্যঙ্গ নাটক, প্রহসন প্রভৃতি এর আগেই প্রচুর সংখ্যায় রচিত এবং অভিনীত হয়েছিল। কিন্তু একটা বিশ্বাস সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল যে বাংলার সামাজিক জীবনের উপর লেখা কোন বিয়োগান্ত নাটক জনসাধারণ পছন্দ করবে না। কাজেই কোন থিয়েটারের দলই এ নিয়ে কোন চেষ্টাই চালান নি।

কিন্তু ১৮৮৮ সালে ষ্টার থিয়েটার তাদের নব নির্মিত প্রেক্ষাগৃহের দ্বারোন্মোচনের পরেই দুর্দিনের মধ্যে গিয়ে পড়ল। কারণ ভাল নাটকের অভাবে যে অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছিল, সুষ্ঠু পরিচালনার দ্বারা সেই দুর্দিন থেকে একে উদ্ধার করার মত কোন ভাল পরিচালক তখন ছিল না।

বিখ্যাত নাট্যকার গিরিশ চন্দ্র ঘোষ—যিনি শিল্পীদের শিক্ষাগুরু এবং ষ্টারের সংগঠক ছিলেন,—তখন একটি প্রতিদ্বন্দ্বী থিয়েটাবে ম্যানেজারের কাজ করতেন। বাংলা রঙ্গমঞ্চের এক বিরাট পুরুষ এবং ষ্টারের ম্যানেজার স্বর্গীয় অমৃতলাল মিত্র পরীক্ষামূলক ভাবে অত্যন্ত জনপ্রিয় বিয়োগান্ত উপন্যাস স্বর্ণলতার নাট্যরূপ দান করেছিলেন। এ বই অত্যন্ত দ্রুত দর্শকদের মন জয় করেছিল এবং কলকাতায় তখন চালু তিনটি প্রতিদ্বন্দ্বী থিয়েটারকে বিস্ময় বিমূঢ় করে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে একাদিক্রমে বেশ কিছুকাল চলেছিল।

গিরিশচন্দ্র যখন ষ্টারে তাঁর শিষ্যদের মধ্যে ফিরে এলেন, ষ্টারে

সরলার সাফল্যের কথা মনে করে তারা তাঁকে একখানি মৌলিক সামাজিক বিয়োগান্ত নাটক লিখতে অনুরোধ করল।

গিরিশচন্দ্র লিখলেন প্রফুল্ল। দুইমাস ধরে অনুশীলন চালিয়ে অমৃতলাল মিত্র প্রমুখ সব নামকরা অভিনেতাদের নিয়ে এ বই মঞ্চস্থ করা হল। তার প্রিয় শিষ্য অমৃতলাল নাটকের নায়ক যোগেশের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। সঙ্গে সঙ্গে মিলল অপরিসীম সাফল্য। এবং সে সাফল্য সরলার সাফল্যকেও ছাড়িয়ে গেল। এই সুঅভিনীত নাটক তৎকালিক এক গভীর সমস্যা নিয়ে রচিত হয়েছিল। মদ্যপানের অমঙ্গল ও কুফল, যার থেকে বহু মধ্যবিত্ত পরিবার একেবারে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে তা দেখানই ছিল এই নাটকের মূল উদ্দেশ্য।

১৮১৮ সালে কলকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপিত হওয়া থেকে, বহু সংখ্যক বাঙ্গালী ছেলেরা ইংরাজী শিক্ষা পেতে লাগল এবং তাদের শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিলিতি প্রথা ও রীতি নীতি সহ তাদের পাপকার্য এবং জ্ঞানের স্বল্পতাও অনুকরণের চেষ্টা করতে লাগল। তাদের কাছ থেকে অপকর্মের অনুকরণের মধ্যে মদ্যপানই বোধহয় সবচেয়ে বড় মন্দ কাজ।

অনেক শিক্ষিত লোক এত বেশী মদ্যপায়ী হয়ে উঠলেন যে, এই বদভ্যাস শুধু যে তাদের নিজেদেরকে ধ্বংস করল তাই নয়, তাদের পরিবারবর্গকেও ধ্বংসের অতলে ডুবিয়ে দিল। এই কলঙ্কজনক দুষ্ট ক্ষত থেকে সমাজকে রক্ষা করতে শত শত জনসভা অনুষ্ঠিত হল। "মিতব্যয়" সংস্থা স্থাপিত হোল। এবং সমাজ কল্যাণের স্বেচ্ছাসেবকরা দলে দলে লোকদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করে ফিরতে লাগল যে তারা আর মদস্পর্শ করবে না।

এ ছিল রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের আবির্ভাব সময়, যখন তাঁরা তাঁদের স্বর্গীয় উপদেশ বার্তা নিয়ে এসেছিলেন। তখনই এই বিখ্যাত সামাজিক বিয়োগান্ত এবং

জনসাধরণের উপর এক অমোঘ প্রভাব বিস্তারকারী নাটক প্রফুল্লর সুরু। সংবাদ সংস্থাগুলিও এর দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হোল। 'ষ্টেটসম্যান' ২১শে মে (১৮৮৯ সাল) সংখ্যায় এই সম্বন্ধে এক সম্পাদকীয় লিখল এবং পর পর ৮ই এবং ৯ই জুনের কাগজে দীর্ঘ সমালোচনা বেরলো।

ওই তিন দিনের সমালোচনার চুম্বক এখানে দেওয়া হল ঃ—

"ষ্টার থিয়েটারের ম্যানেজার এবং সুবিখ্যাত নাট্যকার বাবু গিরিশ চন্দ্র ঘোষ রচিত সামাজিক নাটক প্রফুল্ল গত শনিবারে জনাকীর্ণ প্রেক্ষাগৃহে অভিনীত হয়েছিল। নাটকটি হিন্দু সমাজের জনজীবনের যে সকল ঘটনা নিয়ে রচিত তা কিছু মাত্র অসাধারণ নয় এবং নাটকের উদ্দেশ্য শুধু আনন্দ দানই নয়,সমভাবে এর উদ্দেশ্য ছিল সদুপদেশ ও নীতিশিক্ষাদান।

বাবু অমৃতলাল মিত্র যোগেশের ভূমিকায় অংশগ্রহণ করে অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন এবং দেখিয়েছিলেন যে কি অসাধারণ দুর্ভাগ্য মদ্যপান হিন্দু পরিবারের উপর টেনে আনে।

যদিও মদ্যপানের কুফল স্বরূপ যোগেশ ধ্বংসপ্রাপ্ত, তবুও সময় সময় সে তাঁর অধঃপতন সম্বন্ধে সচেতন এবং মনের আবেগময় আক্ষেপ এইভাবে ক্যাসিওর ভাষায় ব্যক্ত করেছে—'ওহে, মদের অদৃশ্য অশুভ শক্তি, যদি তোমার কোন নাম তোমাকে চিনবার জন্য না থাকে, তাহলে এসো আমরা তোমাকে ডাকি 'শয়তান' বলে। যে অসাধারণ সাফল্য তারা অর্জন করেছে তার জন্য এই প্রতিভাসম্পন্ন গ্রন্থকার এবং এই দক্ষ ম্যানেজারকে আমরা অভিনন্দন জানাই।

"ষ্টেটসম্যান" কখনই নিরর্থক স্তুতিকার নয়।

গিরিশ চন্দ্র নিজেও ছয় বছর পরে মিনার্ভা থিয়েটারে ম্যানেজার থাকাকালীন যোগেশের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এই সময় মিনার্ভা এবং ষ্টার থিয়েটার প্রতিদ্বন্দ্বীতায় পরস্পরকে পরাজিত করার কঠিন চেষ্টায় লেগেছিল। মিনার্ভা 'প্রফুল্ল'র অভিনয় করবার সঙ্কল্প

করেছিল। ইহা অবিলম্বে বাংলা নাটক প্রেমিকদের মধ্যে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এটা দ্বন্দ্বযুদ্ধ আহ্বানেরই সামিল, এবং ষ্টারও যুদ্ধসাজে সজ্জিত হল। শিষ্যেরা গুরুকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানাল, এবং ঘোষণা করল যে তারা তাঁর শিক্ষা থেকে আয়ত্ব কৌশল দ্বারাই তাঁকে পরাজিত করবে। তাঁরা উভয়েই একই দিনে ১৩ই জুলাই ১৮৯৫ সালে এই নাটকের অভিনয় আরম্ভ করল এবং কয়েক সপ্তাহ ধরে তা চালাল। মিনার্ভা অসাধারণ সাফল্য লাভে সমর্থ হল এবং তার সুনাম বাড়িয়ে ফেলল। কারণ গিরিশচন্দ্র যেন মূর্তিমান যোগেশ এবং তাঁর শিষ্য অমৃতলাল মিত্র ঈশ্বর প্রদত্ত সুকণ্ঠ থাকা সত্ত্বেও তাঁর সমকক্ষ হবার মত কোন যোগ্যতাই দেখাতে পারলেন না।

অমৃতলাল ছাড়াও যোগেশের ভুমিকায় অনেক অভিনেতাই আজ পর্যন্ত অভিনয় করেছে। কিন্তু তাঁদের কেউই গিরিশচন্দ্রের উৎকর্ষের ধারে কাছেও পৌঁছোতে পারেনি, বিশেষ করে সেই সব ক্ষেত্রে যেখানে অভিব্যঞ্জনার মধ্যে অতীব সূক্ষ্মতা এবং আবেগ বিহ্বলতার জটিলতা রয়েছে। সত্যই গিরিশচন্দ্র গ্রন্থকার এবং অভিনেতা—উভয় দিক দিয়াই অনন্যসাধারণ এক বিরাট পুরুষ এবং 'প্রফুল্ল' তাঁর আদুরে শিশু।

॥ পূর্বস্মৃতি ॥

এখন আমি বাংলার রঙ্গালয় এবং তৎসংক্রান্ত বিগত কয়েক যুগের সম্বন্ধে আমার বাল্য বা পূর্বস্মৃতি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছি। তখনকার বঙ্গ রঙ্গালয় সম্বন্ধে অনেক সুখস্মৃতি আমার মনের মধ্যে ভীড় করে আসছে। কোন তীক্ষ্ণদর্শী সমালোচকের কাছে এই সুখ স্মৃতি সেই বিগত যুগের নাট্য জাগরণের কথাই বহন করে আনে। পূর্বস্মৃতি বলতে আমি আমার পাঠকবর্গকে যা বলতে চাইছি তা এমন এক কোমল ও মর্মস্পর্শী অনুভূতি জড়ানো যে তা পাঠকদের বিচার বুদ্ধিকে কিছুটা আচ্ছন্ন করে দিতে পারে। অতএব, প্রারম্ভেই আমি সমালোচক ও পাঠকবর্গের কাছে মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি এবং আমি অত্যন্ত খুশী হব যদি আমার বাল্য বা পূর্বস্মৃতি তাদেরকে এতটুকু আনন্দ দিতে পারে।

আমি বাংলা রঙ্গালয় ও রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে একটা সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্র দেব যা আমার নিম্নবর্তী বর্ণনার জন্য আপনাদের মনের ক্ষুধা খানিকটা মেটাবে।

হেরেসিম লেবেডফ নামে এক দুঃসাহসী রুশ আগন্তুক কর্তৃক অভিনয় প্রদর্শনের জন্য বাংলার প্রথম রঙ্গালয় কলকাতার কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত হয়েছিল। এবং তিনি এ কাজ করেছিলেন বাবু গোলক নাথ দাস নামে এক বাঙ্গালী ভাষাবিদের সাহায্যে স্ত্রীপুরুষ উভয় শ্রেণীর শিল্পীদের নিয়ে ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু এর আয়ুষ্কাল দীর্ঘ হয়নি। সাফল্যের সঙ্গে কয়েকটি অভিনয়ের পরেই এটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ১৭৯৬ সালেই। ঊনবিংশ শতাব্দীর তিন চতুর্থাংশের প্রারম্ভ থেকেই বাংলার নাট্য প্রচেষ্টা সবই সখের থিয়েটারের দলেই

সীমাবদ্ধ ছিল—যেমন কলেজ নাট্য সংস্থাগুলি, সখের থিয়েটার দল, ধনীসম্প্রদায়ের বাগানবাড়ীর থিয়েটার সংস্থা ইত্যাদি। প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় খোলা হয়েছিল ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর। দ্বিতীয় থিয়েটার ১৮৭৩ সালে আরম্ভ হয়েছিল। তৃতীয় ১৮৭৩ সালে ৩১শে ডিসেম্বর এবং চতুর্থ ১৮৭৫ সালে আরম্ভ হয়েছিল। সেই থেকে আজ পর্যন্ত বাংলার রঙ্গালয় সগৌরবে তার জয়যাত্রা চালিয়ে যাচ্ছে। সুবিধার জন্য ৮৩ বছরের ব্যবধানকে কয়েকটি যুগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম চার বছরকে প্রস্তুতি পর্বের যুগ বলে অভিহিত করা যাক। ১৮৭৬ সাল থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ কাল পর্যন্ত সময়টাকে বলা যায় রহস্য বা কাল্পনিক নাটক এবং পৌরাণিক নাটকের যুগ। এই শতাব্দীর প্রারম্ভে আমরা দেখতে পাই বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন থেকে জন্মলাভ করে বেশ দানা বেঁধে উঠছে। এই সময়টাকে সঙ্গতভাবেই জাতীয় আন্দোলনের যুগ বলা যেতে পারে। এটা চলেছিল ১৯১২ সাল পর্যন্ত, যখন জাতীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে নাটকে রূপায়িত করে উপস্থাপিত হত। গিরিশচন্দ্র ঘোষের মৃত্যুর সঙ্গে এ যুগের অবসান হয়। আমার অস্পষ্ট স্মৃতি অতীতে বাংলা রঙ্গালয়ের সেই যুগ পর্যন্ত ফিরে যায় যে যুগে থিয়েটার দেখাটা একটা বিশেষ ঘটনা বলে বিবেচিত হত। কোন এক শুভলগ্নে বা উৎসবের দিনে লোকেরা পরিবার বর্গ এমন কি ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে থিয়েটার দেখতে যেতো। অতি ক্ষীণভাবে হলেও আমি স্মরণ করতে পারছি যে বিখ্যাত অভিনয়গুলি আমি যখন দেখেছিলাম তখন আমি স্কুলের ছাত্র এবং আমার বয়স উনবিংশ অতিক্রম করেনি। এই রকম কোন একদিনে আমাদের পরিবারবর্গসহ সামাজিক নাটক "প্রফুল্লতে" যোগেশের ভূমিকায় বিখ্যাত গিরিশচন্দ্র ঘোষের অভিনয় দেখতে গিয়েছিলাম। সেই কৈশোর জীবনে আমার সে এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। কতকগুলি বেদনাময় দৃশ্য এখনও আমার চোখের সম্মুখে ভাসছে। সেই

অভিনয়ের একটা অস্পষ্ট হালকা চাপ আমার মনে রয়েছে, তা নয়, সেই শ্রেষ্ঠ নটের অভিনয়ের খুঁটিনাটি বিবরণসহ কতকগুলি সুগভীর ও সুস্পষ্ট ছাপ আমার মনের মধ্যে দাগ কেটে বসে আছে।

অবশ্য এই নাটকের অন্যান্য অনেকের অভিনয়াংশের ছাপ আজ আর আমার মনে তেমন গভীরভাবে নেই। আমি অন্যান্য অনেক থিয়েটারে আরও অনেক অভিনয় দেখেছি, তার মধ্যে ১৯০৮ সালে ডি, এল, রায়ের প্রসিদ্ধ নাটক সাজাহানের অভিনয় আমাকে এমনভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল যে আমি এক সখের থিয়েটার পার্টিতে ১৯১২ সালে সাজাহানের ভূমিকায় মাত্র ১৭ বছর বয়সে অভিনয় করেছিলাম। তারপরে আমার যৌবন কালে এবং তৎপরবর্তী-কালেও এই ভূমিকায় অনেকবার আমি অবতীর্ণ হয়েছি, এবং সে এই প্রদেশেরই নানা জায়গায়, এমন কি পরিশেষে আমার পেশাদারী জীবনেও এই ভূমিকায় অভিনয় করেছিলাম ১৯২৪ থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত। এই ত্রিশ বছরের মধ্যে আমি ওই একই ভূমিকায় কমপক্ষে উনিশশত বার অভিনয় করেছি দেশের বিভিন্ন স্থানে। ১৯১০ সালে রঙ্গমঞ্চের দর্শক থেকে আমি এক নব অভিনেতা হবার চেষ্টা করছিলাম। আমরা আমাদের ক্লাব ঘরে অনেক সাফল্যমণ্ডিত নাটকের অনুশীলন করতাম। তাদের মধ্যে অনেক নাটকই দিনের আলো দেখার সৌভাগ্যলাভ করতে পারে নি শুধু অর্থাভাবে। তখন আমাদের এমন অর্থসঙ্গতি ছিল না যে প্রত্যেক নাটক মঞ্চস্থ করতে পারি। কাজেই অন্যান্য সকলের সঙ্গে আমাকেও ক্লাব ঘরে চার দেওয়ালের মধ্যে বড় বড় নাটকের শুধুমাত্র অনুশীলন পর্বেই সন্তুষ্ট থাকতে হত। কখনও কখনও যখন আমাদের পৃষ্ঠপোষকদের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য এবং সভ্যদের কাছ থেকে প্রাপ্ত চাঁদা আমাদের বড় নাটক মঞ্চস্থ করার ব্যয় সঙ্কুলানের পক্ষে যথেষ্ট মনে হত (তখনকার দিনে এই ব্যয় আজকের মত এত অধিক ছিল না), এবং তখনই আমরা কোন উন্নত ধরণের মঞ্চে

নাটকের অভিনয় করতাম, নানা শ্রেণীর সংমিশ্রিত দর্শকবৃন্দের সম্মুখে। তারপর আবার যখন যথেষ্ট অর্থ সংগৃহীত হত, তখন উৎকৃষ্ট নাটকের মধ্যে একখানি বেছে নিয়ে, অনুশীলনপূর্বক সাধারণ মঞ্চে অভিনয় করতাম এবং এই অভিনয়ের আনন্দে পূর্ণ মন নিয়ে আমাদের বন্ধুদের মধ্যে কয়েকদিন ধরে আলোচনা চলতো ওই নাটকাভিনয়ের নানা দিক নিয়ে—যেমন অভিনয়, মঞ্চ পরিচালনা, পোষাক, প্রথা পদ্ধতি ইত্যাদি এবং আরও নানা জটিল বিষয়।

এই অভিনয়ের একমাস বা মাসাধিককাল পরেই আমরা নতুন নাটকের অনুশীলন আরম্ভ করতাম অবশ্য এটা জানা থাকত না যে, কবে সে সকল বই মঞ্চস্থ করতে পারবো। এইভাবে ক্রমবর্ধমান আর্থিক অসুবিধা তারপর সন্দেহ, অবিশ্বাস ব্যর্থতার ছায়া ও নৈরাশ্য ইত্যাদি সহ আমরা মাথার ওপরে ভগবান ও দেহান্তরে আমাদের ভীরু মন নিয়ে অগ্রসর হয়ে চলেছিলাম। নৃত্য গীত সহ একটা বিরাট প্রকোষ্ঠে আমাকে পৃষ্ঠপোষক দর্শকবৃন্দ পরিবৃত হয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ নাটকের অনুশীলনাভ্যাস আমার মধ্যে লোকনাট্যের কলাকৌশল সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের বাসনা প্রজ্জ্বলিত করেছিল। এই লোকনাট্যই বাংলার সাধারণ লোকের কাছে যাত্রা নামে পরিচিত কারণ যেভাবে আমাদের মঞ্চের নাটক অনুশীলন ও মঞ্চস্থ করা হয়, সেই একই প্রকারে যাত্রার নাটকের উপস্থাপনা করা হয়। সেই সময়ে আমাদের উচ্চাঙ্গের সংস্কৃত নাটক ও বাংলার লোকরঞ্জক নাটক ইত্যাদির তথ্য বিষয়ে পুরাতন উৎকৃষ্ট সাহিত্য পাঠের জন্য যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা আমি ছিনিয়ে নিয়েছিলাম। আমি ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে অনেক পড়াশুনা করেছিলাম। এই লাইব্রেরী তখন মেটকাফ হলে ছিল। যথেষ্ট সুখের বিষয় যে আমাদের পাড়ার কয়েকজন সখের যাত্রা-শিল্পী একটা যাত্রার দল গঠন করেছিলেন। আমি সেই দলে যোগ দিয়েছিলাম এবং তৎকালীন সেই পুরাতন যাত্রার কায়দাকরণ কলাকৌশল ইত্যাদি পরিবর্তিত এক নতুনরূপে

রূপায়িত করবার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলাম। এই নব উদ্যোগে, আমি প্রায় তিন থেকে চার বছর ব্যয় করেছিলাম এবং ষাটটি অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছিলাম। আমি সর্বদাই লক্ষ্য করতাম শিল্পী ও দর্শকদের প্রতিক্রিয়া এবং গদের সীমিত মতামত ও ভাব বিনিময়। আমরা মন্দির অথবা বড় বাড়ীর চৌকোস প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে আগ্রহী দর্শকমণ্ডলী পরিবৃত হয়ে যাত্রাভিনয় করতাম। সাধারণতঃ সাজ-পোষাকের ঘর থেকে যাত্রার আসরে যাবার একটি মাত্র পথ। কিন্তু আমরা দ্বিতীয় পথের ব্যবস্থা করেছিলাম, বিশেষ করে ৪র্থ এবং ৫ম অঙ্কের অভিনয় সময়ে। যাত্রাভিনয়ের গতি-প্রকৃতি, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও নাটকীয় সংঘাত অনুযায়ী, বিশেষ করে যুদ্ধের দৃশ্যে যখন শিল্পীদের দ্রুত গমনাগমনের প্রয়োজন হোত তখনই এ ব্যবস্থা করা হত। এমন কি পোষাকের পরিকল্পনায় আমরা পুরাতন পোষাক-পরিচ্ছদের স্থলে কিছু নতুনত্বের সংযোজনা করেছিলাম। আমি এই যাত্রা দল ছেড়ে আমার এক সতীর্থকে নিয়ে ১৯২০ সালের শেষ প্রান্তে এক ফিল্‌ম্‌ তৈরীর কোম্পানী খুলেছিলাম। কোন নাট্য সংস্থার সঙ্গে ১৯২২ সাল পর্যন্ত আমার কোনো সম্পর্কই ছিল না। এই সময়ে আমরা ঐ ফিল্‌ম্‌ বাজারেও ছেড়েছিলাম। পরে আবার আমি নাট্যপ্রচেষ্টার সঙ্গে পুনরায় সম্পর্ক স্থাপন করেছিলাম। এই সময় আমরা কলকাতার সাধারণ রঙ্গালয়ে কি অবস্থা চলছে তা পর্যালোচনা করে দেখেছিলাম বাংলার থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা গিরিশ চন্দ্র ঘোষ, বিখ্যাত জাতীয় নাট্যকার ডি, এল, রায় এবং থিয়েটার প্রেমিকদের দেব-প্রতিম শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ দত্ত সহ রঙ্গমঞ্চের আরও কয়েক জন বিরাট পুরুষের তিরোধানে ১৯১৬ সালে বাংলা রঙ্গমঞ্চের দুর্দশা চরমে পৌঁছেছিল। একমাত্র সান্ত্বনা এই ছিল যে অতি বৃদ্ধ অমৃতলাল বসু, বৃদ্ধ নাট্যকার পণ্ডিত ক্ষীরোদ প্রসাদ, ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষের পুত্র বিখ্যাত নট শ্রী এস, এন, ঘোষ এবং অভিনেত্রী শ্রীমতী তারাসুন্দরী তখনও

বেঁচে থেকে রঙ্গালয়ের ক্ষীণালোক বর্তিকাটুকু প্রজ্জ্বলিত রেখেছিলেন। এ ছাড়া ১৯২২ সালে মিনার্ভা থিয়েটার পুড়ে ভস্মে পরিণত হয়। থিয়েটারের অবস্থার তখন শোচনীয় হাল। কোন নতুন নাট্যকার, অভিনেতা বা অভিনেত্রী পাওয়া গেল না। সেই সময় মাত্র ম্যাডান থিয়েটার লিমিটেড কোম্পানী তাদের সিনেমা গৃহের একটিকে রঙ্গালয়ে পরিবর্তিত করে বাংলা থিয়েটার সংস্থায় পরিণত করলো, এবং হিন্দি নাটক থেকে বাংলায় অনুদিত এক নাটক এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর শিল্পীবৃন্দ নিয়ে অভিনয় সুরু করল। কিন্তু এটা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হল। তারপর তারা অধ্যাপক এবং ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিট্যুটের বিখ্যাত নট শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ীকে আমন্ত্রন জানালেন। তিনি প্রথমেই ক্ষীরোদ প্রসাদের আলমগীর নাটকে অবতীর্ণ হলেন পুরাতন অভিনেতা যাদের পাওয়া গেল তাদের নিয়ে এবং তাঁর অসাধারণ শিল্প নৈপুণ্য গুণে সাফল্য অর্জন করলেন। ভাদুড়ীমশায় কয়েকমাস বাদেই এই থিয়েটার ছেড়ে দিলেন. এবং থিয়েটারজগত নৈরাশ্যসাগরে ভাসমান এক পরিচালকবিহীন বস্তুতে পরিণত হল। ঠিক সেই সময়, ১৯২২ সালে সখের অভিনেতৃবর্গের এক যুক্ত সংস্থা উত্তরবঙ্গের বন্যাপীড়িতদের সাহায্যকল্পে এক সাহায্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করলো। এতে শিশির কুমার ভাদুড়ী, নরেশ চন্দ্র মিত্র, তিনকড়ি চক্রবর্ত্তীর মত শিল্পীরা রইলেন। এরাই পরবর্তী কালে বাংলা রঙ্গমঞ্চের ব্যাপারে প্রভূত অবদান রেখেছিলেন। এ অভিনয় অসাধারণ সাফল্যমণ্ডিত হল। এই বিস্ময়কর সাফল্যমণ্ডিত অভিনয়, শুধু নাট্যসংস্থাগুলিরই নয় কলকাতার সমস্ত থিয়েটারপ্রেমিক এবং ধনী সম্প্রদায়েরও দৃষ্টি আকর্ষণ করল। আমার নিজের দিক দিয়ে এই অভিনয় আমাকে থিয়েটার সংস্থাগুলির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ দিল এবং ১৯২৩ সালে এদের একটাতে যোগদানের রাস্তা সুগম করে দিল। এতগুলি যুব প্রতিভা একসঙ্গে লাভ করার সম্ভাবনা

দেখতে পেয়ে শহরের কতকগুলি বুদ্ধিমান্ ও সেরা লোক আর্ট থিয়েটার লিঃ নামে এক নতুন সংস্থা সংগঠন করলো কারণ এইটা ছিল এমন একটা সময় যখন থিয়েটার জগতে শিল্প আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল। আর সে শুধু আমাদের দেশেই নয়, ইয়োরোপে এবং আমেরিকাতেও। বিগত ২০ বছর বিশ্ব রঙ্গমঞ্চের শিল্পান্দোলনের এ এক ডামাডোলের যুগ। এর প্রভাব এদেশেও পড়েছিল এবং অভিজ্ঞ নাট্যকার অভিনেতা ও ম্যানেজার শ্রীঅপবেশ চন্দ্র মুখার্জির পরিচালনাধীনে আর্ট থিয়েটার নাট্য প্রতিভায় সমুজ্জ্বল একদল শিল্পীদের নিয়ে চলছিল, যার মধ্যে আমিও ছিলাম এবং তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, নরেশচন্দ্র মিত্র, দুর্গাদাস ব্যানার্জী, ইন্দুভূষণ মুখার্জী ও আরও অনেক নতুন প্রতিভাসম্পন্ন যুবা শিল্পী ছিলেন। আমবা এর পরে অপরেশচন্দ্র মুখার্জী রচিত পৌরাণিক নাটক কর্ণার্জুনেব অভিনয় আরম্ভ করেছিলাম ১৪ই জুলাই, ১৯২৩ সালে। পেশাদাবী থিয়েটারে এই আমার প্রথম অবতরণ এবং প্রথম অভিজ্ঞতা লাভ। আমরা সবাই খুবই অনুপ্রাণিত হয়ে কাজে লেগেছিলাম, বিশেষ কবে আমি নিজে। আমি সর্বদাই নতুন নতুন কারুকলা পদ্ধতি নিযে পবীক্ষানিবীক্ষা চালাতাম। আমাব কাছে আর্ট থিয়েটাব সেই কাল্পনিক স্বর্গরাজ্যের মতই ছিল। কারণ শিক্ষানবিশী সময়ের আগাগোড়াই আমার মনে কিছু না কিছু নতুন পরিকল্পনা খেলত অথচ আমার কোন অর্থসঙ্গতিই ছিল না সে গুলিকে কার্যে পরিণত করার। এই থিয়েটাব কোম্পানী অর্থেব দিক দিয়ে খুব সচ্ছল এবং পরিচালকবর্গ ছিলেন প্রগতিশীল ও শিল্পমনা। আমার চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ আবও কয়েকজন ছিলেন। আমাকে প্রযোজনাব মত কোনো গুরুত্ব পূর্ণ কাজ দেওয়া হয়নি। 'কর্ণার্জুন' নাটকের দ্বিতীয় প্রধান ভূমিকা অর্জুনের পার্ট আমাকে দেওয়া হয়েছিল মাত্র। তথাপি আমার উৎসাহের কোন শেষ ছিল না এবং আমার সমস্ত সময় ও শ্রম আমি প্রযোজনার কাজে লাগাতাম। আমি থিয়েটারে

সকাল ৮টায় বা ৯টায় যেতাম এবং বাড়ী ফিরতাম মধ্যরাত্রে, কখনও কখনও তারও পরে। যে স্থলে অন্যান্য শিল্পীদের মাত্র সন্ধ্যা থেকে মধ্যরাত্র পর্যন্ত নাটকের প্রস্তুতির জন্য শিক্ষা ব্যবস্থায় যোগ দিতে হত। নাটকের উপস্থাপনার ব্যবস্থার কর্তা শ্রীপ্রবোধচন্দ্র গুহ আমার মধ্যে প্রযোজনার জ্ঞান সহ একজন স্বতঃপ্রবৃত্ত উৎসাহী কর্মীর লক্ষণ দেখতে পেয়ে আমাকে তিনি প্রযোজনার কাজে নিলেন ও ক্রমশঃ এবং অল্প অল্প করে প্রায় সমস্ত প্রযোজনার কাজই আমার হাতে দিলেন ; শুধু অফিসের কোন দায়িত্ব দিলেন না। নাটকের উপস্থাপনা, সেটিং (মঞ্চের সাজসজ্জা) থেকে পোষাকের নবরূপায়ন, পুরাতন মঞ্চ ম্যানেজারদের কাছে এক নব আবিষ্কার বলে মনে হল। মঞ্চসজ্জা সবই ভারতের পুরাতন প্রত্নতত্ত্বের ভিত্তিতে তৈরী হয়েছিল। পোষাকের পরিকল্পনা করা হয়েছিল অজন্তার দেওয়াল চিত্রাঙ্কনের ভিত্তিতে। কাজেই আমাদের সবই গোড়া থেকে নতুন করে আরম্ভ করতে হয়েছিল। কাপড়, অন্য সাজগোজের জিনিষ ইত্যাদি ও মালাব দানা সবই নতুন করে বাজার থেকে কিনতে হল সাজ পোষাকের বিভিন্ন অংশের জন্য। তারপর ওই সমস্ত কাপড় বিভিন্ন চকচকে রঙে যেমন ভেল্‌ভেট, সার্টিন এবং এই প্রকারের আরও অনেক কাপড় ইত্যাদির রঙ আমাদের নিজ হাতে রঞ্জিত করতে হয়েছিল। সাধারণতঃ গুহমশায় ও আমি নিজেই এ কাজ করতাম, এবং অলংকার তৈরীতে আমরা বিভিন্ন উৎসাহী অভিনেত্রী ও নর্তকীদের কাছ থেকে সাহায্য নিতাম। কিন্তু মঞ্চ সম্বন্ধে, যেখানে বিশেষ কৌশল বা চাতুর্যেব প্রয়োজন ছিল, সেখানেই যথেষ্ট পরিমাণে মঞ্চানুশীলনের প্রয়োজন হোত তা সঠিক ভাবে ফুটিয়ে তুলতে কিন্তু এই পরীক্ষা ভালভাবে কার্যকরী করার জন্য মধ্যরাত্রে রিহার্সাল শেষ করার পর ছাড়া আমাদের হাতে আর কোন সময় ছিল না। সুতরাং অভিনয়ের পক্ষকাল পূর্বে, আমাদের এই পরীক্ষামূলক সমন্বয়সাধনের কাজ মধ্যরাত্রি থেকে

ভোরের কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত চলত এবং পরিশেষে যখন নাটক উপস্থাপিত হত তখন স্বভাবতঃ এর একটা প্রভাব শ্রোতৃবর্গের উপর পড়ত। পর্দা ওঠার থেকে যবনিকাপাত পর্যন্ত সব কিছু ঘড়ির কাঁটার মত নিয়মমাফিক এবং অব্যাহতভাবে চলত। সমস্ত মঞ্চটাই যেন নানা রঙের ছবি দেখাবার যন্ত্রবিশেষ। অভিনেতৃবর্গেব শ্রেণীবিভাগ ও ভূমিকাবণ্টন ও নৃত্যগীত সংযোজনার কাজ এমন সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে সম্পন্ন হত যে পুরাতন মঞ্চ-ব্যবস্থাপকদের কাছে তা এক বিস্ময়ের বস্তু বলে মনে হোত। মঞ্চের সম্মুখ ভাগে আমরাই নানাচিত্র সমন্বিত ভেলভেটের পর্দা ব্যবস্থার প্রবর্তন করি। যবনিকার জন্য পূর্বে ছিল মাত্র রঙ্গীন পর্দার ব্যবস্থা। অভিনয়েব ক্ষেত্রেও আমরা সর্বপ্রথম প্রচলন করেছিলাম পার্শ্ব বা উপ-অভিনয়ের অর্থাৎ কিছু নির্বাক আনুষঙ্গিক কার্য যা মঞ্চে ব্যবহৃত সংলাপেব সঙ্গে সুসামঞ্জস্য ও সমার্থ-বোধক ও সমগ্রভাবে মঞ্চের দৃশ্য ও শিল্পীদের মধ্যে যে কাজ চলছে তা আরও শক্তিশালী ও প্রভাবশালী করে তুলতো। শুধু সংলাপরত চরিত্রগুলি এতে কোন অংশ গ্রহণ করত না। কাজেই সকল শিল্পীই সমবেত ভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে কিছু না কিছু করতো যা সেই দৃশ্যের প্রধান প্রতিক্রিয়ার পরিপোষক হত। ফল এই হত যে সমগ্র নাটকের কোথাও কোন নিরানন্দ মুহূর্ত খুঁজে পাওয়া যেতো না। এখানে ছিল পঞ্চাঙ্ক নাটক এবং এব অভিনয় শেষ হতে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা লাগত। অবশ্য সাম্প্রতিক কালে এই নাটক ছেটে-কেটে তিন সোয়া তিন ঘণ্টার উপযোগী করা হয়েছে। এই অভিনয় এমন অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছিল যে ষ্টারের শ্রোতৃবর্গের ভীড়ের চাপে জনসাধারণের গমনাগমনের রাস্তা এক মুখী হয়ে গিয়েছিল। ম্যাডানের 'বেঙ্গলী থিয়েটার' তখন শ্বাস টানছে ও বন্ধ হতে চলেছে। মিনার্ভা তখনও পুনর্নিমিত হয়নি। একমাত্র অন্য থিয়েটার যা চালু ছিল সে হোল দক্ষ নট শ্রী এস, এন, ঘোষ (দানীবাবু) পরিচালিত মনোমোহন থিয়েটার, কিন্তু তার অবস্থাও

শোচনীয় হয়ে পড়েছিল এবং পরিশেষে তা বন্ধ হয়ে গেল। আর্ট থিয়েটার লিমিটেডের কর্ণার্জুন নাটকের অসাধারণ সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে শিশিরকুমার ভাদুড়ী তখনকার মত অকেজো মনোমোহন থিয়েটার গৃহে নিজেই থিয়েটার খুললেন, এবং একখানি পৌরাণিক নাটক সীতা নিয়ে ১৯২৪ সালের ৬ই ডিসেম্বর প্রথম অভিনয় হল। আর্ট থিয়েটারের কায়দায় অতি সুন্দরভাবে সংস্থাপিত হয়ে এই নাটক বেশ কিছুকাল সাফল্যের সঙ্গে চলল। পরের বছর ভস্মীভূত মিনার্ভা থিয়েটার পুনর্নির্মিত হল। নতুন গৃহ জাঁকাল এবং বিরাটকায় মঞ্চ নির্মিত হল জাঁকজমকের সঙ্গে রীতিমত কাব্যিক ধরণে। আর্ট থিয়েটারের কর্ণার্জুন একদাক্রমে ২৬০ রাত্রি চলেছিল। কর্ণার্জুন শনিবার ও রবিবার মঞ্চ দখল করে থাকত বলে সপ্তাহের মধ্যবর্তী দিনগুলিতে আমরা রবীন্দ্রনাথের রাজা ও রাণী এবং ডি, এল, রায়ের চন্দ্রগুপ্তের পুনরাভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিলাম যতদিন অন্য নতুন নাটক প্রস্তুত না হয়। ১৯২৪ সালের নববর্ষের আরম্ভে আমরা ইরানের রাণী অভিনয় আরম্ভ করি। এ বই অস্‌কার ওয়াইল্ডের ডাচেচ্ অব্ পাডুয়ার ছায়া অবলম্বনে শ্রীঅপরেশ চন্দ্র মুখার্জী কর্তৃক রচিত। এই নাটক এমন একটা সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে লেখা, যখন ইরাণে অগ্নির পূজা হোত। এই বইয়ে আমি প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হলাম, এবং উপস্থাপনার সমস্ত দায়িত্ব ভারই নিজের কাঁধে নিলাম, অবশ্য মিঃ গুহ ছিলেন সহায়তায়। আসবাব পত্র ও অন্যান্য মঞ্চসামগ্রী, নাটকের দৃশ্যাবলী, দ্রাক্ষাকুঞ্জ সমস্তই অতি যত্ন সহকারে পরিকল্পিত ও নির্মিত হল। দৃশ্যবস্তুসহ সমগ্র অভিনয়—একটা আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি করল। আমি অভিনয়ে প্রধান প্রক্রিয়ায় নাটকীয় প্রভাব আরও বর্ধিত করতে বিরামক্ষণে ঐকতান বাদনের ব্যবস্থা করলাম। আর এই বাদকের দল সংগঠিত হল প্রায় বিশজন লোক নিয়ে। আমাদের পরবর্তী উপস্থাপনা 'বন্দিনী' সম্বন্ধেও একই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল।

ইটালিয়ান অপেরা 'আয়দা' (Aida) থেকে বন্দিনী নাটক প্রযুক্ত হয়েছিল। আর এর মঞ্চ উপস্থাপনা ভীষণ জাঁকজমকের সঙ্গে হয়েছিল। ইজিপ্‌ট্ অর্থাৎ মিশরীয় পটভূমিকায় রচিত এই নাটক উপস্থাপনে আমি পুরাতন মিশরীয় জীবন ও রঙের ধরণ ধারণ চালাবার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছিলাম। প্রত্যেকটি ব্যাপারেই সযত্নে ইতিহাসের সঙ্গে পূর্ণ সঙ্গতি রেখেই কাজ করা হয়েছিল, সামান্য অতিরঞ্জনের চেষ্টাও হয়নি। আমার পরের উদ্যোগ ছিল গ্রাম্য পৌরাণিক উপাখ্যান চাঁদসদাগরের গল্প অবলম্বনে শ্রীমন্মথ রায় রচিত নাটক। এই মন্মথ রায় তখন নাট্যসাহিত্যে নিতান্ত আগন্তুক হলেও পরে প্রতিভাসম্পন্ন নাট্যকার রূপে পরিগণিত। এই সময় আমি আমাদের কার্য্যালয়ে একজন উচ্চপদস্ত কর্মচারীরূপে গৃহীত হয়ে সহকারী পরিচালকের দায়িত্ব পেলাম। তখন বহুদর্শী ও অভিজ্ঞ নাট্যকার শ্রীঅপরেশ চন্দ্র মুখার্জী পরিচালকের পদে বৃত হলেন। শিল্প প্রগতির এই ধারা বাংলা রঙ্গমঞ্চে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত চলেছিল। কিন্তু তার পূর্বে ১৯৩০ সালে আমি আর্ট থিয়েটার পরিত্যাগ করে মিনার্ভায় ম্যানেজার হিসাবে যোগদান করলাম। তখন অর্থাৎ ১৯৩২ সালে পৃথিবীর ব্যাঙ্কে মোরাটারিয়াম চলছে অর্থাৎ ঋণ পরিশোধ স্থগিত রাখার আইনগত অধিকার পেয়েছে এই কারণে সর্বত্র একটা আর্থিক সঙ্কট চলছিল। বাজার তখন ভয়ানক মন্দা। তবুও তখন শহরে চারটি থিয়েটার আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। ১৯৩২ সাল থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত থিয়েটার প্রবণতারই সময় সর্বদাই নানা ভাবে ও নতুন নতুন নাটকের পরীক্ষানিরীক্ষা চলছে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে সাফল্যমণ্ডিত নাটকও ৬০-৭০ অভিনয়ের বেশী চলছিল না। ১৯৩৬ সালের পর থেকে থিয়েটার ক্রমশঃ স্থিতিলাভ করতে লাগল এবং এক নতুন ধরণের অঙ্কুরোদগম হল। ঘূর্ণমানমঞ্চ এবং ওয়াগন চক্রীবিশিষ্ট রঙ্গমঞ্চ ১৯৩৩ সালে প্রবর্তিত হল। পূর্বতন আর্ট থিয়েটারের জনপ্রিয় সেক্রেটারী শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র গুহ প্রবর্তিত

এই ওয়াগন মঞ্চের সম্বন্ধে আমার ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি 'নাট্যনিকেতন' নামে এক নতুন থিয়েটার খুললেন এবং আমাকে শিল্পী ও নাটকের উপস্থাপক হিসাবে কাজ করতে আমন্ত্রণ জানালেন। তিনি তখন অনেকটা অন্তরালেই চলে গেছেন এবং তাঁর পুত্রের সাহায্যেই ব্যবসাকার্য পরিচালনা করছিলেন। এই ওয়াগন ষ্টেজ অসাধারণ সাফল্যলাভে সমর্থ হলো। নাট্য নিকেতনের মঞ্চ এক দিকে যেমন বদ্ধ অন্যদিকে তেমন নড়াচড়ার যথেষ্ট জায়গা ছিল বলে, ওয়াগন ষ্টেজে নাটক উপস্থাপনে খুব সুবিধা ছিল। এর পরে ১৯৩৯ সালে নাট্যনিকেতন একটি ঘুর্ণমান মঞ্চ পেয়েছিল। আমরা পুরাপুরি ভাবেই ঘুর্ণমান মঞ্চের সদ্ব্যবহার করেছিলাম প্রসিদ্ধ নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত রচিত নতুন নাটক তটিনীর বিচারের অভিনয় দ্বারা। অনেক সামাজিক নাটকের তিনি গ্রন্থকার। তখন থেকে তিনি অতি আধুনিক মনস্তত্ব বিষয়ক নাটক নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা চালাতে লাগলেন। এবং ওই সকল নাটকের উপস্থাপনায় ঘুর্ণমান মঞ্চ যথেষ্ট সহায়তা করেছিল। এই বইয়ে আমি এক কুচক্রী ডাক্তারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলাম এবং দৃশ্যান্তরের সঙ্গে অভিনেতা অভিনেত্রীদের চলাফেরা আগমন নির্গমন ইত্যাদির সঙ্গে সমন্বয়সাধনপূর্বক ঘুর্ণমান মঞ্চের ডিস্‌কের পরিবর্তন ব্যবস্থার সময়-সূচী ইত্যাদি সবই আমাকে করতে হতো প্রত্যেক দৃশ্যান্তরের সময়। তারপর এল শচীন সেনগুপ্তর 'সংগ্রাম ও শান্তি' 'নার্সিংহোম' এবং মহেন্দ্র গুপ্তর 'কঙ্কাবতীর ঘাট'। সকলই ঘুর্ণমান মঞ্চে অভিনীত হলো। এ সবই ঘটেছিল ১৯৪১ সালের শেষের দিকে এবং ১৯৪২ সালে। তারপরই ব্যবসায়িক মন্দা এল যখন জাপানী বোমার ভয়ে বিহ্বল কলকাতাবাসীরা দলে দলে শহর ত্যাগ করতে লাগল। তারপর ১৯৪৩ সালে যখন মহাসমর পুরোদমে চলছে তখন স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলে দর্শকদের শিল্পরসহীন, নির্গুণ নাটক পরিবেশন করা হচ্ছিল এবং আশ্চর্যের বিষয় যে সেগুলো আনন্দের সঙ্গে

বিকশিত হতে লাগল। এইগুলি ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর, পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু আগমনের ঢল নামার সঙ্গে সঙ্গে খুব ভালরকম অর্থকরী হয়ে উঠেছিল। কারণ তখন পুরাতন উচ্চাঙ্গের নাটকের ও জনপ্রিয় শিল্পীদের চাহিদা বেশ বেড়ে গিয়েছিল। এই উদ্বাস্তু লোকেরা সমস্ত জনপ্রিয় এবং প্রতিভাশালী অভিনেতা অভিনেত্রীদের দেখতে চেয়েছিল এবং একই নাটকে যত বেশী নামকরা নট-নটীর সমাবেশ হতো ততই তাতে বেশী দর্শক সমাগম হতো। তাদের এই ইচ্ছা ভালভাবে পূর্ণ হতো সেই সব সংযুক্ত অভিনয়ে যেখানে এক সাথে বহু নটনটী আবির্ভূত হতো। এমনকি খুব ছোট অংশেও নামকরা অভিনেতারা থাকতেন শুধু এদেরই চাহিদা মেটাবার জন্য। এই রকম বহু সংখ্যক সংযুক্ত অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়েছিল, এবং যত বেশী সংখ্যক ভাল অভিনেতা তাতে নামানো সম্ভব তা নামানো হয়েছিল। এই সংযুক্ত অভিনয়ের পাগলামী ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত চলেছিল। এর পরেই এক অনুসন্ধিৎসার উদ্ভব হয় এবং লোকেরা নতুন নাটক দেখতে উৎসুক হয়ে ওঠে। ১৯৫৩ সাল থেকে কলকাতার চারটি থিয়েটারের দুইটির নব রূপায়ন ঘটানো হলো এবং নবসাজে সাজানও হলো। কিছু নতুন শিল্পীকে নিয়ে নতুন নাটকের উদ্বোধনও হলো। সেইগুলিই তখন চলেছিল। তার একটি পর পর ৩৮৯ রাত্রি চলেছে এবং অন্যটি ১৭০ রজনী। অবশিষ্ট দুইটির একটি শিশিরকুমার ভাদুড়ীর পরিচালনায় পুরাতন নাটক নিয়েই চলেছিল এবং অন্যটি কার্যতঃ নবরূপে রূপায়িত হয়েছিল। এগুলির মধ্যে একটি শীঘ্রই শীতাতপনিয়ন্ত্রিত থিয়েটারে পরিণত হল। পশ্চিমবঙ্গে এইটাই প্রথম শীতাতপানিয়ন্ত্রিত থিয়েটারগৃহ হলো। এইরূপ প্রস্তুতি এবং পশ্চিমবঙ্গ নৃত্যনাট্য এবং সঙ্গীত একাদেমীর পরিকল্পনাসমূহ দ্বারা অনুপ্রাণিত পশ্চিম বাংলার আর্ট থিয়েটার এক স্মরণীয় স্মৃতি বহন করবে এবং জাতীয় রঙ্গশালার পরিকল্পনা রূপায়িত

হবার দিনও আর বেশী দূরে নয়। তখন এখানে ভাল নাটক বা প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পীরও অভাব হবে না। এইরূপে রঙ্গমঞ্চ এবং নাটকের ভবিষ্যৎ পশ্চিমবাংলায় খুবই উজ্জ্বল আশাপ্রদ এবং সম্ভবনাময়। ভারতবর্ষে আধুনিক রঙ্গালয়ের আদি বাসভূমি কলকাতা। এখানে পাশ্চাত্যভাবাপন্ন নাটকের পরিপোষণ এবং উন্নয়ন এক চরম পর্যায়ে পৌঁছেচে। আশা করি সেই কলকাতা শীঘ্রই জাতীয় নাট্যশালার জন্মভূমি ও পালনক্ষেত্রে পরিণত হবে।

॥ কণ্ঠস্বর—ইহার নিয়ন্ত্রণ ॥

এখানে আলোচনার বিষয়—"কণ্ঠস্বর এবং তার নিয়ন্ত্রণ (Voice and its manipulation)। 'ম্যানিপুলেশন' শব্দটা কিছুটা বিভ্রান্তিকর। এর অর্থ বোঝাবার জন্য এর জায়গায় অন্য কোনো শব্দ বা শব্দ সমষ্টি ব্যবহার করতে পারলেই ভাল হতো। এই শব্দটি, আমার মনে হয়, এখানে এর অপপ্রয়োগ। এর মূল অর্থের সঙ্গে যোগ করা উচিত কণ্ঠস্বর উৎপাদন পদ্ধতির প্রয়োগ, যা নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করছি।

'ম্যানিপুলেশন' শব্দটা যে অর্থই বহন করুক না কেন, আলোচনার বিষয়টি খুবই বৃহৎ এবং এ বিষয়ের উপর রাশি রাশি গ্রন্থ পৃথিবীর বিখ্যাত বিখ্যাত লেখকদের দ্বারা রচিত হয়েছে। অতএব বোঝা যাচ্ছে আধ ঘণ্টা এমনকি এক ঘণ্টার মধ্যেও এ বিষয়ে মোটামুটি একটা হালকা ধরণের আলোচনা হওয়াও সম্ভব নয়। কাজেই এ বিষয়ে কয়েকটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দিক নিয়ে আমি আলোচনা করব। কম বয়সী শিক্ষার্থীদের যা জানা দরকার, এর প্রাথমিক জ্ঞান নিয়েই তারা এ বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে পারবে। কাজেই একেবারে সুরুতেই আমি পাঠকবর্গকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে আমি এখন যেটুকু আলোচনা করব তা এ বিষয়ের চূড়ান্ত ব্যাখ্যা নয়। শুধু এর বহিরঙ্গের একটা খসড়া মাত্র।

।। স্বর নিয়ন্ত্রণ ।।

মোটামুটিভাবে কণ্ঠস্বরকে দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—স্বরবিজ্ঞান ও স্বর, ইহার উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন। প্রথমটির মধ্যে আসে স্বরোৎপাদনের যে মূল বৈজ্ঞানিক রীতি, তার বিশদ বিশ্লেষণ, যার উপর কণ্ঠস্বরীয় কলাকৌশলের প্রশিক্ষণ নির্ভরশীল। দ্বিতীয়টির কাজ হল স্বরোৎপাদনের ক্ষেত্রে এই মূল নীতির প্রয়োগ। যার জন্য পাশ্চাত্য দেশে অধুনা নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি প্রয়োগ করা হচ্ছে। সাম্প্রতিক কালে কণ্ঠস্বর সম্বন্ধে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে এবং ত্রুটিপূর্ণ কণ্ঠস্বরের সংশোধন সম্বন্ধেও যে মূলনীতির প্রয়োগ করা হয় তার অনেকটা অগ্রগতি হয়েছে। খুব ভাল কণ্ঠস্বরোৎপাদনেব পূর্বে শিক্ষার্থীকে নানাপ্রকার অপ্রীতিকর নিয়মকানুনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়। কলাকৌশলের দিক দিয়ে যাকে বলা হয় স্বরনিয়ন্ত্রণ। আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে ধন্যবাদ। অনেক অমার্জিতস্বর নিয়ন্ত্রিত ও সংশোধিত হয়েছে। স্বর নিয়ন্ত্রণের এই রকম সংশোধন সেই সকল ছাত্রদের জন্য আরও বেশী প্রয়োজন যারা গায়ক হতে চায়। কখনও কখনও অন্যদেব জন্যও এর প্রয়োজন হয়।

।। কণ্ঠস্বরের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে ।।

সত্যিকারের ভাল স্বরোৎপাদনের লক্ষণগুলির মধ্যে আছে— উচ্চারণের সহজতা, শক্তি, ও স্বরের মিষ্টতা ; শ্রোতা এবং বক্তার বা গায়কের কণ্ঠের স্বাচ্ছন্দ্য। কণ্ঠস্বরের যে স্বাভাবিক গুণ - যা লোকের ব্যক্তিগত বা নিজস্ব প্রশিক্ষণ দ্বারা সৃষ্টি করা যায় না কারণ মূলতঃ কণ্ঠস্বরের যে জন্মগত বা দেশজ গুণ সে হচ্ছে ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে তার বিশেষ প্রকৃতিগত গুণ। অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন স্বাভাবিক জন্মসূত্রে পাওয়া গুণ। তা তাদের একান্তই নিজস্ব গুণ। বিবেচনাপূর্ণ প্রশিক্ষণ মানুষের কণ্ঠস্বরের উন্নতি সাধন করতে পারে, এবং তা করেও। এ ছাড়াও পারে আড়ষ্টতা দূর করে কণ্ঠস্বরের সহজতা আনতে ও শক্তি বাড়াতে যা সংখ্যাতীত প্রশিক্ষণবিহীন অভিনেতা, গায়ক, বক্তা এবং অন্যেরা বুঝতে পারে না এমনকি কল্পনাও করতে পারে না। স্বরোৎপাদনকে বাগ্মিতা, সভাসমিতিতে বক্তৃতা অথবা গানের সঙ্গে এক করে ভুল বোঝা উচিত হবে না, যদিও ঐ দুয়ের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। খুবই দুঃখের বিষয় এটা প্রায়ই উপেক্ষিত হয় বা কিছু লোক এর সামান্যই মূল্য দেয়। এরা বোঝে না যে স্বর সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ এবং উপযুক্ত রকম উন্নয়ন গায়ক, বক্তা বা বাগ্মী সকলের পক্ষেই সমভাবে আবশ্যক। কারণ কোন 'আইডিয়া' বা আবেগের অভিব্যঞ্জনায় কণ্ঠস্বরের পুষ্টি এবং উপযুক্ত উন্নয়ন তেমনভাবেই প্রয়োজন যেমন প্রয়োজন অশ্বারোহীর একটি সুশিক্ষিত অশ্বের এবং পিয়ানোবাদকের একটি সুগঠিত ও সুর লয় যুক্ত পিয়ানোর। এর থেকে আসে স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম ও সুরসাম্য, যার থেকে

সহজেই জন্মাবে সন্তোষ উৎপাদনের প্রবৃত্তি এবং স্বরের উপর যে ফল পাওয়া যাবে তা শিল্পী এবং শ্রোতা উভয় দিক দিয়েই সুখকর হবে। শারীরিক ব্যায়াম প্রশিক্ষণ সবলের পক্ষে যেমন উপযোগী, দুর্বলের পক্ষেও তেমনই। সেই রকম কণ্ঠস্বরের উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টাও শক্তিসম্পন্ন ও দুর্বল কণ্ঠস্বরের পক্ষে সমভাবে কল্যাণকর। গান এবং সভা সমিতিতে বক্তৃতা সাধারণ কথোপকথনের চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথক, যেমন পৃথক প্রতিযোগিতামূলক দৌড় সাধারণভাবে হেটে চলে বেড়ানোর থেকে। স্ববোৎপাদনের কাজ হচ্ছে স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরকে প্রশিক্ষণ দ্বারা উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া। যাতে এই স্বব অনায়াসে, আরামদায়কভাবে এবং কার্যকরীভাবে গান এবং বাচন উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহার কবা যায়।

।। স্বরোৎপাদনের উপকারিতা ।।

বক্তৃতা করা এবং গান গাওয়া আরও সুখকর ও কার্যকরী করে তোলা যায় তখনই, যখন এটা অত্যন্ত অনায়াসে সম্পন্ন করা যায় অর্থাৎ এতে অতি অল্পই কষ্ট বা চেষ্টার প্রয়োজন হয়। কারণ বক্তৃতা প্রদানে এবং গানে যে জোর এবং চেষ্টার প্রয়োজন বা প্রয়োগ করতে হয়, তার ছাপ যদি বক্তার ও গায়কের কণ্ঠে বা হাবেভাবে ফুটে ওঠে, তাহলে শ্রোতারা সহজেই তা ধরতে পারে এবং তাতে এক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। অবশ্য কিছুটা চেষ্টা এতে প্রয়োজন হয়ই। কিন্তু সেই চেষ্টা নিতান্ত অনায়াস সাধ্য ও স্বাচ্ছন্দ্যময় হবে, যেমন স্বাচ্ছন্দ্যময় অতি সাধারণ শারীরিক শ্রমের কাজ। যেমন শ্রমের কাজ মাত্রেই কিছু সময় বাদে কিছুটা ক্লান্তি উৎপাদন করে। তেমনি বক্তৃতা এবং গানও উপযুক্ত সময় অতিবাহিত হবার পর ক্লান্তি আনে। এ সম্বন্ধে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রয়োজন যাতে সহনশীলতা বাড়ে, কাজে সহজতা আসে ও শক্তি পুনরুজ্জীবন অতি সহজেই হয় এবং ক্লান্তি দূর করে। কাজেই কণ্ঠস্বরের অনুশীলন শ্রোতার পক্ষেও যেমন উপকারী, গায়কের ও বক্তার পক্ষেও তেমনি। কারণ এই অনুশীলন কণ্ঠস্বরের স্বাভাবিক সুর লয় ও মিষ্টতা পরিশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত করে এবং তাঁদের গভীরতা বাড়ায়। শুধু তাই নয়, শ্রোতার কাছেও মনে হয় যে বক্তা বা গায়ক আরামদায়কভাবে এবং মধুরভাবে বলছেন বা গাইছেন। দক্ষতার সঙ্গেও এ প্রশ্নের সম্পর্ক রয়েছে। দক্ষতা সাহায্যপ্রাপ্ত হয়, সহজ, সরল সুকোমল কণ্ঠস্বর ও প্রীতিপ্রদ সুর ও লয় থেকে। আবার স্বাচ্ছন্দ্য এবং সুরের সাবলীলতা অতি দ্রুত শ্রোতাদের মন স্পর্শ করে এবং তাঁরা তৎক্ষণাৎ বক্তা বা গায়কের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দেন।

॥ নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ও শ্বাসবায়ু নিয়ন্ত্রণ ॥

স্বরানুশীলন দ্বারা স্বর সম্বন্ধীয় ইষ্টসাধনের সম্ভাবনা সম্পর্কে আমরা উপরে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি। এই উপকারিতা ছাড়াও, একজন স্বরোৎপাদন শিক্ষার্থীকে নির্ভুল শ্বাস-প্রশ্বাসের অভ্যাস অবশ্যই করতে হবে। কণ্ঠস্বরীয় সকল উৎকর্ষ সাধনের এইটাই হল ভিত। নির্ভুল শ্বাস প্রশ্বাসের কাজ থেকেই সে উত্তমরূপে শ্বাস বায়ু নিয়ন্ত্রণের অভ্যাস আয়ত্বে আনতে শেখে। এতে করেই তার শ্বাসযন্ত্রের ক্ষমতা বাড়ে এবং আরও শ্বাসবায়ু বক্তা বা গায়ক তার শ্বাসযন্ত্রে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। আর শুধু তাই নয়, এর ফলে আরও অনেক বিশুদ্ধ বায়ু শরীরে প্রবেশ করে ও রক্তে অম্লজানের যোগান বাড়িয়ে আনুষঙ্গিক সর্বপ্রকার সুফল আনয়ন করে। বক্তা, অভিনেতা ও গায়কের কাছে এর মূল্য অনেক বেশী। কারণ এদেরকে এমন জায়গায় কাজ করতে হয় যেখানে বায়ু-মণ্ডল পরিত্যক্ত-নিঃশ্বাস-বায়ুতে কলুষিত।

চিকিৎসা বিছার দিক দিয়ে স্বরোৎপাদন রক্তশূন্যতা, ক্ষয়রোগ ও শ্বাসযন্ত্রের শ্বাসনালীর ও কণ্ঠের অন্যান্য পীড়ার খুব বড় শত্রু। মিসেস এমিল বেঙ্কে (Mrs. Emil Behnke) তাঁর দি স্পিকিং ভয়েস (The Speaking Voice) গ্রন্থে এ বিষয়ে আর এক বিখ্যাত পণ্ডিত হাম্বেল্‌টনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যায়াম স্বরানুশীলনকারীর শারীরিক দিক দিয়ে বিশেষ উপযোগী।

ভারতবর্ষে শ্বাস বায়ু নিয়ন্ত্রণের ব্যাপার আমাদের কাছে কিছু নতুন জিনিষ নয়। আমাদের পুরাকালের এবং আজকের সাধু সন্ন্যাসীরা, যাঁরা আমাদের যোগশাস্ত্র শিখিয়েছেন তাঁরা সর্বদাই

শ্বাস বায়ু নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ অভ্যাসের উপর এবং ভক্তিমার্গে মনোসংযোগের অভ্যাসের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। আর এতেই রোগ নিরাময় করে ও শক্তি যোগায় এবং আমাদের জড়দেহকে আধ্যাত্মিক ক্ষমতা দেয় ও শ্বাসযন্ত্র, শ্বাসনালী, কণ্ঠ এবং সমগ্রভাবে আমাদের দেহকে সঞ্জীবিত করে। ভাল বক্তার পক্ষে এগুলি অপরিহার্য। প্রাচীন ভারতে যোগের সুবিখ্যাত নির্দেশক ও পৃষ্ঠপোষক ঋষি পাতঞ্জলী বলতেন সর্বনিয়ন্তা ভগবানের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের পথে যে অপরিহার্য আটটি স্তর আছে তার একটি হলো 'আসন।'

॥ অন্যান্য উপকারিতা ॥

আর একটি উপকারিতা এই যে স্বারানুশীলন থেকেই ভাষা এবং বাক্য প্রয়োগ সম্বন্ধে পূর্বানুরাগ জন্মায়। আবার কণ্ঠস্বরের মাধুর্য্যও স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের বিশুদ্ধ উচ্চারণের উপর নির্ভরশীল। এই অভ্যাস থেকেই স্বভাবতঃ সাহিত্যপ্রীতি আসে এবং তখন লোক নিজের অজ্ঞাতেই উৎকৃষ্ঠ সাহিত্য ও কবিতার অনুরাগী হয়ে পড়ে। তখন তার কাছে কতকগুলি ধ্বনি সম্বলিত শব্দ সমষ্টির কোন মূল্য থাকে না বা অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হয়।

সর্বশেষ কথা, কিন্তু অগ্রাহ্য করবার মত কথা নয়—অন্যান্য প্রক্রিয়ার ফলাফলের ভিতর দিয়ে স্বরোপোদনের যে ফললাভ হয়, তার যে একটা বিশেষ সামাজিক উপকারিতা আছে যা বোঝাবার বা বুঝবার জন্য কোন বড় রকমের কল্পনাশক্তির প্রয়োজন হয় না। মনুষ্যজীবনে যে বিছিন্নতা, তার মূলে রয়েছে চিন্তার বিভিন্নতা। কারণ এর প্রকাশের মধ্যে একটা শক্তি রয়েছে এবং শ্রোতার মনের উপর ও অনুভূতির উপর তার প্রভাব খুবই প্রখর। একটা উৎকৃষ্ট কণ্ঠস্বর এবং অমার্জিত জিহ্বা ঢের বেশী বর্জনীয় আমাদের কাছে, মোটা সূতোর বিশ্রী কোট অথবা তথাকথিত কোন নিকৃষ্ট কাজের চেয়ে।

॥ কণ্ঠস্বরের আনুষঙ্গিক শারীরবৃত্ত ॥

এবিষয়ে আরও অগ্রসর হবার পূর্বে কণ্ঠস্বরীর কলানৈপুণ্য বিষয়ে অপরিহার্য নিয়মকানুনগুলি আমাদের জানতে হবে। এ সম্পর্কে আমি নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

সঠিকভাবে উৎপাদিত কণ্ঠস্বর যেন একটি বাদ্যযন্ত্র। কণ্ঠস্বর মাত্রেই তা সে গায়কেরই হোক আর বক্তারই হোক—সঙ্গীতের স্বর উৎপাদন করতে পারে—যাতে উদ্দেশ্য এবং স্বরসাধন সম্পূর্ণ নির্ভুল হতে পারে এবং তাহলেই তার গভীরতা ও প্রাকৃতিক তারতম্য কাজে লাগিয়ে কণ্ঠস্বরের নানাপ্রকার রূপান্তর ঘটানো সম্ভব হয়। সব উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছাত্রের পক্ষেই এটা কাম্য যদি তারা সত্যিকার শিল্পী হতে চায়।

কণ্ঠস্বরের যে গুণ শ্রোতৃবর্গের কাছে কণ্ঠস্বরকে আরামপ্রদ বা বিরক্তিকর করে তোলে তা তিনটি বিশেষ গুণের উপর নির্ভরশীল।

(১) সঠিক উচ্চারণ রীতি—যার অর্থই হলো স্বরকম্পন পর্দা সঠিকভাবে কেন্দ্রিভূত করা।

(২) স্বরের গভীরতা বা তীব্রতা বৃদ্ধির জন্য স্বরযন্ত্রের নির্দিষ্ট কম্পাঙ্ক (প্রতি সেকেণ্ডে ছয়বার) ও বিস্তার থাকা চাই।

(৩) ফ্যারিংসের (Pharynx) অনুনাদ ক্ষমতার সঠিক সামঞ্জস্য বিধান—উচ্চগ্রামের স্বর এবং নিম্নগ্রামের স্বর সঠিক ভাবে অনুনাদিত হওয়া চাই যাতে অনুনাদ সৃষ্টিকারী গহ্বরগুলি সঠিক ভাবে গঠিত হয়।

এটা স্মরণ রাখতে হবে যে প্রত্যেক পৃথক পৃথক যন্ত্র তার আকার প্রকার, সংগঠন ও পৈশিক উন্নয়ন ও পুষ্টির উপর নির্ভর করে, অর্থাৎ

তাদের উন্নতি অনুযায়ী একটা সুসামঞ্জস্য সর্বোচ্চ স্বরোৎপাদন সীমায় পৌঁছোতে পারে। শ্বাস বায়ুর চাপই কণ্ঠস্বরকে কার্যকরী করে এবং সঠিকভাবে স্বরোৎপাদন ঘটায়, একটা আভ্যন্তরীন বায়ু স্রোত বা কণ্ঠস্বরীয় বায়ু এ কাজ করে না। কাজেই নিম্নে বর্ণিত নিয়মকানুনগুলি পরিষ্কার বোঝা দরকার। স্বরোৎপাদন যন্ত্রের নিম্নোক্ত অংশ সমূহ আছে—

(ক) স্বারারম্ভকারক যন্ত্রাংশ ডায়াফ্রাম ও নিম্ন বক্ষপঞ্জরাস্থির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্বাসবায়ু-সঞ্চালক পেশীর সংঙ্কোচন ও বিস্ফারণের চাপেই নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাস বায়ুব চাপ নিয়ন্ত্রিত হয়।

(খ) ল্যারিংক্স্ই (Larynx) কণ্ঠস্বরের কম্পন স্মৃষ্টিকারী। এইটাই প্রকৃতপক্ষে শব্দের উৎস এবং একেই স্বর বলা যেতে পারে। কারণ ল্যারিংক্স্ ছাড়া সঙ্গীতের স্বর উৎপাদিত হয় না।

(গ) ফ্যারিংক্সের (Pharynx) গহ্বরগুলিই কণ্ঠস্বরের অনুনাদ স্মৃষ্টি করে এবং কিছু কিছু নিম্নতম স্বরের অনুনাদ স্মৃষ্টিকারী হচ্ছে ট্রাকিয়া এবং ব্রংকাই (Trachea and Bronchi)—শ্বাসনালী এবং শাখাশ্বাসনালী।

সাধারণতঃ জিহ্বার পেশী অর্থাৎ কণ্ঠনালীর উর্দ্ধভাগের জিহ্বা মূলের পেশীই অনুনাদ স্মৃষ্টি করে।

॥ তীব্রতার নিয়ন্ত্রন অথবা রেজিষ্ট্রেশান ॥

এটা প্রনিধানযোগ্য যে গলনালীর পেশীর (Laryngeal muscles) পরিপুষ্টির উপরই কণ্ঠস্বরের প্রাবল্য বা তীব্রতার নিয়ন্ত্রণ নির্ভর করে। এই নিয়ন্ত্রণের সমগ্র প্রশ্নটাই নির্ভর করে সেই পেশীগুলির উপযুক্ত সমন্বয় সাধনের উপর যে পেশীগুলি স্বররজ্জুর (Vocal Cords) সম্প্রসারণ ঘটায়। কণ্ঠস্বরের তীক্ষ্ণতা অনুযায়ী অধিকাংশ লোকই তিন প্রকাবের রেজিষ্টারেব (Register) কথা বলেন—উচ্চ, মধ্য এবং নিম্ন। কিন্তু যেহেতু মাত্র দুই শ্রেণীর মাংসপেশী আছে গলনলীতে (Larynx) সেইহেতু দুইটি রেজিষ্টার থাকাই উচিত স্ববেব তীব্রতা নিয়ন্ত্রণের জন্য, স্বরপ্রক্ষেপন সীমা নিয়ন্ত্রণেব জন্য নয়। এটা দেখা গেছে যে নারীরই হোক আর পুরুষেরই হোক প্রত্যেক কণ্ঠস্ববের দুইটি নির্দিষ্ট 'রেজিষ্টার' (Ragister) আছে। নারী এবং পুরুষের কণ্ঠস্বরের মধ্যে কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই। এই রেজিষ্টার দুটিকে বলা চলে 'ফলসেটো (Falsetto) এবং নিম্ন রেজিষ্টার।

বিশুদ্ধ এবং স্বাভাবিক অবস্থায় 'ফলসেটো' স্বর-নিক্ষেপন সীমার মাঝ বরাবর অত্যন্ত হালকা এবং কোমল কিন্তু যখন তা উচু পর্দায় তোলা যায় তখন ক্রমান্বয়ে দ্রুততালে বাড়তে থাকে। এই রেজিষ্টার অর্থাৎ ফলসেটোব নিশ্চিত একটা শক্তি সীমা আছে। সেই সীমা অতিক্রম করার পবই অর্থাৎ কোন একটা বিশেষ গণ্ডির বাইরে ঠেলে দিলেই তা ভেঙ্গে যায় অথবা স্বর-যোজনার অপর অর্থাৎ নিম্ন রেজিষ্টারের সঙ্গে মিশে যায়। বিশুদ্ধ স্বাভাবিক স্তরে ফলসেটো কম বেশী শ্রুতিমধুর হয়।

কোন এক বিশেষ নিম্নরেজিষ্টারের স্বাভাবিক স্বরোৎপাদনের তীব্রতা ফলসেটোর চেয়ে অনেক বেশী। অসমন্বিত অবস্থায় নিম্ন রেজিষ্টারের উৎপাদিত স্বর কর্কশ। কোন এক বিশেষ স্বরযন্ত্রের স্বাভাবিক অবস্থায় কোন রকম স্বরভঙ্গ ব্যতিরেকেই স্বরের তীব্রতা উচ্চতম পর্যায়ে উন্নত করা যেতে পারে। এটা দেখা গেছে যে কখনও কখনও শুধুমাত্র নিম্নরেজিষ্টারই বা ফলসেটোই ব্যবহার করা হচ্ছে, আবার কখনও বা তুই রেজিষ্টারই (নিম্নরেজিষ্টার এবং ফলসেটো) একের পর এক কিছুটা বিরতিসহ ব্যবহার করা হচ্ছে তুয়ের মধ্যে কোন রকম সমন্বয়সাধন ছাড়াই।

এটা খুবই স্পষ্ট যে যদি থাইরয়েডপেশীর উপর যে চাপ পড়ে তাহাই নিম্ন রেজিষ্টারকে নিয়ন্ত্রিত করে, তাহলে থাইরয়েড উপাস্থি-সমূহের উপর চাপ সৃষ্টি করেই তাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কাজেই মাঝে মাঝে থাইরয়েড উপাস্থিসমূহের পরিচালন প্রয়োজন হয়। এর মূল্য একজন গায়কের কাছে খুবই বেশী। কারণ সুসমহারে ক্রমবর্দ্ধমান স্বরের তীব্রতা যা সত্যিকারের শিল্প নৈপুণ্যের নিদর্শন তা কেবল মাত্র স্বরনিয়ন্ত্রণ দ্বারাই সম্ভব, তা সে একটি রেজিষ্টার উৎপাদিত স্বরই হোক বা মিশ্র রেজিষ্টারেরই হোক। ভাল উচ্চারণের জন্য গলনালীর উর্দ্ধাংশ (Laryngeal Pharynx) এবং কণ্ঠের সুষ্ঠু পরিচালনাভ্যাস করতে হবে। সংক্ষেপে ল্যারিংকস্ (Larynx) জিহ্বা এবং কণ্ঠ, এই তুয়েরই কাজের মধ্যে নিখুঁত সামঞ্জস্য থাকা দরকার। স্বর যখন সঠিকভাবে উচ্চারিত হয়, তখন কণ্ঠের পেশীগুলি স্বাচ্ছন্দ্য-ভাবে অবস্থান করে। শ্বাসনালীর ছিদ্র (স্বরোৎপাদক উপাস্থিসমূহের মধ্যবর্তী স্থান) তার নিজের আভ্যন্তরীণ পেশীর দ্বারাই বন্ধ হয় এবং কণ্ঠ খোলা থাকে জিহ্বাপেশীর সাহায্যে। অনেক সময় কণ্ঠস্বরে ঘড়ঘড়ে আওয়াজ হয় অথবা উচ্চগ্রামে আওয়াজ হয় যখন এরিটেনয়েড (Aryteanoid) পেশীর উপর ঠিকমত টান পড়ে না এবং গলনালীর ছিদ্র স্বাভাবিক ভাবে বন্ধ হয় না। শব্দোৎপাদনের

জন্য গলার এবং চোয়ালের পেশীর উপর চাপের সাহায্যে গলনালীর ছিদ্র বন্ধ করা হয়। এই চাপ বা টানের উপশম ঘটানো সম্ভব করা যায় গলার এবং চোয়ালের পেশীর সুষ্ঠু পরিচালাভ্যাস দ্বারা। আর এই সবের মধ্যে একটা পূর্ণ সমন্বয়সাধন যখন সম্ভব হয়, তখনই আসে সম্পুর্ণ নির্দোষ স্ববোৎপাদন শিক্ষার শেষ পর্ব।

এটা শুধু গানের বেলাতেই নয়। বক্তৃতার স্বর সম্বন্ধেও সমভাবে প্রযোজ্য, কারণ গান সম্প্রসাবিত কথন বা বাচন ছাড়া আর কিছুই নয়।

আমি আব শিক্ষার্থীদের শাবীববৃত্ত সম্বন্ধীয় নানা জটিল প্রশ্নেব দ্বারা ভাবাক্রান্ত করতে চাইনে। এগুলি আরও অগ্রবর্তী ছাত্রদের জন্য তোলা থাক। কিন্তু স্বববিজ্ঞান সম্বন্ধে একটা মোটামুটি জ্ঞান প্রাথমিক স্তরেব ছাত্রদেব জন্য বিশেষ আবশ্যক, যাতে তারা সঠিকভাবে ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে এটা বুঝতে পাবে। একথা শিক্ষার্থীদের মনে বাখতে হবে যে অবৈজ্ঞানিক প্রথায় শিক্ষা শারীরিক স্বরযন্ত্রেব ক্ষতি সাধন কবে, কাজেই এটা বোঝা যাচ্ছে যে কথা বলার যে কলাকৌশল, সংক্ষেপে বলতে গেলে তা বক্ষদেশ, ল্যারিংক্স্ এবং জিহ্বা পেশীব উপযুক্ত পুষ্টিসাধনেব উপব নির্ভব করে আর এই সব পেশীর উপযুক্ত পুষ্টিসাধন ও অনুশীলন করতে কঠোর শ্রম ও নিষ্ঠার প্রয়োজন হয়।

আমি শিক্ষার্থীদিগকে পূর্বেই বলেছি যে গায়কের ব্যাপারেই হোক আর বক্তার ব্যাপারেই হোক স্বরোৎপাদনের উৎকর্ষ সাধনের জন্য স্বরানুশীলনের প্রয়োজন আছে। ভাল অভিনেতার পক্ষে সর্বপ্রথম ভাল কথন ভঙ্গী অপরিহার্য। অভিনেতা হিসাবে আমার জীবনে কলাকৌশল আয়ত্বে আনতে আমি অকপটে চেষ্টা করেছি। অতএব কথনশৈলীর অনুশীলন ব্যাপারেই আমার প্রশিক্ষণ যতটা নিবদ্ধ রাখা উচিত গানের ব্যাপারে ততটা নয়, যদিও এ দুয়ের জন্যই স্বরযন্ত্রের অনুশীলন আবশ্যক।

॥ বক্তার স্বরযন্ত্রের প্রশিক্ষণ ॥

বাক্যই মানুষের চিন্তা এবং অনুভূতির বহিঃ প্রকাশের মাধ্যমের একটি। আবার তার ব্যক্তিত্ব প্রকাশেরও এই পথ। ভাল কথা বলার অর্থ ই হলো স্বরযন্ত্রের মাধ্যমে মধুর স্বরোৎপাদনের চেয়ে কিছু বেশী। ভাল কথা বলার জন্য নৈপুণ্য চাই আবার প্রেরণাও চাই যাতে বক্তব্যকে পরিষ্কারভাবে এবং সহজবোধ্য করে শ্রোতার কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। একটি সুবক্তা হতে প্রথমেই দরকার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুগঠিত মন। পরিচ্ছন্ন চিন্তাধারাই ভাল বক্তৃতার ভিত। বক্তা তার ভাষণ যদি শ্রোতাদের কাছে খুব বিশ্বাসযোগ্য এবং গ্রহণীয় করতে চান তাহলে তিনি যা বলতে বা আলোচনা করতে চান তার উদ্দেশ্য এবং বিষয়বস্তু বেশ স্পষ্ট এবং সহজগ্রাহ্য হওয়া দরকার। স্বরানুশীলন নিখুঁত ভাবে আয়ত্বে আনার পূর্বে বাক্যপ্রয়োগের জন্য যে স্বরানুশীলন, তা কথা বলার স্বাচ্ছন্দ্য ও তৎপরতা আনয়নের কাজেই বেশী লাগাতে হবে। বাক্য প্রয়োগের শব্দ বিজ্ঞানের অনুশীলনেব কোন নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম অনুসরণের পূর্বে শ্রোতৃবর্গের সম্মুখে কথা বলার আত্মবিশ্বাসলাভের প্রচুর সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। আর এ অভ্যাস করতে হবে প্রারম্ভেই নিজেদের মধ্যে ছোট ছোট দলে বা বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে কোন বিষয়ে আলোচনা দ্বারা। যখন এটা আয়ত্বে আসবে, তখন বক্তার কাজ হবে যে সে তার কথা বলার মাধ্যমকে যতটা সম্ভব শ্রুতিমাধুর্য্য আরোপ করতে চেষ্টা করবে। আর এর জন্য দরকার চারটি বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রশিক্ষণ।

এর চারটি দিক

(১) স্বরোৎপাদন (Voice production)

(২) পরিস্ফুটন (Articulation)

(৩) উচ্চারণ (Pronunciation)

(৪) বলিবার ধরণ বা ভঙ্গী (Delivery)

কথা বলার জন্য যে স্বরোৎপাদন তাতে থাকবে।

(ক) বক্ষস্থলের সম্প্রসারণ—যাদের কণ্ঠস্বরের ব্যবহার বেশী করতে হয় তাদের ইচ্ছাপূর্বক নিম্নাংশের শ্বাস প্রশ্বাস জনিত চলাচল সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হয়, এবং বিরামহীন অনুশীলন দ্বারা ঐ স্থানের মাংসপেশীর সংকোচন প্রসারণের কাজটাকে আয়ত্বে আনতে হয়।

(খ) শ্বাসবায়ু নিয়ন্ত্রণ—যথেষ্ট বায়ু বক্ষগহ্বরে গ্রহণের ক্ষমতা অর্জনের পর স্বরোৎপাদনের জন্য বক্তার সেই বায়ু নিয়ন্ত্রণে আনার ক্ষমতা থাকা দরকার। উত্তম কণ্ঠস্বর তখনই সৃষ্টি করা যায় যখন শ্বাসবায়ু আয়ত্বের মধ্যে থাকে এবং স্বররজ্জুর উপর তার কাজ বেশ কোমল, মৃদু ও পরিমিত হয়। নিয়ন্ত্রাণাধীন শ্বাসবায়ুই কণ্ঠস্বরকে অত্যাধিক খাটুনীর চাপ ও ক্লেশ-মুক্ত করার প্রধান উপায়।

(গ) স্বর—স্বরানুশীলনের প্রথম কাজই হলো যে-শব্দ ব্যবহৃত হয় তাতে সুর যোজনা। মুখ গহ্বরের তালু এমন ভাবে তৈরী যে তা কণ্ঠধ্বনির সুরগুলিকে ধাবণ করতে পাবে এবং সেগুলিকে অতিরিক্ত শব্দ বহনের ক্ষমতা যোগাতে পারে এবং পুরামাত্রায় অনুনাদ ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে পারে। স্বরধ্বনি ঠিক দন্ত পংক্তির উর্দ্ধ দিকে তালুতে আঘাত করবে। চিবুকের, প্রয়োজনের চেয়ে কম নড়ন চড়ন, এবং জিহ্বার আড়ষ্টতা উপযুক্ত স্বরোৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রায়ই বিঘ্ন সৃষ্টি করে।

(ঘ) অনুনাদ—মূল স্বররজ্জুর স্বরধ্বনি শ্বাসনালীতে, গলায়, মুখে ও নাকের অনুনাদের সাহায্যে আরও পরিবর্ধিত হয়। উৎসবে আমরা যে লাউড স্পীকার ব্যবহার করি তার ধ্বনি সম্প্রসারণও এই একই প্রক্রিয়ায় ঘটে। যখন স্বরোৎপাদন ভাল হয় তখন অনুনাদ পুরামাত্রায় ও সুষ্ঠুভাবে হয়েছে বলে বুঝতে হবে। কণ্ঠস্বরের

ভাল অনুনাদ সৃষ্টি করতে বক্তাকে অনুশীলন দ্বারা নিম্ন চোয়ালের কোমল তালুর (Soft palate) ও জিহ্বার ঠোঁটের নমনীয়তা আনতে হবে। সাধারণতঃ যে সকল গলদ অনুনাদে ঘটে তা হলো (ক) স্নায়ুমণ্ডলের চাপ অনুনাদ যন্ত্রের দেওয়ালগুলিকে শক্ত করে দেয়, তাতে সুর সরু এবং কর্কশ হয়, (খ) কথা বলার সময় কণ্ঠস্বরকে খুব উচ্চগ্রামে নিয়ে গেলে অনুনাদের কাজ পূর্ণমাত্রায় চলতে পারে না, (গ) অস্পষ্ট ভাষণ, (ঘ) অতি কোমলতার দরুণ কোমল তালু (Soft palate) পেশীর কাজ ঠিকমত না হওয়ায় অনুনাসিকতা, ও (ঙ) জিহ্বার আড়ষ্টতা এবং (চ) ওষ্ঠকোণের সংকোচন যা সাধারণতঃ স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেই বেশী ঘটে।

অনুনাদ ক্ষমতাকে পুরাপুরি কাজে লাগাতে, উপযুক্ত শিথিলীকরণ, নিম্নচোয়ালের পেশীর, তালুর (Soft palate) জিহ্বা ও ঠোঁটের ব্যায়াম এ সবই নিয়মিত করতে হবে।

(১) নীচের শ্লোকটি শরীরের শিথিলতা আনয়নের কাজে সাহায্য করবে।

বসিব শান্ত—সহজভাবে বস

নড়িব না একান্ত—হও এখন শান্ত

পদযুগ বিশ্রামে বিন্যস্ত—পায়ের গোড়ালীর উপর গোড়ালী কাঁচির মত রাখ

বক্ষোপরি রাখি হস্ত—বুকে হাত রাখ

নেত্রপল্লব করি ন্যস্ত—চোখ বোজ

নিদ্রাদেবীরে আনো ত্রস্ত - ঘুমের ক্রোড়ে ঢলে পড়।

যতক্ষণ উঠতে না বলা হয় ততক্ষণই ঘুমতে হবে। হিন্দুর যৌগিক ব্যায়ামের 'সবাসনের' সঙ্গে এর মিল আছে। একেবারে মৃতদেহের মতই পড়ে থাকা।

(২) নিম্ন চোয়ালের ব্যায়াম করা যেতে পারে নীচের শ্লোকটির সুষ্ঠু উচ্চারণ সহ জোরে জোরে পঠন দ্বারা—

white sheep white sheep

on a blue hill

when the wind stops

you all stand still

you all run away

when the winds flow

white sheep white sheep

where do you go

(৩) কোমল তালুর (Soft-Palate) ব্যায়াম এইভাবে করা যেতে পারে।

নাক দিয়ে নিশ্বাস গ্রহণ কর এবং প্রশ্বাস বায়ু মুখের মধ্য দিয়ে বার করে দাও। এরূপ করলে কোমল তালুকে (Soft-Palate) জাগিয়ে তোলা হবে এবং তার কাজ সুষ্ঠুভাবে চলবে। এরূপ ব্যায়ামের পূর্বে নাক পরিষ্কার রাখতে হবে।

দ্রুত উচ্চারণ দ্বারা কোমল তালুর (Soft-Palate) পেশীকে জাগিয়ে কাজে লাগাও।

(*a*) pm, pm, pm, pm, pm,
bm, bm, bm, bm, bm,

(*b*) tm tm tm tm tm
dn dn dn dn dn

(*c*) kn kn kn kn kn
gn gn gn gn gn } (In nasal tone) নেঁ

(৪) ভাল স্বরোৎপাদনের জন্য জিহ্বার ব্যায়াম এইভাবে করা যেতে পারে—

মুখ বিস্তৃতভাবে খোলা রাখ। জিহ্বার অগ্রভাগ নীচের পাটির সামনের দাঁতের পেছনে আলতোভাবে লাগিয়ে রেখে সামনের দিক থেকে জিহ্বার বিস্তার ঘটিয়ে পেছন দিকে যাও যতক্ষণ না আলজিভের প্রান্তভাগ এবং জিহ্বার পশ্চাত দিকের মধ্যভাগে একটা পরিষ্কার শূণ্যস্থানের সৃষ্টি হয়। এই অবস্থা সৃষ্টি করা যেতে পারে 'আঃ' শব্দটা জোরের সঙ্গে এবং বিলম্বিত হয়ে উচ্চারণ দ্বারা।

(৫) ওষ্ঠদ্বয়ের ব্যায়াম—ঠোঁট চালনার সঙ্গে যে সকল মাংস পেশী জড়িত তা সবই উঠেছে মুখমণ্ডল থেকে, চক্ষুগহ্বরের কিনার, কানের কাছে গালের হাড় এবং থুতনীর হাড় থেকে। ঠোঁটের নড়নচড়ন তাই গালের সমগ্র উপরিভাগটাকে নাড়ায়। খারাপ বক্তৃতা দেবার মধ্যে যে সকল ত্রুটি থাকে তার একটা হলো ঠোঁট ছুটিকে পুরাপুরি স্বাচ্ছন্দ্য সহকারে চালনার ব্যর্থতা। বিশেষ করে উপরের ঠোঁট কথা বলার সময় শক্ত অনড় করে রাখলে, তাতে উচ্চারণে দাঁতের যে প্রভাব পড়ে তা অতীব বিরক্তিকর। কথা বলার সময় স্ত্রীলোক ও শিক্ষকদের মধ্যে একটা সাধারণ দোষ দেখা যায়। তা হল নিয়মিতভাবে এবং প্রায়শঃই ঠোঁটের কোনে পশ্চাত দিকে চাপ রেখে কথা বলা। এই রকম নড়ন চড়ন এবং ঠোটের ও গালের কাঠিন্য কণ্ঠস্বরে একটা অপ্রীতিকর খ্যাঁনখেঁনে শব্দ যোগ করে। এটাকে এড়িয়ে চলতে, কথা বলার সময় ঠোঁটের পরিচালনা সম্মুখের দিকে চাপ রেখে হওয়া দরকার। এরূপ সম্মুখে পরিচালন এবং ঠোঁট ছুটিকে গোলাকার অবস্থা সৃষ্টির জন্য W. U. O এর উচ্চারণ দরকার। ছুটি স্বরবর্ণ 'I' এবং E উচ্চারণের জন্য ও ব্যঞ্জনবর্ণ 'S' উচ্চারণের জন্য ঠোঁটের কোণের একটু সঙ্কোচন আবশ্যক হয়। কথা বলার সময় বক্তা সাধারণতঃ ঠোটের পরিচালনে সম্মুখ দিকে চাপ রাখবেন। এবং এটাও দেখবেন যে বিশেষ করে উপরের ঠোট বেশ সহজ ও নমনীয়ভাবে সম্মুখের দিকে চাপ রেখে নড়ে কিন্তু উপরের

দাঁতের সঙ্গে লেগে না যায় বা আটকে না পড়ে! নিম্নের ব্যায়ামভ্যাস খুবই কার্যকরী হতে পারে।

(ক) ঠোঁট দুটি পরস্পরের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে যুক্ত কর এবং মৃদু মৃদু হাস।

(খ) ঠোঁট দুটি দৃঢ়ভাবে যুক্ত করে সম্মুখের দিকে যতদূর সম্ভব বাড়াও যেন তোমার প্রিয়জনকে চুম্বন করছ।

এইভাবে একবার (ক) এবং একবার (খ) এর নির্দেশিত মত কাজ কর এবং তা চালিয়ে যাও।

(গ) মুখ খুব বড় করে খোল এবং এমনভাবে হাসো যাতে উপরের ঠোঁট পশ্চাতে সঙ্কুচিত হয়ে সম্মুখের দাঁতগুলি পরিস্ফুট করে দেয়। ঠোঁট দুটির কোণ ভালভাবে পেছনের দিকে টান।

(ঘ) ঠোঁট দুটি একসঙ্গে লাগিয়ে বৃত্তাকারে খুলে যতদূব সম্ভব সম্মুখের দিকে এগিয়ে দাও। দেখ যেন বন্ধ না হয়ে যায়।

এইরূপে (গ) এবং ঘ) একবার এটা একবাব ওটার নির্দেশ পালন করে চালাও।

(ঙ) প্রত্যেক বার ঠোঁট দুটি সম্মুখের দিকে ঠেলে দিয়ে স্বরবর্ণ 'i' উচ্চারণের অবস্থাব থেকে 'u' উচ্চারণের অবস্থা পর্যন্ত দ্রুত এবং বারবার চালনা কর। তারপর এইরূপ চালনা উল্টো করে 'u' থেকে 'v' পর্য্যন্ত আসতে থাক। আর এই একই প্রকারে স্বরবর্ণ 'ɵ' এবং 'o' কে নিয়েও করতে হবে এবং ঐ রকম উল্টে নিয়েও করতে হবে।

(চ) একইভাবে দুই ঠোঁট চেপে বন্ধ কর। এত জোরে চাপো যে উপরের বহির্ভাগে টোল পড়ে। একবার চাপো এবং ছাড়ো। ঠোঁট না খুলে এইভাবে চাপো এবং ছাড়ো।

(১) যথেষ্ট পরিমাণ অনুনাসিক অনুনাদ।

কণ্ঠস্বরে নাকের অনুনাদ অত্যাধিক থাকতে পারে বা কমও থাকতে পারে। এর সবটাই খারাপ। যখন অনুনাদ অপ্রীতিকর ভাবে

হতে থাকে তখন কোমল তালুর (Soft palate) সুনির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ চালিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ স্বরের অনুনাসিকতা যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত না হয়। অপ্রতুল অনুনাসিকতা আসে টন্‌সিলের অত্যাধিক পরিবর্ধন থেকে। যে স্বরে অনুনাসিক অনুনাদ ক্ষীণ সে স্বরে বক্ষস্থলের অনুনাদের যোগানও অপ্রতুল এবং উপর পঞ্জরীয় শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রবাহ স্বাভাবিক ভাবেই ঘটে না। উপর পঞ্জরীয় শ্বাসপ্রশ্বাস বলতে বোঝায় বুকের উর্দ্ধ দিকের শ্বাসপ্রশ্বাস যাতে স্কন্ধদেশ ওঠানামা করে কিন্তু ডায়াফ্রাম একেবারেই নিশ্চল থাকে এবং এই শ্বাসকার্য মুখের সাহায্যে হয়। অনুনাদ শক্তির পরিবর্ধন দ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাস কার্যকরী ভাবে নিয়ন্ত্রনের উপরই এরূপ কণ্ঠস্বরের পুনর্গঠন সম্ভব।

(২) পরিস্ফুটন—

কথাবার্তায় পরিস্ফুটন (articulation) শব্দটির দ্বারা আমরা এখানে বলতে চাই ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ। অযত্নকৃত উচ্চারণে ভাষণ খারাপ হয়। আর শ্রোতৃবর্গ ঠিকভাবে তা বুঝতেও পারে না। অপরিচ্ছন্ন উচ্চারণের দ্বারা প্রযুক্ত বাক্যও অপরিষ্কার হয়। পরিস্ফুট উচ্চারণের পরিপ্রেক্ষিতে কথাবলাটা অপরিহার্যভাবেই পেশীর নিয়ন্ত্রণ অভ্যাস থেকেই আসে। এবং অন্য সকল পেশীর নিয়ন্ত্রণাভ্যাসের মতই স্বরোৎপাদনে নিযুক্ত পেশীগুলিরও পরিচ্ছন্ন, দৃঢ় এবং সুনির্দিষ্ট পরিচালন দ্বারাই নিয়ন্ত্রণ অভ্যাস করতে হয়।

॥ একটা ব্যঞ্জনবর্ণ থেকে আর একটার পার্থক্য তিন প্রকারের ॥

(ক) অনুনাদের পরিমাণ (খ) উচ্চারণের কেন্দ্রবিন্দু (গ) উচ্চারণ ভঙ্গী। প্রতিধ্বননশীলতার দিক থেকে স্বরবর্ণকে ভাগ করা যেতে পারে—উচ্চারিত (Voiced) যেমন V. Z. W. L. R. B, D. G. M. N এবং শব্দহীন (Voiceless) যেমন—F. S. X. P. T.K.

আমরা শুধু সাধারণ উচ্চারণ পদ্ধতির কথাই বলেছি। এর আরও অনেক দিক আছে এবং সেগুলো খুবই কারুকৌশলপূর্ণ ও

আরও বিশদ ভাবে বলার প্রয়োজন রাখে এবং উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের পাঠ্য হবার যোগ্য।

(৩) উচ্চারণ ভঙ্গী,

একজন বক্তা তার স্বর সুমিষ্টভাবে উচ্চারণ করতে পারে, ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণও পরিষ্কার করতে পারে এবং স্বরবর্ণের উচ্চারণও ঠিকভাবে করতে পারে। এগুলো ঠিকভাবে করতে বক্তার সেই ধরণের উচ্চারণভঙ্গী হতে হবে যাতে বক্তৃতার সময় সে কোনো রকম বিব্রত বোধ না করে বা আত্মসচেতনতা ছাড়াই বক্তৃতা দিতে পারে তা সে যে কোন ক্লাসে, যে কোন দলে, বা যে কোন অবস্থাতেই হোক না কেন। উচ্চারণকে সর্বজন গ্রাহ্য মানের খুব কাছাকাছিই পৌঁছোতে হবে, আর সাধারণতঃ তা সম্ভব হয় কানের প্রশিক্ষণ দ্বারা। লম্বা লম্বা টেনে টেনে কথা বলার তিনটি দোষ। সেগুলো দূর করতেই হবে।

(ক) এই লম্বা বা টেনে কণ্ঠস্বরকে বাড়ানো প্রায়ই ঘটে বাক্যের স্বরবর্ণের উপর বেশী জোর দেবার দরুণ—

(খ) অসঙ্গতভাবে বিলম্বিত হয়ে স্বরবর্ণের উপর অত্যাধিক জোর পড়ে।

(গ) বিলম্বিত এবং অধিক জোরপ্রাপ্ত স্বরবর্ণ সাধারণতঃ দুই সুরে উচ্চারিত হয়। দ্বিতীয়টি প্রথমটির চেয়ে বেশী জোরে নির্গত হয়।

এই লম্বা ও টেনে টেনে উচ্চারণের সংশোধন করতে হলে স্বরবর্ণের উচ্চারণে জোর কমাতে হবে। উচ্চারণের বিস্তারকে হ্রাস করতে হবে এবং স্বরোৎপাদনে একটি স্বাভাবিক স্থানীয় সুর ব্যবহার করতে হবে। স্বরবর্ণ উচ্চারণের সময় জিহ্বা ও ঠোঁটের চালনা এবং মুখের পেশীর টানের পার্থক্যের ফলে মুখের আকৃতি ও পৈশিক অবস্থার যেরূপ পরিবর্তন ঘটে, তা এক স্বরবর্ণের থেকে অন্য স্বরবর্ণের বেলায় আলাদা।

উচ্চারণের পদ্ধতি অতীব জটিল এবং শক্ত ব্যাপার এবং সেই

জন্যই একে আয়ত্বে আনতে সযত্ন পঠন ও অনুশীলন একাদিক্রমে দীর্ঘকাল ধরে করা দরকার।

(ঘ) বলবার ভঙ্গী বা ধরণ

ভাল ভাষণের ব্যাপারে আমাদের বলবার ধরণটাই চরম অবস্থা এবং এর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া দরকার। কথা বলার সবচেয়ে আবশ্যকীয় দিকই হল বাক্য প্রকাশ প্রণালী। সময়ের ব্যবধান (Pace) জোর (Emphasis) এবং স্বরসাধন বা স্বরকম্পন (Intonation) এই তিনে মিলে বাক্যপ্রবাহ বা ছন্দ নিয়ন্ত্রন করে। বাক্য প্রকাশ প্রণালী নিয়ন্ত্রণ করার সুবিধা হয় অর্থবোধ থেকে। ভাষণে প্রকাশ ভঙ্গী বেশ পরিষ্কার হওয়া দরকার, যাতে শ্রোতারা বক্তার কথা অতি সহজেই বুঝতে পারে। ভাষণ পরিষ্কার হবে এবং দুর্বোধ্য বা দ্বার্থবোধক হবে না। সুষ্ঠু বাক্য বিন্যাসের চাতুর্য শুধু বাক্য প্রয়োগ কৌশলের উপর নির্ভর করে না, শ্বাস-প্রশ্বাস ও কণ্ঠস্বর নিয়ন্ত্রনের উপরেও নির্ভর করে এবং এর উপরই বাক্য প্রকাশ ঠিকমত অর্থবোধক হয়।

সময়ের ব্যবধানে তারতম্য ঘটে বক্তার আবেগময় ভাবভঙ্গী এবং বক্তব্যের গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে। এটা নির্ভর করে বিষয়বস্তুর প্রকৃতি ও শ্রোতৃবর্গের বুদ্ধিমতার উপর। জোরে কথা বলার সময় কোন এক বিশেষ চিন্তাধারাকে অনুসরণ করে বলার অনিশ্চয়তা, অথবা উপযুক্ত শব্দ সঞ্চয়নের অসুবিধা, উচ্চারণের মধ্যবর্তী সময়কে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে এবং তদ্দরুণ বক্তৃতার সাবলীলতা নষ্ট হয়। ক্রমাগত পড়ার এবং জনসাধারণের সম্মুখে বলার অভ্যাস দ্বারাই এই অসুবিধা দূর করা যেতে পারে। এমফ্যাসিস্ শব্দটার সঠিক সংজ্ঞা পাওয়া শক্ত। কারণ ন্যায় নীতি বা ব্যায়াকরণের দিক দিয়ে অর্থবহ কোন শব্দের উপর জোর নিক্ষেপ করাই শুধু এর অর্থ নয়। এ তার চেয়েও বেশ কিছুটা বেশী। ফলপ্রসূভাবে জোর নিক্ষেপ করার চাতুর্য বক্তা শুধুমাত্র বলবার অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়েই

অর্জন করেন। বক্তা শ্রোতৃবর্গের চাহিদার প্রতি নিশ্চয়ই সচেতন হবেন। আত্মকেন্দ্রিক বক্তা তার বক্তৃতা আকর্ষণীয় করে তুলতে পারেন না। যে শব্দ বিশেষ অর্থবোধক বলে মনে হয় তা উচ্চারণের পূর্বে একটু বিরতি এবং তারপরেই জোর দিয়ে উচ্চারণ করতে হয়।

বাক্যাংশের প্রকাশ সময়ের ব্যবধান এবং জোর—এ সবেরই সুষ্ঠু সমন্বয়ই ত ছন্দ। আর এই হলো সফল বাচনভঙ্গীর চাবিকাঠি। বক্তার চিন্তাধারার ছন্দ ও গতি তার বক্তৃতায় সেই পরিমাণ প্রকাশ হবে যে পরিমাণে তিনি তাঁর বক্তব্য বিষয়ের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারবেন।

কথা বলার সময়, কণ্ঠ থেকে স্বর প্রক্ষেপের তারতম্য ঘটানই স্বরসাধন। এর মধ্যে আসে প্রথমত বক্তার নিজস্ব বিশেষ সুর এবং দ্বিতীয়তঃ সেই অনুযায়ী অর্থের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সুরের পরিবর্তন বা তারতম্য ঘটানো ও সুরের পরিবর্তন দ্বারা দুঃখ, বেদনা, আনন্দ, ক্রোধ, সন্তোষ, বিস্ময় নৈরাশ্য প্রভৃতি প্রকাশের ক্ষমতা।

বক্তৃতা দেওয়া বিশেষ করে নির্ভর করে উদ্দেশ্য সাধন সম্বন্ধে বক্তার নিষ্ঠা, কাপট্যহীন প্রচেষ্টা শ্রোতৃবর্গের সম্মুখীন হবার জন্য প্রস্তুতির গভীরতা, তার হাবভাব, মনের সাহস, শরীরের, শক্তি ভাবভঙ্গী ও চোখমুখের ব্যঞ্জনা এবং শিরশ্চালন কৌশলের উপর। এ সকল দিকেই লক্ষ্য রাখতে হবে, ছাদের কড়িকাঠ, ঝোলান পাখা বা মেঝের দিকে নয়।

॥ স্বরোৎপাদনের প্রশিক্ষণ (training) ॥

পরিশেষে আমি .স্বরোৎপাদনের প্রশিক্ষণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলী যত্নসহকারে অবহিত হতে বলি।

সঙ্গীতের ভাষার সঙ্গে দৃঢ় সংবদ্ধ যে বাক্য তারই সম্প্রসারণ ও মার্জিত-করণই গান। গানের এবং কথা বলার যে মৌলিক কণ্ঠস্বর সামান্য পার্থক্যসহ তারা একই বস্তু। এই পার্থক্যগুলি নিম্নরূপ—

(১) কথা বলার মধ্যে সুরের সংশ্লেষ কম বলে, কথাবলার স্বরে কম্পন বা দোলনের আবশ্যক নেই।

(২) স্বভাবতঃ গানে যে স্বরগ্রাম পর্যন্ত স্বর নিক্ষেপ করতে হয় কথা বলায় তার প্রয়োজন হয় না।

(৩) গানে স্বরবর্ণের ও ব্যঞ্জন বর্ণের উপর যে জোর দিতে হয়, কথা বলায় তা অনেক কম দরকার হয়।

(৪) গানে একই স্বরবর্ণে কয়েকটি সুর ধ্বনিত হয়। কথা বলায় তা কখনও হয় না। ঠিকভাবে কথা বলার কণ্ঠস্বরের জন্য যা প্রয়োজন হয় তা নিম্নে বর্ণিত হলো—

কণ্ঠস্বরের স্বাভাবিক গুণ, সীমা, বহন ক্ষমতা, তীব্রতা, নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রগাঢ়ত্বের সামঞ্জস্যকরণ, বোধগম্যতা, উপযুক্ত বেগসহ ভাষণের পরিচ্ছন্নতা, দীর্ঘসময়ব্যাপী বৃহৎ শ্রোতৃবর্গের সম্মুখে জোরের সহিত সহজগ্রাহ্য করে বক্তৃতাদানের ক্ষমতা, কোন আবেগময় বা অভিব্যঞ্জনাসহ বক্তৃতায় কণ্ঠস্বরের স্বাভাবিকতা সংরক্ষণ, চোখমুখের ভাবভঙ্গী দ্বারা সাধারণ আবেগের প্রকাশ ইত্যাদি।

স্ত্রীলোকেরা এক প্রকার জিলস্বুরে (Falsetto) অথবা মিশ্রস্বরে

কথা বলে। বাক্যে এর প্রতিফলন অতীব দোষাবহ। এই Falsetto এক অপ্রীতিকর স্বরোৎপাদন করে। এর তীব্রতা ও বহন ক্ষমতা অতীব নিম্নমানের। আর এ দোষ বিশেষ করে প্রযোজ্য অভিনেত্রীদের বেলায়।

অল্প বয়সে অভিনেত্রীরা উচ্চ স্বরগ্রামে কিন্তু স্বল্পতীব্রতাসম্পন্ন (জিলস্বর Falsetto) ব্যবহার করে কণ্ঠস্বরকে একই পর্দায় রাখতে। কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তারা যতই বেশী নাটকের চরিত্রে অভিনয় করতে থাকে ততই তার স্বর পুনরায় নেমে যায়। ক্রমে ক্রমে এবং শেষে তাদের অভিনেত্রী জীবনের অবসান ঘটায়। সমন্বয়বিহীন নিম্ন রেজিষ্টারে স্বরপ্রক্ষেপণে স্ত্রীলোকের স্বরে একটা কর্কশভাব আসে। এগুলো কোন কঠিন বা নির্দয় চরিত্র চিত্রায়নে প্রয়োজন হয়। কিন্তু অন্য যে কোন চরিত্র চিত্রায়নে একেবারে অনুপযোগী।

পুরুষেরা সাধারণতঃ মিশ্র নিম্ন রেজিষ্টার ব্যবহার করে। খুব বেশী স্ত্রী-চরিত্র সুলভ পুরুষেরা মিশ্র জিল স্বর (Falsetto) ব্যবহার করে। তাতে কণ্ঠস্বর হয় ঘড়ঘড়ে, অনুনাসিক এবং অতীব উচ্চগ্রামের। এতে স্বরযন্ত্রের উপর ভীষণ চাপ পড়ে।

কথা বলায় বা বক্তৃতায় খুব নিচু পর্দায় স্বর ব্যবহার খুবই ফলপ্রসূ হয়। প্রেক্ষাগৃহে এই রকম স্বর বেশ ভালভাবেই কার্যকরী হয়। লোকের উপর প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা এর বিস্ময়কর। গভীর আবেগ কণ্ঠস্বরের নিম্ন পর্দাতেই খুব ভালভাবেই ফুটিয়ে তোলা যায়। এমন কি উচ্চ পর্দায় কণ্ঠস্বর ব্যবহারপূর্বক দ্রুততালে কথা বলে ভালবাসা বা নৈরাশ্য ইত্যাদি গভীর আবেগ প্রকাশের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিকতাই ফুটে ওঠে, কথা বলার মাধুর্য্য ফোটে না। অবশ্য সাধারণতঃ আবেগ যত বৃদ্ধি পায় স্বরের পর্দা ততই চড়তে থাকে। বিশেষ করে চরম উত্তেজনার মুহূর্তে তা চরমে ওঠে। আর স্বরগ্রামের উচ্চতার সঙ্গে শব্দের তীব্রতাও বাড়তে বাধ্য। গান এবং কথা বলার

স্বরগ্রাম এক হয় না। এই একীকরণ একেবারেই বর্জন করতে হবে। যার ফলে এরকম ঘটে তা হলো (ক) একই স্বরবর্ণের পর্দায় পরিবর্তন (খ) L. M ও N এর বিলম্বিত উচ্চারণ (গ) অপেক্ষাকৃত গুরুত্বহীণ শব্দের উপর বেশী জোর দেওয়া·এবং (ঘ) প্রত্যেক শব্দ এবং শব্দাংশের উপর অহেতুক জোর নিক্ষেপ।

এই সম্পর্কে এটুকু বলা দরকার যে বেতার-ঘোষক—যে প্রত্যেক শব্দাংশ সমভাবে ও .একইভাবে উচ্চারণ পূর্বক ঘোষণা করে—পুরাকালের অভিনেতা "হ্যামের" (Ham) সঙ্গে তার সাদৃশ্য রয়েছে। এই রকমের আসক্তি বাক্য প্রকাশ রীতির দিক দিয়েও অমার্জনীয়। বক্তার লক্ষ্য এই হওয়া উচিত যে তিনি যা বলছেন তা সহজ শ্রবণ যোগ্য ও সহজবোধ্য হবে। ইচ্ছাপূর্বক প্রত্যেক বাক্যাংশের উপর জোর দিয়ে যে কথা বলে সে নিজেই তার উদ্দেশ্যকেই পুরাপুরি ব্যর্থ করে। কণ্ঠস্বরীয় সাধারণ শব্দ উচ্চারণ এবং সঙ্গীত বিষয়ক শব্দোচ্চারণ বৈপরীত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। যেখানে এই বৈপরীত্য নেই সেখানে ইহা সুপ্রকাশিতই নয় বা একেবারেই অর্থহীন। সত্যিকারের শিক্ষার সব চেয়ে বড় উদ্দেশ্যই হলো স্বাভাবিকতা; উপযুক্তভাবে বাক্য প্রকাশের ভুল বোঝার ফলই অস্বাভাবিকতা, কৃত্রিমতা, ও অশিল্পীসুলভ বাক্যাবিন্যাস। মঞ্চপ্রেমিকদের মধ্যে একটা মজার বিশ্বাস প্রচলিত আছে এই মর্মে যে উচ্চপর্দার কণ্ঠস্বর যৌবনের পরিচায়ক। কিন্তু এ আদৌ তা নয়। ঘড়ঘড়ে উচ্চগ্রামের কণ্ঠস্বর জীর্ণ ও ক্লান্ত। এমন কি তখনও, যখন এই কণ্ঠস্বরের কর্তা একজন যুবক। কোন লোককে তার কণ্ঠস্বর শুনে তাকে বৃদ্ধ বা যুবক বলি তার কারণ অধিকাংশ লোকই তাদের কণ্ঠস্বর ব্যবহার ঠিকভাবে করে না এবং কণ্ঠস্বরের অপব্যবহার নিয়মিত এবং পর্যায়-ক্রমেই করে চলে এবং প্রতি বৎসরই তার গুণের ক্ষয় ও ক্ষতিসাধন করে। মঞ্চ পরিচালকদের মধ্যে আরও একটি ভুল ধারণা আছে। যখন কণ্ঠস্বর বেশ গভীর বা নিবিড় তখনই তারা মনে করেন যে

অভিনেতা বা অভিনেত্রী নিম্নপর্দায় স্বর ব্যবহার করে কথা বলছে। যখন এই কণ্ঠস্বর কর্কশ হয়, তাঁরা বলেন কণ্ঠস্বর অতি উঁচু পর্দায় আছে। এও সত্য নয়। কোন হাস্যোদ্দীপক ফলোৎপাদন বা যন্ত্রণায় কর্ণ-পটহ বিদারক চিৎকার ছাড়া, কোন লোকেরই কথা বলায় গানে যে রকম জিল স্বর ব্যবহৃত হয় তার চেয়ে বেশী জিল স্বর (Falsetto) ব্যবহার করা উচিত নয়। স্ত্রীলোকের কথা বলার প্রশিক্ষণে সমস্যাই হলো প্রথমেই তাকে স্বরোৎপাদনের জন্য নিম্ন রেজিষ্টারের পর্দা পৃথক করে ব্যবহার করতে শিখতে হবে। এই নিম্ন রেজিষ্টারের স্বর সমূহ ব্যবহার দ্বারাই তাকে কথা বলার কাজ করতে হবে। এইভাবে সাধারণ স্বরসাধনের পথে তাকে দীর্ঘ দিন ধরে অগ্রসর হতে হবে এবং গানের স্বরসাধনের যে বিশেষ কারু-কৌশল তা আয়ত্বে আনার প্রশিক্ষণ নিতে হবে।

সাধারণতঃ আবেগের সঙ্গে তাল রেখে কণ্ঠস্বরও উচ্চপর্যায়ে চড়ে। কথা বলা যখন শান্তভাবের তখন স্বরক্ষেপন গণ্ডীর খুব নিচু পর্দায় স্বর যোজনা হয়। যখন বাক্য বিকাশের মধ্যে নাটকীয়তা ও উত্তেজনা থাকে তখন স্বরযোজনা উচ্চগ্রামে থাকে। গানে যেমন একটা শব্দই তার একক (Unit)। কথনে বা বক্তৃতায় তা নয়। বক্তৃতায় একটা বাক্যই একক (Unit)। একজন অভিনেতা একটা বাক্যকেই একক বলে কল্পনা করবেন। আবেগের উত্থান পতনের সঙ্গে একটা সুনির্দিষ্ট স্বরযোজনার গণ্ডীর মধ্যে কণ্ঠস্বরের পর্দাও তেমনি ওঠানামা করবে। ধরণটা কার্যতঃ একই থাকে। এইভাবে যদি কোন বাক্যে কারুকে ঘুমের নির্দেশ দেওয়া হয় অর্থাৎ ঘুমুতে যেতে বলা হয়, সমস্ত বাক্যটাই হবে তেজোহীন শান্তভাবের ঘুম শব্দটা আলাদা করে নিয়ে তাতে একটা বিশেষ ধরণের রং চড়ানো চলবে না।

আশা করি এই আলোচনার স্বল্প সময়ের মধ্যে আমি পাঠকদের কাছে স্বরোৎপাদন সংক্রান্ত যা কিছু জানবার বিষয় তা উপস্থাপিত করতে পেরেছি। যদি পাঠকদের মধ্যে একজনও এর থেকে উপকৃত হয়, তাহলে আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

॥ চলচ্চিত্র এবং চলচ্চিত্র শিল্পী ॥

এই বিষয়টি যা ডেভিড আব্রাহাম উপস্থাপিত করেছেন, তার উপর আলোচনার আরম্ভের দায়িত্ব আমার উপর পড়েছে। আমাদের আলোচ্য বিষয়ের নাম—"চলচ্চিত্র শিল্পী চলচ্চিত্র ব্যবসায়ের একটা অতি মূল্যবান দিক।" আমরা 'একটা অতি মূল্যবান দিক' বাক্যাংশের তাৎপর্য ভুলব না। এই সম্পর্কে আমি এখনই, দীর্ঘদিন রঙ্গমঞ্চ এবং চলচ্চিত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একজন অভিনেতা হিসাবে আমার যা অভিজ্ঞতা এবং আমি যা অনুভব করেছি, তা পাঠকদের বলব। একজন চলচ্চিত্র শিল্পী অথবা অভিনেতারা যারা চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন, তাঁরা সুদূর অতীতের পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য বহনকারী প্রচলিত নাট্য প্রথা প্রকরণের দাস নয়, তারা স্বাভাবিকভাবে উদ্ভূত এবং শতশত বৎসর পূর্বে মানব সভ্যতার প্রারম্ভে যে অজানিত বিরাট অভিনেতৃবর্গ সমৃদ্ধির উচ্চ শিখরে আরোহন করেছিলেন, তাঁদেরই আধুনিক ও নব রূপায়ন। তাঁরা নামগোত্রহীন সেই যোদ্ধাদলেরই অন্তর্ভূক্ত যাঁরা নীলনদের তীরে তাঁদের আদিম শিল্পঐতিহ্যের জন্য যুদ্ধ করেছিলেন। মিশরীয় তথ্যাভিজ্ঞ বিখ্যাত অধ্যাপক মেস্‌পেরোর সাম্প্রতিক হিসাব ও আবিষ্কার অনুযায়ী তাঁরা তাঁদের ভক্তিমার্গের শিল্পকলা নীল উপত্যকার মন্দিরে খ্রীষ্টজন্মের ৩০০০ বৎসর পূর্বে দেখিয়েছিলেন। খ্রীঃ পূঃ ১২০০ সালে ইহা মিশর থেকে সিরিয়ায় গিয়েছিল, সেখান থেকে গিয়েছিল গ্রীসে এবং এখানেই গঠিত এবং পুনর্গঠিত হয়ে ইহা গ্রীসীয় ঐতিহ্য এবং রূপ নিয়েছিল এবং খ্রীষ্ট জন্মের পাঁচশত বৎসর পূর্বে এথেন্সের এ্যাম্পী-থিয়েটারে প্রদর্শিত হয়েছিল।

এই জয়যাত্রায় ওই আদিম থিয়েটার তার সমস্ত পৌত্তলিক জাঁকজমক সহ ল্যাটিন রোমে গিয়েছিল। এবং সেখান থেকে কয়েক শতাব্দী পরে সমস্ত ইয়োরোপীয় দেশগুলি পরিভ্রমণ করেছিল। এই রেণেশাঁসের সময় সেখানে পুরাতন ঐতিহ্য শিক্ষাধারার শিল্প প্রণালীর পুনরভ্যুদয় ঘটেছিল।

রাণী এলিজাবেথের রাজত্বকালে এই নাট্য প্রথা ও ঐতিহ্য ইংল্যাণ্ডে প্রবেশ করেছিল এবং শেক্স্‌পিয়ারের হাতে এর উৎকর্ষের চরম সীমায় পৌঁছেছিল, এবং পরিশেষে সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসী দেশীয় 'টেনিসকোর্ট' রঙ্গমঞ্চে রূপান্তরিত হয়েছিল এবং তারপরেই ইবসেনের 'পিকচার ফ্রেম' থিয়েটারের রূপ নিয়েছিল যা আধুনিক কালেও চলছে।

আমাদের জীবনকালের এই শতাব্দী যান্ত্রিক এবং বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের যুগ এবং দ্রুত সংযোগস্থাপনেরও যুগ। সিনেমাই তার একটি গৌরবময় ফলশ্রুতি। এই সময় সাধারণভাবে একই যুগ সর্বস্তরে সর্বদিকে সর্বক্ষেত্রে দ্রুততম গতিতে সংযোগ স্থাপনে সক্ষম। গণতন্ত্রের যুগে জনমত সৃষ্টির ব্যাপারে সিনেমা খুবই শক্তিশালী যন্ত্র। এই জীবন নাট্যে চলচ্চিত্র শিল্পীরা সর্বাধিক প্রয়োজনীয় ভূমিকা গ্রহণ করে এবং তাদেরই সব চেয়ে মূল্যবান অবদান জোগাবার দায়িত্ব পালন করতে হবে, যেমন তাদের পূর্বপুরুষেরা করতেন কয়েক হাজার বৎসর পূর্বে।

ডেভিড আব্রাহাম বলেন যে সিনেমাশিল্পীরা বিরাট নাট্য ঐতিহ্যের সন্তান। অবশ্য তাঁরা তাইই। তাঁরা তাঁদের আদিম পূর্ব-পুরুষদের কাছ থেকেই এই সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার লাভ করেছেন। এবং যুগের অগ্রগতির সঙ্গে এর ক্রমোন্নতির বিষয়ে তাদেরকে আরও অবহিত হতে হবে। আমি বলতে চাই, যে তারা সেই একই দলের অভিনেতা, যারা হাজার হাজার বৎসর পূর্বে অভিনয় শিল্পের আলোক বর্ত্তিক প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন এবং সমুজ্জ্বল

রেখেছিলেন তার দীপ্ত শিখা। অধুনা তাদেরই প্রথা পদ্ধতি এবং চালচলন, দেশ কাল ভেদে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। তাদের বহিরাকৃতি এবং দেহ পরিবর্তিত হয়ে আরও পরিণত এবং মার্জিত রূপে প্রতিভাত হয়েছে। শুধু দর্শনধারী হবার জন্য নয় আরও মর্য্যাদাসম্পন্ন হবার জন্য। নাটক মঞ্চ এবং অভিনয় শুদ্ধ আদিম সেই মূল ধাঁচেই ক্রমবিকাশ লাভ করেছে এবং করছে। মৌলিক দিক দিয়ে সেই একই মূলনীতিতে এরা এগিয়ে চলেছে। তার থেকে পৃথক করে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিভাত করা সম্ভব নয়। কাজেই পূর্ব-পুরুষ এবং উত্তর পুরুষের মধ্যে খুব একটা ভেদাভেদ দেখা যায় না। সেই গুহাবাসীর শিকারী নৃত্যের জীবনকাল থেকে মিশরীয় সভ্যতার যুগ এবং তার থেকে আজকের রৌপ্য পর্দার (silver screen) দিন পর্য্যন্ত মৌলিক নীতি একই রয়ে গেছে।

এটা সত্য যে নাট্যশিল্পীর মাধ্যমেই চলচ্চিত্রের গল্পের পাতা খোলা হয় কাবণ সেই হলো গ্রন্থকারের মুখপাত্র এবং তার ধ্যান ধারণার ব্যাখ্যাকার। এইপ্রকারে সে সমগ্র চলচ্চিত্র দেহে এমনই এক অবস্থার সৃষ্টি করে যে প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তার চারপাশেই পরিভ্রমণ করতে থাকে। এই মত পুরোপুরি সমর্থন করে, আমি এই প্রশ্ন রাখতে প্রলুব্ধ হচ্ছি—কেন তারা তা করে ? কেন তারা সকলেই —সমগ্র চলচ্চিত্র জগত তারই পাশে এসে জটলা করে ? এ কি শুধু কর্তব্যের খাতিরে তারা তা করে, না যে কাজ তারা হাতে নিয়েছে তার খাতিরে ? না। এ রকম কিছু কারণ থাকতে পারে, কিন্তু এটা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাদের নিজেদের স্বার্থেই তারা তা করে। এই প্রকারে তারা তাকেই সাহায্য করে আরও সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় বস্তুকে সজ্জিত করতে এবং চলচ্চিত্রকার বা গ্রন্থকার কর্তৃক কল্পিত চরিত্র চিত্রণে কারুশিল্পীদের প্রদর্শিত ভাবধারা ইত্যাদি রূপায়ণে এবং সর্বশেষে সেইগুলিকে শ্রোতৃবর্গের সম্মুখে উপস্থাপনে। এইভাবে একটি চলচ্চিত্রশিল্পী এই শিল্পের উদ্যোক্তা এবং শ্রোতৃবর্গের মধ্যে এক

সেতুবন্ধের মত কাজ করে। অতএব শিল্পীদের সহকর্মীরা যে তাদেরই চতুষ্পার্শ্বে শুধু ঘোরাঘুরি করেই তাদের কর্তব্য সমাধা করেন তা নয় তারা সকলে এবং চলচ্চিত্রশিল্পী নিজে ঐ গল্পের বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করেই ঘোরেন অর্থাৎ তাদের ঘোরাঘুরি অনাবশ্যক নয়। রঙ্গালয়ের অগ্রগতির আরম্ভ থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত যুগ ধরে আগা গোড়াই রঙ্গমঞ্চ থেকে প্রেক্ষাগৃহ পর্য্যন্ত এই রকমই করা হয়েছে এবং এখনও করা হচ্ছে পর্দা থেকে সমগ্র বিশ্বপ্রেক্ষাগৃহে। চলচ্চিত্রশিল্পী তার প্রতি অনুরাগী শতশত সাধারণ লোক কর্তৃক পূজিত, সম্মানিত এবং সমাদৃত হয়। কারণ সে তাদের মনোভাব, আবেগ, বেদনা, আনন্দ ইত্যাদি প্রতিফলিত করে তার অভিনয়ে এবং অভিভূত করে তাদের মন সহানুভূতি বা বিতৃষ্ণায় পূর্ণ করে। তাদের কাঁদায়, হাসায় এবং তাদেরকে তার ইচ্ছানুযায়ী মানবিক কারুণ্যরসের স্রোতে ভাসিয়ে দেয়, কারণ তারা সিনেমার নায়কের সঙ্গে একাত্মবোধে তাদের দুঃখ বেদনায় অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে। ফিল্মের ফুট্নোটে মিঃ সিডনী বার্ণষ্টিন্ (Mr. Sidney Bernstin) বলেছেন -"তার সিনেমায় আসাটা ফিলম্ অভিনেতার সঙ্গে একাত্মবোধ থেকেই ঘটেছে। তার জন্য নায়ক (hero) তার দিবাস্বপ্নের উত্তর স্বরূপ এবং ছায়াছবির জগত, যখন তিনি সেখানে আসেন, তখনকার মত তার চারিপাশের সমস্ত বাস্তবতাকে তার সম্মুখ থেকে মুছে দেয়। ফিলম্ই তাকে উৎসাহহীন ও এক ঘেয়েমিতে ভরা দিনের ক্লান্তি থেকে মুক্তি দিয়ে বাঁচায়। সিনেমা শিল্পীরা, অতএব, স্বভাবতঃই তাদের বদ্ধ জীবনের আদর্শ ব্যক্তি এমন কি দেবতায় রূপান্তরিত। এবং তারা স্বভাবতঃই তাদের গভীরভাবে অনুসরণ করে চলতে চেষ্টা করে। এইরূপে সে তার অনুগামীদের মধ্যে নতুন ভাবধারা ও ফ্যাশান আমদানী করে। পূর্বের দিনে অবশ্য রঙ্গমঞ্চ শিল্পীরাই এ কাজটা করত। কিন্তু কিছুটা অপটুভাবেই করত। শিল্পী তার মুখোস এবং কিম্ভূতকিমাকার বুটজুতো পরে খেলা দেখানো

ছেড়ে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পূর্ণ শিল্পীর রূপ নেওয়া পর্য্যন্ত আগাগোড়াই তাদের দর্শক সাধারণের কাছে আদর্শরূপেই প্রতিভাত হয়ে এসেছে। রোম সাম্রাজ্যের যুগে প্রাচীন রোমের অভিজাত সম্প্রদায়ের যুবকদের মধ্যে, শিল্পী তার শিল্প প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে এই ফ্যাশানই ছড়িয়ে এসেছে। আজকের দিনে এখনও সে তাইই করছে তার বিশ্বজোড়া ভক্তদের মধ্যে। এই বিরাট সিনেমা শিল্প, যা কারুশিল্পী, যন্ত্রচালক, যন্ত্রবিদ্ প্রভৃতিতে পূর্ণ হয়ে কাজ করছে, তার মধ্যে শ্রোতৃবৃন্দ যার উপস্থিতি প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করেন ও তারিফ করেন, সে হলো এই একমাত্র মানব মূর্তি, এই চলচ্চিত্রাভিনেতা।

এক শ্রেণীর সমালোচকের মতে শিল্পীকে বাদ দিয়েই চলচ্চিত্র নির্মাণ করা যেতে পারে যেমন ব্যঙ্গচিত্র এবং পুতুল ছবি ইত্যাদি। ছায়াচিত্রের এইরকম সমস্ত উপস্থাপনা মনের এক ঘেয়েমী কাটিয়ে মনটাকে অন্যদিকে নিয়ে যায় এবং এগুলো তৈরী হয় সামাজিক ব্যঙ্গ-চিত্র ফুটিয়ে তুলতে, পরীর গল্প রূপায়িত কবতে এবং কখনও কখনও শিশুদের আমোদ দেবার চলচ্চিত্র হিসাবে। যাই হোক মনে রাখতে হবে, যে এমন কি কয়েক প্রকারের শিশু চলচ্চিত্র, যেখানে মানবিক আবেগ, স্নেহ ভালবাসা, বেদনা ইত্যাদি ফুটিয়ে তোলার কাজটাই বড়, সেখানে মনুষ্য শিল্পী ছাড়া কিছুই করতে পারা যায় না।

ডকুমেণ্টারী ফিল্ম্ যারা তৈরী করে তাদের এবং ফ্রান্সের 'Avant Garde' ফিল্ম্ নির্মাতাদের মধ্যে অভিনেতাদের সম্পূর্ণ-ভাবে বাদ দিয়ে তাদের স্থলে প্লাসটিক বেবী শিল্পী দিয়েই পরি-চালকদের দ্বারা কাজ করিয়ে নেবার একটা চেষ্টা চলছিল। কিন্তু এখন সেই Avant Garde বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং ডকুমেণ্টারী-ওয়ালারাও তাদের চেহারা পাল্টে ফেলেছে। যারাই ফিলম্ শিল্পের সঙ্গে পরিচিত তাঁরা ভাল করেই জানেন পুডাভ্কিনের (Pudavkin) বিখ্যাত গল্প, যিনি তাঁর হেয়ার টু চেংগীজ খাঁ (Jenghiz khan) নামক ছবিতে মধ্য এশিয়ার প্রান্তরের

কয়েকজন মঙ্গোলিয়ানের প্লাস্টিক মূর্তি নির্মাণ করে চলচ্চিত্রে পুরোপুরিভাবে সেই প্লাসটিক্ মানব মূর্তিগুলিকে ব্যবহার করেছিলেন, এবং তাদের দিয়ে শিক্ষিত মানুষ শিল্পীদের সেই সেই স্থানে বাদ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এই কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে চলচ্চিত্র জগতের অপেক্ষাকৃত আধুনিকপন্থী সমালোচক মিঃ রোজার ম্যানভেল (Roger Manvell) মত প্রকাশ করলেন—"রাশিয়া শীঘ্রই কতকগুলি শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পী যারা তাদের কাজ জানে, ব্যবহার করতে শিখল। কারণ তারা দেখল যে যখনই এমন ভূমিকায় অভিনয়ের প্রয়োজন হয় যেখানে প্রতিনিয়ত যত্নসহকারে ক্রমাগত আবেগের অভিব্যক্তিসহ অভিনয় করতে হয়, সেখানে প্লাস্টিকের তৈরী পুতুল দিয়ে অভিনয় করানোর কল্পনা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়।"

একই মুখ একই রকম ভাবে নানা অবস্থায় নানা জায়গায় কোন রকম ভাবব্যঞ্জনা ছাড়াই দেখান হয় তাকেই সিনেমায় দুঃখ, বেদনা ক্ষুধা মাতৃস্নেহ ভ্রাতৃপ্রেম ইত্যাদির রূপ নিয়েছে বলে তারিফ করা হয়, তাহলে বলার কিছুই থাকে না। কারণ এই সকল ক্ষেত্রে আবেগ ছাড়া সফলতা আসেই না। কিন্তু আবেগের ক্ষেত্রে এরা অচল, কারণ মুখের ভাব প্রকাশের ভিতর দিয়েই সবই ফোটাতে হবে, এমন কি অর্থ পর্যন্ত।

এটা না বললেও চলে যে ডকুমেণ্টারী ফিলমে যে সব লোকের জীবনী রূপায়িত হচ্ছে, তারা শুধু ফিল্ম্ নির্মাতাদের কাছেই নয় অভিনয়শিল্পেরও একেবারেই নতুন, তারা হৃদয়াবেগ বা অভিনয়ে কোন গুরুগম্ভীর নাটকীয়তা ফুটিয়ে তুলতে জানেই না। তাদের পক্ষে একই মনোভাব এবং হৃদয়াবেগ দ্বিতীয়বার ফুটিয়ে তোলা ভয়ানক শক্ত। আসাম চা বাগানে "গ্রীনপার্ক প্রডাকশানের" জন্য রামদাস এবং মুংরী' নামে ডকুমেণ্টারী ফিলমের পরিচালক মিঃ র‍্যালফ কীন্ (Ralph Keene) এই অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। মিঃ কীন্ লিখেছেন—"তারা কোনরকম হৃদয়াবেগ

ফুটিয়ে তুলতে জানেই না। আমরা যদি চাইতাম রামদাস আতঙ্কের ভাব ফুটিয়ে তুলুক তা হলে রামদাসকে আমাদের আতঙ্কিত করে তুলতে হতো! যদি চাইতাম রামদাস মাতালের ভাব করুক, রামদাসকে মদ খাইয়ে মাতাল করতে হতো।" মিঃ কীন্ আরও লিখেছেন—"রামদাস একটি উজ্জ্বল রত্ন। সর্বদাই তাকে যা করতে বলা হতো, খুব তাড়াতাড়ি তা বুঝত এবং করত। আমি মনে করি না যে মুংরী কখনও বেঢপ বা বেখাপ্পা কিছু করে বসেছে। কিন্তু তারা কখনও কোন নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টি করতে বা গুরু গম্ভীর অভিনয় করতে পারত না এবং আমাদেরকে গল্পটা অতীব সহজ ও সরল করে বলে দিতে হতো।" কাজেই আজকেব দিনে একজন অভিনেতাকে অপরিহার্য রকমে প্রয়োজন হয় সাধারণ ফিচারস্, শিশুদের চলচ্চিত্র এমনকি ডকুমেণ্টারী ছবি নির্মাণেব জন্য। কারণ এই সব ক্ষেত্রে মানুষের ব্যবহার, কার্য্যকলাপ তাদের বাড়ীঘর কারখানা খেত খামার, মাঠ ইত্যাদিকে একেবাবে নিখুঁত এবং প্রামাণ্যভাবে ছবির মাধ্যমে চিত্রিত করতে হয়। আজ শিল্পীর ভূমিকা শুধু একজন আমোদদাতা বা আপ্যায়নকারীর নয়, একজন শিক্ষকেরও।

কাজেই, প্রথম দর্শনেই অভিনেতাই আমাদের সম্মুখে ফুটে ওঠে এবং এক মায়াময় স্নেহেব সৃষ্টি করে। তাতে এই বিশ্বাস জন্মে যে সে চলচ্চিত্র শিল্পে এক অত্যাবশ্যকীয় অংশ। কিন্তু দ্বিতীয়বার চিন্তা করলেই আমরা দেখতে পাই যে সে তত বিরাট একটা কিছু নয়, যতটা আমরা তাকে মনে করি। কিন্তু সাহায্যকারীবাই তাকে সে সত্যসত্যই যা, তার চেয়ে বড় এবং বিরাট করে তোলে।

তারা তাকে দেবে কণ্ঠস্বর, আর দেবে বিবিধ ভাবভঙ্গী চলা বলা গমনাগমন ইত্যাদির সঙ্গে তাল রেখে এক বিবিধ তানের ঐক্য ও সমন্বিত সাহায্য, আলো, আবাস এবং পোষাক—এই সকল একত্রে মিলে তাকে বিরাট বড় করে আমাদের চোখের সম্মুখে হাজির করে।

তাদের সাহায্য ছাড়া সে একজন অসজ্জিত, অমার্জিত, মূক এবং অন্ধকারে শুধু মাত্র শূন্যমঞ্চে দণ্ডায়মান, এই মুক্ত বিরাট বিশ্বের সে একজন অতি সাধারণ মানুষের চেয়ে বেশী কিছু নয়। ব্রিষ্টল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজি বিষয়ের অধ্যাপক মিঃ টমাস টেগ (Thomos Taig) "এ্যানাটমী অফ ফিল্‌ম" এ লিখেছেন, চলচ্চিত্র শিল্পে ছবি উৎপাদনের সাফল্য সমগ্র সিনেমা কোম্পানীর সকল শিল্পী, দলের কারুশিল্পী ও অন্যান্য কর্মীদের যুক্ত প্রচেষ্টার উপর নির্ভরশীল" কাজেই, যদি আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে সিনেমাশিল্পীরা, সিনেমা শিল্পের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় এবং মূল্যবান অংশ না হলেও, নিঃসন্দেহে একটা অপরিহার্য অংশগ্রহণকারী, তাহলে সে কিছু হঠকারিতার কাজ হবে না। কারণ সিনেমাশিল্প একটা সমবায়ভিত্তিক শিল্প। এর নির্মাতাদের প্রত্যেকেরই সমভাবে প্রয়োজন হয়। পরিচালক থেকে আরম্ভ করে সাজ-সজ্জাকারী পর্যন্ত সকলেই শিল্পীকে সাহায্য করে তাদের নিজ নিজ শক্তি সামর্থ অনুযায়ী তাদের ভাষা বিরাট বিশ্বে প্রচারের জন্য।

দেশের সামাজিক জীবনে চলচ্চিত্র শিল্পীদের অবদান সম্বন্ধে মত পার্থক্য আছে। নিঃসন্দেহে, দেশের সামাজিক দিক থেকে তাদের অবদান কতখানি তা পরিমাপ করা খুবই শক্ত কাজ। কারণ এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোন নির্ভুল পরিসংখ্যান বা সমাজতাত্বিক গবেষণালব্ধ কোন তথ্য নেই। এটা খুবই আশা করা যায় যে নিকট ভবিষ্যতে যদি এক দল পরিসংখ্যানবিদ্‌ এই দায়িত্বভার গ্রহণ করেন, তাহলে এই অসুবিধা দূর হতে দেরী হবে না। ইত্যবসরে এইটুকু লক্ষ্য করেই আনন্দ হয় যে ভারতীয় চলচ্চিত্র অতীতের এবং বর্তমানের ভারতীয় জীবনের নানা দিক নিয়ে পরিষ্কার রং ফলিয়ে ফিল্‌ম্‌ নির্মিত হয়ে জনসাধারণের সম্মুখে এক নব দিগন্তের দ্বারোন্মোচন করে দিচ্ছে আর তাতে যে অনুপ্রেরণা যোগান হচ্ছে, তা অগ্রাহ্য করার নয়। এর ফলে, তাদের সম্মুখ থেকে অজ্ঞতার

রাস্তা ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে। যত সময় যাবে এর সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হবে এবং কেউই এড়িয়ে চলতে পারবে না।

উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার অভাব ও অগোছালো কার্য্য ব্যবস্থার মধ্যে, অতীতে এ সম্বন্ধে আমরা কি করেছি তার সাথে তুলনামূলক ভাবে অভিনেতারা সাধারণ সামাজিক উন্নয়নে কতটা অবদান জুগিয়েছে, যদি আমরা অতি সাধারণ পশ্চাৎপটে তার একটা মূল্য নির্দ্ধারণের চেষ্টা করি, তাহলে নিশ্চয়ই তা সন্তোষজনক বলেই মনে হবে। যদি আমি আজকের অভিনেতাদের সামাজিক মর্য্যাদা এবং অবস্থার সঙ্গে অতীতের অভিনেতাদের সামাজিক মর্য্যাদা এবং অবস্থার তুলনা করি, তাহলে সেটা কিছু অপ্রাসঙ্গিক হবে না। প্রত্যেক দেশেই একটা সময় ছিল, যখন অভিনেতাদের ভাগ্যে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার ও অপমানই জুটত। রোম সাম্রাজ্যের যুগে তারা নাগরিকত্বের অধিকারই পেত না। তারা অপযশের ভাগী হতো। এবং সমাজচ্যুতও হতো। কিন্তু সেই একই রোমে সাধারণতন্ত্রের যুগে সুবিখ্যাত অভিনেতা রোসিয়াসের (Roscius) অভ্যুত্থান হলো, যিনি সম্মানীয় নাগরিক সিসারোর (Cicero) বন্ধু ছিলেন। তারপর মধ্যযুগীয় ইয়োরোপে, আমরা দেখতে পাই যে অভিনেতাদের সঙ্গে চোর ভবঘুরে এবং নিপীড়িত লোকের মত ব্যবহার করা হতো। তারপর ফ্রান্সে দক্ষ অভিনেতা টাল্‌মার (Talma) আবির্ভাব ঘটল। তিনি নেপোলিয়ানের নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গী ছিলেন এবং নেপোলিয়ান তাকে আদর্শ শিল্পী বলে মনে করতেন। এমন কি ইংলণ্ডে রাণী এলিজাবেথের সময়ে একদল অভিনেতার সঙ্গে কর্তৃপক্ষ ক্রমবর্দ্ধমান অশ্রদ্ধার সঙ্গে ব্যবহার করতে থাকেন এবং পরিশেষে তাদের ১৫৭২ সালের 'মাহুতশূন্য লোক' অতএব "দুর্বৃত্ত এবং ভবঘুরে" এই বিখ্যাত খেতাব দেওয়া হলো। এই অবাঞ্ছিত লোকদের জন্য যে শাস্তির ব্যবস্থা ঘোষিত হয়েছিল তার থেকে বাঁচবার জন্য এই হতভাগ্য অভিনেতৃবৃন্দ এক অতি মহৎ

ব্যক্তির পরিবারে নামেমাত্র সভ্য হয়ে তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করেছিল।

তখন থেকে কয়েক শতাব্দী পরে খাস ইংলণ্ডে আমরা একজন বিখ্যাত অভিনেতা স্যার হেনরী আর্ভিংকে (Sir Henry Irving) দেখি, মহারাণী ভিক্টোরিয়া কর্তৃক সম্মানিত হতে। জনসাধারণের স্নেহধন্য সেই অভিনেতা তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মিঃ গ্লাডষ্টোন কর্তৃকও সমাদৃত হয়েছিলেন। আমাদের এই বর্তমান সময়ে আমরা দেখি একজন সুবিখ্যাত অভিনেতা চার্লস্ চ্যাপলিনকে (যার লোক প্রিয় নাম চার্লি-চ্যাপলিন)। তিনি শুধু একজন অতি উচ্চস্তরের হাস্য-রসিক বলেই অভিনন্দিত নন, তিনি সত্যিকারের জনপ্রতিনিধিত্ব মূলক অভিনেতা বলেও পূজিত। চিরকাল পৃথিবীর জনমানসের দিক দিয়ে যে রত্ন ভাণ্ডার তিনি গড়েছেন, তাতে অকৃত্রিম অবদানের জন্য তাঁর খ্যাতি চিরকাল অমর হয়ে থাকবে। আরম্ভ থেকে তাঁর শেষ ছবি পর্যন্ত, সবের মধ্যেই সমাজ সাম্যবাদ বা সংস্কারের একটা বলিষ্ঠ চিন্তার প্রচ্ছন্ন ধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে। তথাপি চ্যাপলিন শুধু অভিনেতাই নয়, তার গল্পের তিনিই লেখক এবং তার ছবির তিনিই পরিচালক। আমরা এই রকম শত শত দৃষ্টান্ত দেখাতে পারি যেখানে সত্যিকারের প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পী তাদের সমসাময়িক সাধারণ শিল্পীদের ছাড়িয়ে অনেক উর্দ্ধে উঠেছিলেন শুধু তাদের নিজেদের একাগ্র চেষ্টা এবং অনন্যসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির জোরে।

আমাদের দেশে অভিনেতারা, এমন কি সাম্প্রতিক কাল পর্যন্তও একই দুর্ভাগ্যের ভাগীদার এবং একই অখ্যাতির শরিক। তারাই আবার অভিনেতাদের সুনামকে অবনতির সমুদ্র গর্ভে নিমজ্জন, সমাজচ্যুতি এবং পুরাকালের ভবঘুরেমি থেকে বাঁচিয়ে ভদ্রতার পর্যায়ে রেখেছে। ঈশ্বরের করুণাকে ধন্যবাদ। তারা এখন তাদের প্রশংসক ও অনুরাগীদের মনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা রাখে।

একজন শিল্পী এখন জনমতকে রীতিমত প্রভাবিত করার এক জীবন্ত শক্তি। সে সমাজের যেমন মঙ্গল করতে পারে, তেমনি স্থায়ী মন্দও করতে পারে, যদি সে সতর্ক না হয়। তার পক্ষে কোন অপ্রামান্য ভাবভঙ্গী, কোন চরিত্র চিত্রণের ব্যাপার বা পারিপার্শ্বিকতা সৃষ্টিতে বিকৃত প্রকাশভঙ্গী এবং গল্পের বাস্তব ও প্রামাণিক বিষয়বস্তুর সত্য উদ্ঘাটনে কোন ভুল পদক্ষেপ হয় তাহলে সাধারণ লোকের মনে সেই ছবির—দেশকালপাত্র ও কার্য সম্বন্ধে একটা বিকৃত ধারণার সৃষ্টি হবে এবং মিথ্যা ছাপ রেখে যাবে। কারণ এ একটা অতি সাধারণ ভুল, যা অভিনেতারা প্রায়ই করে, যদি সে ঘনিষ্ঠভাবে সেই বিষয়ের ইতিহাস সম্বন্ধে শিক্ষা বা জ্ঞান লাভ না করে। যেহেতু আমাদের পূর্ব পুরুষদের আচার ব্যবহার ধরণধারণ সম্বন্ধে আজ আমরা অতি সামান্যই জ্ঞান রাখি। সেই জন্যই সম্ভবতঃ আমরা অতীতের জীবন ও দৃশ্যের চিত্র সঠিক ভাবে অঙ্কিত করতে পারি না। এখানে এটা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যদি কথা প্রসঙ্গে তার দুই একটির উল্লেখ করি। যারা সত্যিই জানতে চায়, তারা এ বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে পারে পুরাতন পাঠ্য থেকেই। আমাদের পূর্বপুরুষদের ঠেসান দেবার কায়দা, তাদের বসার, দাঁড়াবার ধরণ, এমন কি তাদের চলাফেরা ইত্যাদি অতি উৎকৃষ্ট ও উচ্চাঙ্গের সৌন্দর্য্যমণ্ডিত ভঙ্গীতে হতো। আমাদের অলঙ্কার শাস্ত্রে সেগুলির উল্লেখ আছে, যেমন আসন, ভঙ্গী, হেলা, মুদ্রা, ইত্যাদি। তাদের নানা প্রকারের শ্রেণী বিন্যাস আছে। যখন আধুনিক অভিনেতারা পুরাতন ঐতিহ্যসম্পন্ন চরিত্র এবং পৌরাণিক চরিত্র চিত্রণ করে তখন তারা পুরাপুরি সেগুলিকে অগ্রাহ্য করে এবং শিল্প পরিকল্পনাকারীর দ্বারা স্থাপিত সাজসরঞ্জামের চারিপাশে চলাফেরার দ্বারা অতীব যত্ন সহকারে সেই সময় বা কালের প্রভাব ফুটিয়ে তুলতে চায়, কিন্তু অভিনেতাদের নিজেদের ভ্রান্ত বা দোষাবহ চলাফেরার ধরণে এবং আচার আচরণে, সেই সময়কার পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করা

সত্ত্বেও তা একেবারেই নষ্ট হয়। অভিনয়কলার এই দিকটার বিশেষ জ্ঞানলাভের জন্য অভিনেতাকে ভাল রকম প্রশিক্ষণ নিতেই হবে। এই কারণেই পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা চলচ্চিত্র শিল্পে ব্যাপক শিক্ষাদানের আবশ্যকতা এমন গভীর ভাবে অনুভব করেছে।

পাশ্চাত্য দেশগুলিতে প্রত্যেক নাট্যশিক্ষালয়ে সময় বা কাল সম্বন্ধে কার্যপ্রণালী শেখাবার এবং মঞ্চসামগ্রীর ব্যবহার ইত্যাদি শেখাবার জন্য একটা ক্লাস আছে। দ্বন্দ্বযুদ্ধ থেকে আরম্ভ করে, অন্তর্বাস, শিরস্ত্রান, ঘাগরা, ও লেস ইত্যাদি পরে চলাফেরা করা, ষ্টেজের নানা জিনিষ যেমন নস্যির কৌটা, লম্বা লাঠি, ভ্রমনের ছড়ি, পাখা, ছোরা, হাতল লাগান-আই গ্লাস ইত্যাদি ব্যবহার করা। মার্জিত ব্যবহার, সুশোভন ভাবভঙ্গী সবই অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে শিক্ষা দেওয়া হয় যেমন যত্নের সঙ্গে শিক্ষা দেওয়া হয় হাবভাব ভঙ্গী, চলন বলন ইত্যাদি। দুঃখের বিষয় যে আমাদের দেশে এখনও এই রকম কোন শিক্ষালয় নেই।

এটুকু বলা নিষ্প্রয়োজন যে প্রত্যেক সফল নাট্য শিল্পীর প্রথাগত ঐতিহ্যের এবং পুঁথিগত বিদ্যার দিক দিয়ে একটা সমৃদ্ধ পশ্চাৎপট থাকে। কারুকলা, সুরুচিসম্মত নীতি ও নাট্যকলা কৌশলের দিক দিয়ে সেই সমৃদ্ধি এবং এইগুলিই সমগুণসম্পন্ন সফল শিল্প সম্বন্ধে তার জ্ঞান নিয়ন্ত্রণ করে। আর এটাই তার মনে একটা সুবুদ্ধি-সম্পন্ন শিল্পজ্ঞানের ভিত নির্মাণ করে। এই রকম আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নিউইয়র্কে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য একটি "মোশান পিকচার ফাউণ্ডেশান" সম্প্রতি স্থাপিত হয়েছে এবং অবসন্ ওয়েলস্ (Ovson Wells) পলেট গডার্ড, মার্লে ওবেরণ, রুথ গর্ডন, এবং মেরেডিথ্ প্রভৃতি প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতায় তা হয়েছে। তাদের রসায়নাগার সংক্রান্ত শিক্ষা আমর্হাষ্ট কলেজে দেওয়া হয়।

সেইরূপ আমরাও আজ আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবকবৃন্দকে

অভিনয়কলা শিক্ষাদানের জন্য একটা নাট্য শিক্ষালয়ের প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভব করছি। আজ আমাদের দেশে এটি একটি অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা। এটা বলা হয় যে শুধু অভিনয়কলা শিক্ষার ব্যাপার ছাড়া সকল প্রথাগত শিক্ষার্থীদের তাদের নিজেদের প্রথানুযায়ী শিক্ষা দেওয়া হয়। এটা সমভাবে বিস্ময়কর যে অভিনেতারা তাদের ত্রুটির জন্য সমালোচনার সম্মুখীন হয়, তথাপি নাট্যকলা সুযোগ সুবিধা, যা পেলে তারা সুষ্ঠু ব্যবসায়িক ক্যারিয়ার গড়ে তুলতে পারত, তা থেকে তারা বঞ্চিত। যা কিছু স্বল্প শিক্ষা তারা লাভ করেছে নানা অসুবিধা এবং সঙ্কটের মধ্য দিয়ে "ভুল কর এবং সংশোধনের চেষ্টা কর" এই নীতি অনুসরণ পূর্বক এবং প্রতিষ্ঠিত ও খ্যাতনামা অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের অনুকরণ দ্বারা। কখনও কখনও তারা বিদেশী চলচ্চিত্র থেকে নিজের চেষ্টায় শিক্ষালাভ করে। এটা শুভ লক্ষণ ও সুখের বিষয় যে ভারতবর্ষের জন্য একটা "জাতীয় ফিল্ম্ বোর্ড" শীঘ্রই আরম্ভ হবে এবং সেখানে অভিনেতা অভিনেত্রীদের এবং কারুকলা শিল্পীদের শিক্ষার জন্য শিক্ষালয় থাকবে। এটা আশা করা যাচ্ছে যে এই অসুবিধার অনেকটা এই প্রকারে দূরীভূত হবে এবং উচ্চাভিলাসী যুবকদের আর দুর্ভোগে ভুগতে হবে না, যেমন অতীতে আমরা ভুগে এসেছি।

তাদের পুঁথিগত এবং হাতে কলমে প্রশিক্ষণের প্রশ্ন যদি আমরা বাদই দিই তাহলেও যে কোন লোক-যে অবস্থার মধ্যে তাদের কাজ করতে হয় তা চিন্তা করে শিউরে উঠবে। ব্যবস্থা যথোপযুক্ত না হওয়াটা খারাপ, তবে ব্যবস্থা যখন অব্যবস্থায় পরিণত হয়, সে আরও খারাপ। আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে একজন লোকপ্রিয় যুবক শিল্পীকে একই সময়ে দশ বিশ রকমের বাধ্যবাধকতার মধ্যে কাজ করতে হয়। দুই থেকে এমনকি চারঘণ্টার সিফ্‌ট্ প্রত্যেক প্রযোজককে দেওয়া হয় এবং সেইজন্যই শিল্পীকে দিনেই হোক আর রাতেই হোক এক ষ্টুডিও থেকে আর এক ষ্টুডিওতে দ্রুত গতিতে

ঘুরে বেড়াতে হয় তার বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনের জন্য। সপ্তাহের মধ্যে তার আদৌ ছুটি থাকে না, এবং অনিচ্ছুক যন্ত্রের মত তাকে গড়িয়ে চলতেই হয়। তাকে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করতে দেওয়া হয়—কখনও নায়ক, কখনও দুর্বৃত্ত, কখনও প্রেমিক, কখনও ঠগ অথবা ভবঘুরের ভূমিকায়। এমন কি রাজার ভূমিকায় পর্যন্ত, যে অভিনেতা সকাল বেলায় নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করে সে-ই আবার বিকালে দুর্বৃত্তের ভূমিকায় এবং প্রায় মধ্যরাত্রির কাছাকাছি যখন প্রত্যেকে সুখ নিদ্রার ক্রোড়ে বিশ্রামরত এবং সে নিজেও ক্লান্ত, শ্রান্ত, ও নিদ্রালু—তাকে অভিনয় করতে হয় প্রেমিকের ভূমিকায়। বস্তুতপক্ষে, তার বিশ্রামের বা কোন সহজ আমোদ উপভোগের, যা তারমত কঠিন শ্রমের কাজ করা লোকের অপরিহার্য রকমে আবশ্যক তার কোন অবকাশই নেই। এইভাবে সে খুব কম সময় পায় পড়তে, চিন্তা করতে এবং কিছু দর্শন করতে। এটা জেনেও আনন্দ হয় যে এত কষ্ট এবং অসুবিধা সত্বেও, প্রশংসনীয়ভাবে দেশের সাংস্কৃতিক উন্নয়নের দিকে তার সাধ্যমত সাহায্য সে করেছে। এখন আমরা একটা শিক্ষানিকেতনের প্রয়োজনের কথা না ভেবে পারিনে, যে শিক্ষানিকেতনের স্নেহ-ছায়া-তলে সে আশ্রয় পেতে পারে। সে ফিল্ম্ ব্যবসায়ের এই রকম একটি মূল্যবান অংশ বলে সে এক নিখুঁত সংরক্ষণ ব্যবস্থা এবং সুখ সুবিধা, শিল্পব্যবসায়ীদের কাছে এবং সরকারের কাছে দাবী করতে পারে।

ভারত বর্ষের সংস্কৃতি ও শিল্পনৈপুণ্যযুক্ত জীবন সম্বন্ধে ফিল্ম্শিল্পী যে ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। একটা দেশের সমগ্র অতীত এবং বর্তমানের বাস্তবতা সেই দেশের সংস্কৃতি থেকেই পরিস্ফুট হয় আর সেটি হচ্ছে এই কি করে আমরা পরস্পরের সঙ্গে ব্যবহার করি, কি করে আমরা আমাদেরকে ভাষায় ও বাক্যে প্রকাশ করি, কি করে কাজ করি, কি করে আমরা আমাদের পারিপার্শ্বিককে সৃষ্টি করি যার মধ্যে আমরা খাই, বিশ্রাম

করি, ভালবাসি, এবং কি পোষাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করি। ফিল্‌ম্‌ শিল্পী চেষ্টা করেছে, সেগুলিকে নিখুঁত, বিশ্বস্ত এবং বর্ত্তমান শিক্ষা ও কাজের ব্যবস্থার মধ্যে যতটা সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব সেইভাবে চিত্রে তা রূপায়িত করতে। কিছু সংযত ও প্রতিভাধর শিল্পী যে সাফল্য অর্জন করেছে তা তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত চেষ্টাতেই করেছে। কিন্তু তাদের সংখ্যা খুবই কম। এই সাফল্য আরও কিছু বিস্তৃতভাবে অর্জনের জন্য শিল্পীরা নিজেরাই সমগ্রভাবে আগ্রহান্বিত হবেন।

স্বাধীনতার পূর্বে ভারতবর্ষ পৃথিবীর অন্যান্য অংশের মত নবদিগন্তের দিকে তাকিয়ে দেখছে নব নব উন্মেষ এবং পরিবর্তন। সভ্যতা এখন বড় বড় রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে। আমরা এখন পুনঃপুনঃ ধর্মঘটের দ্বারা বিব্রত হচ্ছি, নানা বিপৎসংকুল নানা পরিকল্পনা, নানা রকম চরম সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে চলেছি। এই সবই সাম্প্রতিককালে আমাদের সামাজিক দিকচক্রবালকে আচ্ছন্ন করেছে এবং প্রত্যেক লোকই এখন দেশের সর্বসাধারণের ব্যাপারে বেশী উৎসাহ দেখাচ্ছে। চলচ্চিত্রশিল্পীরা তাদের পেশার দিক দিয়ে সমাজবাদের গুরুতর সমস্যাবলী যাতে আজকের দিনে আমরা সকলেই জড়িত সেগুলিকে এড়িয়ে চলতে পারে না। কাজেই পল রোথা (Paul Rotha) তার "ডকুমেণ্টারী ফিল্‌ম্‌"য়ে লিখেছেন "রাজনীতি, উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়। প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করছে। এই লোকেরাই কয়েক বছর পূর্বে রাজনীতি বিষয়ক আলোচনাকে ঘৃণাজনক জিনিষ বলে মনে করত। রাজনীতি বলতে পুরাতন কালে যে অর্থ এই শব্দের ধরা হতো তা নয়, এ রাজনীতি সেই রাজনীতি যার মধ্যে অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, সংস্কৃতি এবং বহুক্ষেত্রে ধর্মও রয়েছে। তাই আজ আমরা শুধু রাজনৈতিক আদর্শবাদের সম্মুখীনই হইনি অপরিহার্য্য ভবিষ্যতের বিরক্তিকর প্রশ্নেরও সম্মুখীন হতে হয়েছে। প্রত্যেক

চিন্তাশীল ব্যক্তিই সামাজিক এবং রাজনীতির জটিল প্রশ্নে বিব্রত। এগুলির সম্মুখীন তাকে হতেই হবে। ফিল্মের পেশাদারী ব্যবসায়ীরা এ প্রশ্ন এড়িয়ে চলতে পারে না। ফিলম্ শিল্পীদের চেয়ে বেশী দক্ষতার সঙ্গে কেউই জনসাধারণের মধ্যে সামাজিক উন্নয়নের প্রেরণা যোগাতে পারেনি। কৃষক, তার পরিবার, শ্রমিক, কারখানার কর্মী, অথবা খনি শ্রমিক প্রভৃতির জীবনের ও কাজের প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের জন্য একজন শিল্পীকে বছরের .কখনও কখনও তাদের মধ্যে গিয়ে বাস করতে হয় সম্পূর্ণ বিশ্বস্ততার সঙ্গে। যাতে সে তাদের সংস্পর্শে এসে যা সে দেখেছে এবং শিখেছে এবং তাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, খুঁটি-নাটি ইত্যাদি বিষয় নিখুঁতভাবে ও প্রামাণ্যভাবে উপস্থাপিত করতে পারে।

ঠিক আসল লোকেদের সঙ্গে মাঠে, ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ নেওয়া, ষ্টুডিও অথবা বিদ্যালয়ে ট্রেনিং নেওয়ার চেয়ে অনেক ভাল। যদি তারা তা না করে তাহলে সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে কোন মূল্যবান অবদান তাদের কাছ থেকে আশা করা যেতে পারে না। এই প্রচেষ্টাব সর্বোচ্চ প্রকাশের এবং বিস্তৃততম জায়গায় এর আবেদন পৌঁছে দেবাব সাফল্যলাভের মাধ্যম হিসাবে কার্য্যকরীভাবে একটা স্বাস্থ্যকর সামাজিক আবহাওয়া গড়ে ওঠা দরকার, যাব মধ্যে প্রকৃতিগতভাবে একই চিন্তাধারা ধরণধারণওয়ালা লোকেদের ঘনিষ্ঠ সংশ্রব থাকে। প্রত্যেক সাংস্কৃতিক মাধ্যমের দিক দিয়ে একথা সত্য। এবং সিনেমাশিল্পের জন্য এটা আরও হাজারগুণ বেশী সত্য ও আবশ্যকীয়।

॥ গিরিশচন্দ্র ও সমসাময়িক কাল ॥

চন্দ্রের আকর্ষণে যেমন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে বারিরাশি, তেমনই গিরিশচন্দ্রের অসাধারণ নাট্য-প্রতিভার অকৃপণ দাক্ষিণ্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল বাংলা নাটকের চলমান স্রোতাবেগ। নাট্যজগতে গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাব বাংলা নাটকের ইতিবৃত্তে অবিস্মরণীয় ঘটনা। গিরিশচন্দ্রের নাট্যসৃষ্টিব অজস্রতায়, শক্তির বিপুলতায় এবং সর্বতোমুখী প্রতিভার বিচিত্র অবদানে বাংলা নাট্য-সাহিত্য কৈশোরের অপরিণত চাপল্যের অবসানে লাভ করল যৌবনের সুগঠিত, সুঠাম, পরিণত সুষমা,—বাংলা নাট্য-প্রবাহের ক্ষীণ সূত্র হয়ে উঠল পুরিপুষ্ট, প্রাণ-ধর্মে সতেজ, উদ্বেলিত। বাংলা নাট্য-আন্দোলনের ক্রমবিবর্তিত ইতিহাসেরই অবদান—গিরিশচন্দ্র। দীনবন্ধু, মনোমোহন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্যপ্রতিভার স্বাক্ষর-বহনকারী সামাজিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাট্যধারা গিরিশচন্দ্রের মধ্যে পূর্ণরূপে বিকশিত হয়ে উঠেছিল; তাঁর মৌলিকতার স্পর্শে নাটকের এই সমুদয় বিভাগ হয়েছিল বিশিষ্টতায় অভিমণ্ডিত। নাট্যজগতে গিবিশচন্দ্রের আগমনের সাথে সাথে উদ্দীপিত হয়ে ওঠে নাট্যামোদী দর্শক সাধারণের অতৃপ্ত অন্তর-বাসনা—পারতৃপ্তির মাধ্যমে সাধারণ রঙ্গালয় প্রাতিষ্ঠার উজ্জ্বল সম্ভাবনা। রাজবাড়িতে বিচরণশীলা নাট্যলক্ষ্মীকে কিরূপে সাধারণ মানুষের অতি সাধারণ অর্ঘ্য গ্রহণের জন্য তাদের সাধ্যের কাছাকাছি আনা যায়, সেই চিন্তাই একদিন অঙ্কুরিত হয়েছিল গিরিশচন্দ্রের সহানুভূতিশীল, দরদী অন্তরে। সেই নবাঙ্কুরই পরবর্তীকালে পুষ্পিত, পল্লবিত হয়ে পরিণত হয়েছিল বাংলাদেশে সাধারণ নাট্যশালার ছায়াশীতল মহীরুহে। গিরিশচন্দ্র

প্রথমে ছিলেন প্রধানতঃ নট, এবং অভিনয়-শিক্ষক; তারপর তিনি এসেছিলেন রঙ্গালয়ের সংস্কারক এবং পরিচালকরূপে; কিন্তু পরিপূর্ণ নাট্যকাররূপে তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল আরও অনেক পরে,—দ্বিধা-সংশয়ের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত ভীরু পদক্ষেপে। পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনা তাঁর কাছে ছিল কল্পনাতীত এবং ভীতিপ্রদ ব্যাপার। তাই সুহৃদ্গণের অনুরোধে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণে গান, গীতাভিনয়ের উপযোগী ক্ষুদ্র নাটিকা প্রভৃতি রচনা করেছেন, কিন্তু নাটক রচনার ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে তিনি প্রথমে বিন্দুমাত্র ইচ্ছা প্রকাশ করেন নি।

নিতান্ত নিরুপায়ভাবে তাঁকে নাটক-রচনায় ব্রতী হ'তে হয়েছিল। গিরিশচন্দ্রের নাট্যশালা সংস্কারক ও সংগঠক জীবনের সঙ্গে তাঁর নাট্যকার-জীবন বিশেষভাবে বিজড়িত। নাট্যকার জীবন আরম্ভের পূর্বে গিরিশচন্দ্র নানাভাবে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়গত শিক্ষা তাঁর বেশি দূর অগ্রসর না হলেও জ্ঞানপিপাসার তীব্রতা তাঁর মধ্যে ছিল অপরিসীম এবং বিস্ময়কর। নানা বিষয়ক গ্রন্থপাঠ তাঁর কাছে অতি প্রিয় ছিল, এমন কি শারীরবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্রের মধ্য থেকেও তিনি জ্ঞান আহরণ করেছিলেন। বাল্যকালে খুল্লপিতামহীর নিকট রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী শুনতেন অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে, লোকশিক্ষার অন্যতম প্রকৃষ্ট উপায় যাত্রা, কথকতা, কবিগান, হাফ-আখড়াই প্রভৃতি ছিল তাঁর কাছে অতি প্রিয় বস্তু। যাত্রা, কথকতা থেকে আরম্ভ করে নানাবিধ গ্রন্থরাজি থেকে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন যে গিরিশচন্দ্র, তাঁকে আমরা দেখেছি মহাকবি শেক্স্পীয়ারের অমর নাটকাবলীর মধ্যেও সমাধিস্থ হ'তে। বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছিলেন তিনি নাটক রচনার বহু পূর্বে।

এইভাবে বহু ধৈর্য, অধ্যাবসায়, বহু সাধনা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সমীক্ষার মধ্য দিয়ে নাটক রচনার প্রাঙ্গণতলে তাঁর মৃদু গতিতে

সলজ্জ আগমন। নিজের মধ্যে যে নাট্যকারের অসাধারণ প্রতিভা বিরাজমান -একথা তাঁর কাছে ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। যিনি নিজের শক্তির সত্যকার পরিচয় জানতেন না, তিনি তাঁর উপর আস্থাই বা রাখবেন কি করে? তাই তাঁর মধ্যে লেখক হিসাবে আত্মপ্রকাশের চেয়ে আত্মগোপনের চেষ্টাই বেশি—তাই তাঁর প্রাথমিক কয়েকটি রচনা প্রকাশিত হয় 'মুকুটাচরণ' ছদ্মনামে।

বাগবাজার এ্যামেচার থিয়েটারের 'সধবার একাদশী'তে নিমচাঁদের ভূমিকায় অভিনয় করে রাতারাতি বিখ্যাত নটের সম্মান অর্জন করার পর গিরিশচন্দ্রকে আবার দেখা যায় 'লীলাবতী'র ললিতের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে। এবারেও এদের 'লীলাবতী' সুযশ অর্জনে সমর্থ হয়েছিল। এমন কি বঙ্কিমচন্দ্র ইতিপূর্বে যে অভিনয় করেছিলেন তার চেয়ে অনেক ভাল অভিনয় হওয়ায় দীনবন্ধু প্রীত হয়ে বলেছিলেন, "এবার চিঠি লিখবো তুয়ো বঙ্কিম"।

গিরিশচন্দ্রের মুখে তাঁর কবিতার অপূর্ব আবৃত্তি শুনে দীনবন্ধু অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। ১৭৭১ সালে জুলাই মাসে এই অভিনয়কালে বাগবাজার এ্যামেচার থিয়েটার প্রথমে ক্যালকাটা ন্যাশনাল থিয়েটার নামে পরিবর্তিত হয়।

ন্যাশনাল থিয়েটার সম্প্রদায় 'লীলাবতী'র পর যখন 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের জন্য মহড়া দিতে আরম্ভ করেন, তখনই তাঁরা টিকিট বিক্রয় ক'রে থিয়েটার করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে মতান্তর হয়। টিকিট বিক্রয় ক'রে থিয়েটার করা বিষয়ে গিরিশচন্দ্রের ঘোরতর অমত ছিল। ন্যাশনাল থিয়েটার নাম দিয়ে, ন্যাশনাল থিয়েটারের উপযুক্ত সাজসরঞ্জাম ব্যতীত দর্শক সাধারণের কাছে টিকিট বিক্রয় ক'রে অভিনয় করা গিরিশচন্দ্রের মনঃপূত হয় নি। অবাঙ্গালীরা ন্যাশনাল থিয়েটার নাম শুনে টিকিট ক্রয় ক'রে অভিনয় দেখতে এসে এর উপকরণের দৈন্য দেখে নাসিকা কুঞ্চিত করবে বলেই গিরিশচন্দ্র মনে করেছিলেন।

কিন্তু গিরিশচন্দ্রের অমত সত্ত্বেও সম্প্রদায়ের অন্যান্য সকলে মিলে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করলেন জোড়াসাঁকোর মধুসূদন সান্যালের বাড়িতে। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসের দিনপঞ্জীতে ১৮৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বর একটি দুর্লভ দিবস। ঐদিন মহাসমারোহে 'নীলদর্পণ' নাটক প্রথম অভিনীত হয় সাধারণ রঙ্গালয়ে। গিরিশচন্দ্র তখন এই সম্প্রদায়ের সঙ্গে কোন সংশ্রব রাখেন নি। পরপর কয়েকটি নাটক অভিনীত হ'বার পর নূতন কোন ভাল নাটক না পাওয়ায় 'কৃষ্ণকুমারী' নাটককেই তার উৎকর্ষের জন্য অভিনয় করার সিদ্ধান্ত করল এই সম্প্রদায়। ভীমসিংহের ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য গিরিশচন্দ্রের চেয়ে ভাল কোন অভিনেতা না পাওয়ায় সকলে পুনরায় এসে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন গিরিশচন্দ্রকে এই ভূমিকাটি গ্রহণ করতে। বাল্যবন্ধুগণের অনুরোধ এড়াতে না পেরে গিরিশচন্দ্রকে আবার তাঁদের মধ্যে আসতে হল। পেশাদারী অভিনয়ে অমত থাকায় তিনি এলেন অবৈতনিক অভিনেতারূপে। সাধারণ রঙ্গালয়ে গিরিশচন্দ্র এসে যোগ দিলেন এর প্রতিষ্ঠার দু'মাস পর।

ভীমসিংহের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্রের অনবদ্য অভিনয় শোভাবাজার রাজবাড়িতে নাট্যাচার্য বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের মনোজ্ঞ অভিনয় অপেক্ষাও অনেক হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। কৃষ্ণকুমারী নাটকের ৫ম অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে কন্যা হারানোর ভয়ে শোকে উন্মত্ত ভীমসিংহের উন্মাদ অবস্থার রূপায়ণ গিরিশচন্দ্রের অভিনয়জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যসৃষ্টি। ভীমসিংহের উন্মাদ অবস্থার রূপদানে গিরিশচন্দ্র এই চরিত্রটির সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিতে পেরেছিলেন বলেই এত অপূর্ব অভিনয় করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। কন্যাবিরহ-আশঙ্কায় উন্মাদগ্রস্ত ভীমসিংহের সেই উদ্‌ভ্রান্ত উক্তি—"মানসিংহ—মানসিংহ মানসিংহ! হুঁ—তাকে তো এখনই নষ্ট করবো। আমি এই চল্লেম।" গিরিশচন্দ্রের অভিনয়ে এমনই হৃদয়ভেদী হয়ে উঠেছিল যে সামনের সারিতে উপবিষ্ট দর্শকদের মধ্যে কয়েকজন অভিভূত হয়ে চেয়ার

থেকে পড়ে গিয়েছিলেন, এমন কি একজন তো সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন।

আবার ঐ অঙ্কের একই গর্ভাঙ্কে যেখানে ভীমসিংহ কন্যার বিচ্ছেদ ব্যথায় জর্জরিতা মহিষীকে বলছেন—"মহিষী যে? দেখ, তুমি আমার কৃষ্ণাকে দেখেছ! কৈ?"—সেইখানে গিরিশচন্দ্রের অপূর্ব অভিনয় মর্মস্পর্শী হয়েছিল। এই দৃশ্যে পূর্ববর্তী অভিনেতারা বেঙ্গল থিয়েটারের ম্যানেজার নট নাট্যকার নাট্যাচার্য্য বিহারীলাল অশ্রুবর্ষণের মধ্য দিয়ে অভিনয় করতেন, কিন্তু গিরিশচন্দ্রের অভিনয় প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল এক উদ্ভ্রান্ত চরিত্রের ব্যাকুল অনুসন্ধানে—সেখানে সমস্ত অশ্রু যেন বাষ্পীভূত হয়ে গিয়েছিল। নাটোরের রাজা চন্দ্রনাথ রায়বাহাদুর এই অভিনয় দেখে অভিভূত হয়ে গিরিশচন্দ্রকে নিজের হাতে তাঁর রাজপোষাকে ভীমসিংহরূপে সাজিয়ে তাঁর তরবারি উপহার দিয়েছিলেন। ভীমসিংহের ভূমিকা যেন গিরিশ-চন্দ্রের জন্যই লিখিত হয়েছিল। গিরিশচন্দ্রকে এই ভূমিকায় মানাত অতি চমৎকার। তাঁর সুবিশাল দেহ এবং উদাত্ত কণ্ঠস্বর ভীমসিংহের ভূমিকায় সম্পূর্ণ উপযোগী ছিল। বহু ভূমিকায় অভিনয় করেই তিনি সাফল্য ও যশ অর্জন করেছেন, কিন্তু শোকোন্মত্ত ভীমসিংহের চরিত্রের ন্যায় কোনটিই তাঁকে এতদূর প্রভাবিত করতে পারে নি।

'সাধবার একাদশী'র নিমচাঁদের চরিত্রে অভিনয় করে গিরিশচন্দ্র তাঁর অভিনয় জীবনের সূচনায় এবং পরেও প্রভূত সম্মান লাভ করেন। তাঁর অভিনীত সমগ্র চরিত্রসৃষ্টির মধ্যে নিমচাঁম চরিত্র রূপায়ণ উজ্জ্বল হ'য়ে বিরাজ করেছিল প্রদীপ্ত ভাস্করের মত। কিন্তু তবু সেই অপূর্ব অভিনীত এবং তাঁর অভিনেতৃ-জীবনে অসামান্য গৌরবহনকারী চরিত্রটি গিরিশচন্দ্রকে কৃষ্ণকুমারীর ভীমসিংহের মত প্রভাবান্বিত করতে পারেনি তাঁর পরবর্তী অভিনয়-সৌকর্যের মধ্যে অথবা তাঁর নাট্যসৃষ্টির মধ্যে। ভীমসিংহ চরিত্রটি গিরিশচন্দ্রের

অভিনয়িক সত্তার মধ্যে যেন ওতপ্রোতভাবে মিশে গিয়েছিল, যেন তাঁর অভিনেতা-অন্তরের নিভৃত স্থানে লাভ করেছিল চিরস্থায়ী আসন। গিরিশচন্দ্রের অভিনয় বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এই চরিত্রটি বহু ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছে। তাঁর বহু লেখার মধ্যেই আমরা কন্যাবিচ্ছেদ-আশঙ্কায় জর্জরিত অপ্রকৃতিস্থ ভীমসিংহকে বারে বারে ফিরে আসতে দেখি—কখনও অস্পষ্ট, কখনও-বা সুস্পষ্টরূপে। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃণালিনীর নাট্যরূপ দান কবেছিলেন গিরিশচন্দ্র। তিনি তাতে কোন মৌলিক পরিবর্তনের চেষ্টা না করে উপন্যাসের ভাষা প্রায় ব্যবহার করেছিলেন। তবে নাটকের প্রয়োজনে কয়েকটি নূতন দৃশ্য গিরিশচন্দ্র এর মধ্যে সংযোজিত করেছিলেন। পশুপতি চরিত্রটি তাঁর ভাব-কল্পনা দিয়ে সম্পুর্ণ নিজের মত করেই পুনর্লিখিত হয়েছিল। গিরিশকৃত এই নাটকের পশুপতি চরিত্রে ভীমসিংহের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান।

ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠায় উৎসাহিত হ'য়ে আশুতোষ দেব (সাতু বাবুর) মহাশয়ের দৌহিত্র শরচ্চন্দ্র ঘোষ ১৮৭৩র ১৬ই আগষ্ট (বেঙ্গল থিয়েটার নামে) একটি সাধারণ নাট্যশালার উদ্বোধন করেন 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের মধ্য দিয়ে। প্রায় এই সময়ই একদিন রাত্রে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধর্মদাস সুর এবং জমিদার পুত্র ভুবনমোহন নিয়োগী অত্যাধিক ভিড় বশতঃ বেশী দামের টিকিট পর্যন্ত না পেয়ে ফিরে আসেন বেঙ্গল থিয়েটার থেকে। সদ্য পিতৃহীন এবং বিপুল সম্পত্তির মালিক ভুবনমোহন জেদবশতঃ গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭৩র ৩১শে ডিসেম্বর এই থিয়েটারের দ্বারোদ্ঘাটন হয়। বেঙ্গল থিয়েটারেতে 'দুর্গেশ নন্দিনী'র সাফল্যজনক অভিনয়ে ঈর্ষান্বিত হ'য়ে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার চাইল বঙ্কিমের অন্য উপন্যাসকে নাটকে রূপান্তরিত করে অভিনয় করতে। তাঁরা বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন গিরিশচন্দ্রকে। গিরিশচন্দ্র 'মৃণালিনী'র নাট্যরূপ দান করলেন এবং ১৮৭৪এর ১৪ই ফেব্রুয়ারী স্বয়ং পশুপতির

ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তাঁর অনন্যসাধারণ অভিনয়, প্রতিভার পরিচয় পুনরায় নতুন করে দান করলেন। অতঃপর গিরিশচন্দ্র কর্তৃক নাটকীকৃত 'কপালকুণ্ডলা'র অভিনয় হয় ১৮৭৪এর ১৪ই এপ্রিল। এইভাবে বঙ্কিমের উপন্যাসের নাট্যরূপদানের মধ্য দিয়ে গিরিশচন্দ্র করছিলেন মৌলিক নাটক রচনার পূর্বাহ্নিক শিক্ষানবিশী।

এরপর গিরিশচন্দ্রের জীবনে দেখা দিল নানারূপ দুর্বিপাক। ১৮৭৪ সালের ২৪শে ডিসেম্বর তাঁর পত্নীবিয়োগ হল। এ্যাট্‌কিনসন কোম্পানী ফেল হওয়ায় কর্মের মধ্যে নির্বিষ্ট থেকে শোক সংবরণ করার পথও ছিল না। অতঃপর তিনি ফ্রাইবার্জার এণ্ড কোম্পানীতে যোগদান করেন এবং কর্ম-ব্যপদেশে ভাগলপুরে গমন করেন। বিভিন্ন কাজ ও কবিতা-রচনার মধ্য দিয়ে মানসিক অশান্তির জ্বালাকে এই সময় প্রশমিত করতে চেষ্টা করেন। অতঃপর ফ্রাইবার্জার কোম্পানী ত্যাগ করে গিরিশচন্দ্র মহাত্মা শিশির কুমারের অনুরোধে ইণ্ডিয়ান লীগের হেডক্লার্ক ও কেসিয়ার পদে কাজ করতে থাকেন এবং প্রায় বছর খানেক পরে পার্কার কোম্পানীর অফিসে বুক-কীপারের চাকুরী সংগ্রহ করেন। এই সময় গিরিশচন্দ্র দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন এবং তাঁর চিত্তের উদ্বেগ ও অস্থিরতা অনেকটা প্রশমিত হয়। এইভাবে গিরিশচন্দ্র ব্যক্তিগত নানা বাধাবিপত্তির ফলে সাধারণ রঙ্গালয় থেকে কিছুটা দূরে সরে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু নাট্য-প্রতিভা তার মধ্যে অন্তঃশীলা, শত বাধাবিপত্তি উপস্থিত হ'লেও সে কি কখনও নীরব হয়ে থাকতে পারে? তাই নানা জটিলতার মধ্যেও যখন প্রয়োজন হয়েছে তিনি ফিরে এসেছেন অভিনেতৃগোষ্ঠীর মাঝখানে অভিনয় শিক্ষা দিয়ে, নাট্যপরিচালনা ক'রে, বঙ্কিমের উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে, গান রচনা করে নানাভাবে বন্ধুদের সহায়তা করেছেন। মাউসি, Charitable Dispensary, ধীবর ও দৈত্য, আলিবাবা, Pantomine, দুর্গাপূজার পঞ্চরং, Circus Pantomine,'সহিস হইল আজি কবি চূড়ামণি' প্রভৃতি কয়েকটি রঙ্গ-নাটিকা রচনা করেছিলেন

গিরিশচন্দ্র। কিন্তু সেগুলি তিনি তাঁরা সত্যকার নাট্য-প্রচেষ্টার মধ্যে গণ্য করেন নি। 'আগমনী'কে তিনি তাঁর প্রথম রচনারূপে উল্লেখ করেন।

'আগমনী'র উৎসর্গপত্রে তিনি এবিষয়ে লিখেছেন—"আমার এই প্রথম রচনা-কুসুমটিকে অনাদর-অনল-শিখায় অর্পণ ক'রনা"। এই সময়েই গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের নিদারুণ দুরবস্থা। বেহিসাবী এবং থিয়েটারে পান ভোজন অব্যাহত গতিতে চালিয়ে যাওয়ায় ভুবনমোহন তখন আকণ্ঠ ঋণগ্রস্ত। 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটককে কেন্দ্র করে এই সময় রঙ্গজগতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং অভিনয়-নিয়ন্ত্রণ আইন গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক গৃহীত হয় ১৮৭৬ সালে।

নাট্যজগতের প্রতি গিরিশচন্দ্রের ছিল একটা সহজাত আকর্ষণ ও অপরিসীম মমত্ববোধ। তিনি গ্রেট ন্যাশনালের এই নিদারুণ সংকটের সময়ে স্থির বসে থাকতে পারলেন না। পয়সা দিয়ে টিকিট কেটে অভিনয় দেখতে আসবে দর্শকেরা, এবিষয়ে তিনি এবং আরও অনেকেই প্রথমে সন্দিহান ছিলেন এবং সেজন্য তিনি এই প্রচেষ্টাকে প্রথমে সমর্থন করেন নি, কারণ এদেশে বিভিন্ন ধনী জমিদার রাজা প্রভৃতির বাড়িতে অভিনয় হত এবং কোন মূল্য দিতে হত না প্রবেশ-পত্রের জন্য। এইভাবে বিনামূল্যে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করে অভিনয় দেখাই এদেশের রীতি ছিল।

কিন্তু পরে পেশাদার রঙ্গালয়ের সাফল্য দেখে তাঁর ধারণা পরিবর্তিত হয়েছিল এবং তিনি বুঝেছিলেন সুন্দর দৃশ্যপট ভাল নাটকের সুঅভিনয় এবং রঙ্গালয়ের সুপরিচালনায় এই ব্যবসাতেও লাভ করা যায়। তাই যখন তিনি দেখলেন ভুবনমোহনবাবুর রঙ্গালয় পরিচালনার ত্রুটি ও ব্যর্থতার জন্য গ্রেট ন্যাশনালের পাদ-প্রদীপ নির্বাপিতপ্রায়, তখন তাঁর মনে উদ্বেগের সঞ্চার হ'ল। একটা প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তুলতে বহু সময় লাগে, বহু কৃচ্ছ্র সাধনের প্রয়োজন হয় তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে তুলতে, কিন্তু তার অবলুপ্তি ঘটে অল্প

সময়ের মধ্যে ; সান্ন্যাল বাড়িতে সামিয়ানা খাটিয়ে, বাঁশের মাঁচা বেঁধে যে থিয়েটারের একদিন অভিনয় হয়েছে সেই থিয়েটারই পরে ইংরাজী লুইস থিয়েটারের আদর্শে কাষ্ঠনির্মিত রঙ্গালয় বিশিষ্ট সুন্দর দৃশ্যপট ও আলোকমালা সুসজ্জিত নাট্যশালায় পরিণত হয়েছে। এই গ'ড়ে-ওঠা প্রতিষ্ঠানকে অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করার বাসনা তাঁর মনের মধ্যে জেগে উঠল। এই রকম একটি প্রতিষ্ঠান আর কোন দিন গ'ড়ে উঠবে কিনা সন্দেহ।

তাই গিরিশচন্দ্র তাঁর বন্ধু জমিদার, নাট্যকার, অভিনেতা কেদারনাথ চৌধুরীর সঙ্গে পরামর্শ করলেন। গিরিশচন্দ্র চাকরী করেন। তাঁর সময়াভাব, কেদারবাবু যদি পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন তাহ'লে তাঁরা দুজনে মিলে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারকে লীজ নিতে পারেন, কেদারনাথ চৌধুরী সম্মত হওয়ায় গিরিশচন্দ্র ভুবনবাবুর নিকট এই প্রস্তাব করেন। গিরিশচন্দ্র লীজ নিতে চান শুনে ভুবনবাবু সাগ্রহে তাঁর হাতে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারকে তুলে দিলেন। গিরিশচন্দ্র তাঁর শ্যালক দ্বারকানাথ দেবের নামে লীজ গ্রহণ করার পর থেকেই প্রকৃত পক্ষে সাধারণ নাট্যশালার পুরোপুরি সংস্পর্শে আসবার একটা সুযোগ হল। ১৮৭০ সালের শেষের দিকে কেদারবাবুকে পরিচালকরূপে গ্রহণ করে গিরিশচন্দ্র 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নাম দিয়ে দুর্দশাগ্রস্থ গ্রেট ন্যাশনালকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে তুলতে উদ্যোগী হলেন।

গিরিশচন্দ্র প্রথমে অমৃতলাল মিত্র, রামতারণ সান্ন্যাল, মহেন্দ্রলাল বসু, মতিলাল সুর, বেল বাবু, বিনোদিনী, ক্ষেত্রমণি, কাদম্বিনী প্রমুখ সুঅভিনেতা ও অভিনেত্রীবর্গকে সমবেত করলেন সুন্দর পারস্পরিক বোঝাপড়া-সম্পন্ন একটি শক্তিশালী অভিনেতৃ-গোষ্ঠী গঠন করার জন্য।

এরপর গিরিশচন্দ্র প্রথম নাটক-রচনায় হাত দিলেন। আশ্বিন মাসে শারদীয়া পূজা উপলক্ষ্যে গিরিশচন্দ্র রচনা করলেন 'আগমনী'।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখানি একটি গীতিনাট্য। চরিত্র মাত্র ৪টি, তন্মধ্যে গিরিরাজ ও মেনকা, শিব ও উমা প্রধান নন্দী ও ভৃঙ্গী অনুল্লেখ্য চরিত্র। এছাড়া প্রমথগণ, যোগিনীগণ প্রভৃতি গায়ক-গায়িকা, অনুচর-অনুচরীবর্গ।

নাটকটির প্রথমে মঙ্গলাচরণ এবং তারপর মাত্র ৩টি দৃশ্যেই এর সমাপ্তি। মঙ্গলাচরণ-সহ তেরখানি সংগীতের সমাবেশ ঘটেছে এই নাটকে। গানগুলি কখনও একক, কখনও দ্বৈত, কখনও বা সমবেতভাবে পরিবেশিত। গীতি-নাট্যটির মেনকা চরিত্রের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে শ্বশ্রূগৃহে অবস্থিতা কন্যাকে দর্শনের জন্য বাঙ্গালী মায়ের অন্তর-ব্যাকুলতা।

দেবতাকে বাঙ্গালী জেনেছে আপন জন বলে, একান্ত আত্মীয়রূপে। তাই এখানে দেবতাকে শ্রদ্ধা-ভয়-ভক্তিতে পূজ্য অলভ্য দূরস্থিত রূপে কল্পনা না করে বাংলার সামাজিক, সাংসারিক পরিবেশে অত্যন্ত অন্তরঙ্গরূপে চিত্রিত করা হয়েছে। এই গীতি-নাট্যের মধুর মর্মস্পর্শী সংগীতময় দৃশ্যের মধ্য দিয়ে বাঙ্গালীর জননীর অন্তরের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা এমনভাবে রূপায়িত হয়ে উঠেছিল যে, দর্শক তা'কে সাগ্রহে এবং সানন্দে অভিনন্দিত করেছিল এর অভিনয়কালে। 'কুস্বপন দেখেছি গিরি, উমা আমার শ্মশানবাসী', 'ওমা কেমন ক'রে পরের ঘরে ছিলি উমা বল্‌না তাই', 'তুমি ত মা ছিলে ভুলে আমি পাগল নিয়ে সারা হই' প্রভৃতি অমর গান বাংলার বাউল ভিক্ষুকদের মুখে আজও শোনা যায় এবং এখনও আমাদের অন্তরে আবেগের সঞ্চার করতে সমর্থ হয়। 'আগমনী' ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হয় ১৮৭৭ সালের ৬ই অক্টোবর এবং প্রভূত যশ অর্জন করে।

নাট্য-উৎকর্ষের বিষয়ে এই নাটকের তেমন কোন দান না থাকলেও রঙ্গালয়ের সঙ্গে বাঙ্গালীর কৃষ্টির সংযোগ স্থাপনের দিক্ দিয়ে এর মূল্য যথেষ্ট আছে। এরপর থেকেই জন্মাষ্টমী, শিবরাত্রি, চড়কপূজা, দোলযাত্রা, এমন কি, বড়দিন (X'mas) ইত্যাদি বিভিন্ন পর্ব দিয়ে

নাটিকা রচনা করে দর্শকদের মধ্যে জাতীয় সংস্কৃতির উন্মেষের প্রয়াস সুরু হয়। অতুলকৃষ্ণ মিত্র, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি অনেকেই এরপর এই ধরণের গীতি-নাট্য রচনা করেন। কোন ঋতু বা কোন পর্বকে অবলম্বন করে নাটিকা-রচনার এই প্রথম সূত্রপাত হ'ল। 'আগমনী' গীতিনাট্যটি যে বিপুল জনসম্বর্ধনা লাভ করেছিল, অন্য কোন নাট্যকার হ'লে নিজেকে একজন প্রকৃত নাট্যস্রষ্টারূপে গণ্য করে স্ফীত হয়ে উঠতেন, কিন্তু গিরিশচন্দ্র এটিকেও তাঁর নাট্য-রচনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপে মনে করেন নি। তাই তখনও তাঁর মধ্যে দ্বিধা সংশয়। 'মুকুটাচরণ' ছদ্মনামের অন্তরালে সেদিন আত্মগোপন করেছিলেন নাট্যকার।

'আগমনী' অভিনয়ের চারদিন পরে অভিনীত হয় গিরিশচন্দ্রের 'অকাল বোধন'। 'অকাল বোধন' ও দর্শক সমাজকে আনন্দ দান করতে সমর্থ হয়েছিল।

ন্যাশনাল থিয়েটার ক্রমশঃ জনসাধারণের নিকট আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে এমন সময় গিরিশচন্দ্রকে এক অভিনব পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হল। তাঁর ভ্রাতা হাইকোর্টের উকিল অতুলকৃষ্ণ ঘোষের মোটেই ইচ্ছা ছিল না যে, গিরিশচন্দ্র কোন রঙ্গালয়ের স্বত্বাধিকারী থাকেন, কারণ তাঁর আশঙ্কা ছিল যে, তাহলে গিরিশচন্দ্রের অবস্থাও একদিন ভুবনমোহনের ন্যায় অত্যন্ত শোচনীয় পরিণতি লাভ করবে। যাই হোক ভ্রাতার সঙ্গে বিরোধের সম্ভাবনা উপস্থিত হওয়ায় গিরিশচন্দ্র লীজ-সত্ত্ব ত্যাগ করলেন এবং সেই থেকে পরিচালক-অভিনেতা রূপেই রঙ্গালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

গিরিশচন্দ্র লীজ ত্যাগ করায় তাঁর শ্যালক দ্বারকাবাবু থিয়েটারটি ভাড়া নিয়ে চালাতে লাগলেন এবং এই সময় মেঘনাদবধের গিরিশকৃত নাট্যরূপ (১৮৭৭ এর ১লা ডিসেম্বর) অভিনীত হয়। এবং 'কৃষ্ণ-কুমারী' প্রভৃতি নাটক এবং দীনবন্ধুর গল্প 'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ'কে প্রহসনে পরিণত করে অভিনীত হয় ন্যাশনাল থিয়েটারে। এই সকল অভিনয় জনপ্রিয়তা অর্জনেও সমর্থ হয়।

মেঘনাদবধে রাম এবং মেঘনাদ এই তুই বিপরীতধর্মী চরিত্রে অপূর্ব অভিনয়ে নৈপুণ্য প্রদর্শন করে গিরিশচন্দ্র সেদিন প্রভূত যশ অর্জন করেন এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের সারিতে তাঁর আসনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। অতঃপর দ্বারকাবাবু থিয়েটার ছেড়ে দেওয়ায় কেদারনাথ চৌধুরী লীজ গ্রহণ করেন।

নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ'কে গিরিশচন্দ্র নাটকে রূপান্তরিত করেন এবং ১৮৭৮ এর ৫ই জানুয়ারী ঐ নাটক মহাসমারোহে সাফল্য-জনকভাবে অভিনীত হয়।

১৮৭৮ সালের ২৬শে জানুয়ারী 'আনন্দমিলন' এবং ৪ঠা মার্চ 'দোললীলা' নামক গিরিশচন্দ্র রচিত তু'খানি গীতিনাট্য অভিনীত হয়, কিন্তু দর্শকগণের প্রশংসা অর্জনে সমর্থ হয়নি।

এই সময় বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ। বঙ্গীয় নাট্যশালাতে তাই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিকে নাটকাকারে অভিনয়ের ঢেউ উঠেছিল অনিবার্যভাবে

গিরিশচন্দ্র কর্তৃক নাটকীকৃত 'বিষবৃক্ষ' অভিনীত হল ১৮৭৮ এর ২৭ এপ্রিল। ন্যাশনাল থিয়েটার পুনরায় নূতন করে খ্যাতি অর্জন করল দর্শক-সমাজকে এই নাটক উপহার দিয়ে।

নগেন্দ্রের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্রের অভিনয় দর্শকচিত্তে চিরস্থায়ী শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছিল। সূর্যমুখীকে হারাণোর পর নগেন্দ্রের বিভিন্ন ভাবভঙ্গী, আচরণের মধ্যে পুনরায় কৃষ্ণকুমারীর ভীমসিংহের উদ্‌ভ্রান্ত চরিত্রসৃষ্টির রীতির ছায়াপাত ঘটতে দেখা যায়।

বেঙ্গল থিয়েটারে কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনীত হলেও কেদারবাবুর অনুরোধে গিরিশচন্দ্র বঙ্কিমের তুর্গেশনন্দিনীর নূতন নাট্যরূপ দান করেন। প্রথম অভিনয়ে কেদার চৌধুরী জগৎসিংহ এবং কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ওসমানের ভূমিকায় অভিনয় করেন, কিন্তু তুলনামূলক বিচারে বেঙ্গল থিয়েটারই লাভ করে অধিকতর অভিনয়-নৈপুণ্যের বিজয়মাল্য। অতঃপর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হলেন গিরিশচন্দ্র স্বয়ং। তিনি গ্রহণ করলেন জগৎসিংহের ভূমিকা এবং ওসমান চরিত্রে

রূপদান করলেন মহেন্দ্রলাল বসু। আরও কিছু কিছু পরিবর্তন সাধন করে নবভাবে অভিনয় অনুষ্ঠিত হল এবং ব্যক্তিগতভাবে গিরিশচন্দ্রের ও গোষ্ঠিগতভাবে আভিনয়িক উৎকর্ষের বিচারে এবারে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মানলাভ করল ন্যাশনাল থিয়েটার।

এইভাবে গিরিশচন্দ্র জনগণচিত্তে খ্যাতিনামা অভিনেতার দুর্লভ আসন লাভ করেছিলেন। গিরিশচন্দ্রের অভিনয়-নৈপুণ্য উৎকর্ষ লাভ করলেও বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত শরচ্চন্দ্র ঘোষের দেহ সৌষ্ঠব ও অশ্বারোহণ পটুতার জন্য দর্শকগণ চমৎকৃত হতেন। এইজন্য শরৎবাবুর জগৎসিংহ অভিনয়ও ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। ১ম দৃশ্যে দুর্যোগপূর্ণ রাতে অশ্বারোহণে ঝড়ের মধ্য দিয়ে এসে গাছে ঘোড়ার বল্‌গা বেঁধে যখন মন্দির দ্বারে করাঘাত ক'রে বলতেন 'মন্দিরে কে আছে, দ্বার খোলো' কিংবা অশ্ব হ'তে অবতরণ করে ওসমানকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করার দৃশ্য দর্শক হৃদয়ে অপূর্ব রেখাপাত করেছিল, গিরিশবাবুর সুপটু অভিনয়ও তাদের মন থেকে সেই ছবি মুছে ফেলতে পারেনি।

এই সময় বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের জীবনে নেমে এল আকস্মিক বিপর্যয়। দুর্গেশনন্দিনীর অভিনয়কালে এক রজনীতে গিরিশচন্দ্র রঙ্গমঞ্চের উপর পা পিছলে পড়ে যান এবং গুরুতররূপে আহত হন। তাঁর বাঁ হাতের কব্জি ভেঙে যাওয়ায় তাঁকে তিনমাস কাল কষ্টভোগ করতে হয় এবং নাট্যশালার সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের যোগসূত্র এইভাবে ক্ষীণ হয়ে আসায় থিয়েটার পরিচালনার ক্ষেত্রে নানাবিধ অসুবিধা এবং অশান্তিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।

কেদার চৌধুরী থিয়েটার-পরিচালনায় অক্ষম হয়ে থিয়েটার ত্যাগ করেন।

এরপর অনেকেই ভাড়া নিয়ে থিয়েটারটিকে চালাবার চেষ্টা করেন। উপযুক্ত ব্যবসায়িক বুদ্ধি ও পরিচালন-শক্তির অভাবে সকলেই ব্যর্থ হয়। এই সময় মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্সের বহু টাকা বাকী প'ড়ে

যাওয়ায় মালিক ভুবনমোহন নিয়োগীর বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয় এবং পরিশেষে নীলামে মাত্র ২৫০০০৲ টাকায় প্রতাপচাঁদ জহুরী নামক একজন মাড়োয়ারী ভদ্রলোক ঐ রঙ্গালয়টিকে ক্রয় করেন ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে।

প্রতাপচাঁদ ছিলেন ব্যবসায়ী। তিনি বুঝেছিলেন এই থিয়েটারই একদিন একটি লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হবে, যদি উপযুক্ত পরিচালন ব্যবস্থা করা হয় এবং যদি হিসাবপত্র ইত্যাদি যথাযথভাবে রক্ষার বন্দোবস্ত করা যায়। কেবল মাত্র সুঅভিনয়ই অর্থাগমের পক্ষে যথেষ্ট নয়, একটি প্রতিষ্ঠানকে সম্যকরূপে চালিয়ে যেতে হলে তার জন্য অবশ্য প্রয়োজন হয় শৃঙ্খলাবদ্ধ নিয়মকানুন বিধিব্যবস্থা-পালনের। ইতিপূর্বে এই থিয়েটারে যে অর্থাগম হয়নি তা' নয়, কিন্তু বেহিসেবী এবং অক্ষম পরিচালনার জন্য,—নিয়মশৃঙ্খলাবিহীন খামখেয়ালী ব্যবস্থাপনার জন্য, (সর্বোপরি বেশি অর্থ এলে সেদিন অত্যন্ত উদারহৃদয় হ'য়ে মালিকের অন্যান্য সকলের সঙ্গে পানভোজনে লিপ্ত হওয়া) প্রভৃতি দোষের জন্যই এই লাভজনক ব্যবসায়েও পূর্ববর্তী মালিকেরা লাভের অঙ্কের পরিবর্তে লোকসানই দেখেছেন। প্রতাপ জহুরী তাঁর অভিজ্ঞতার দরুণ তাই প্রথমেই অনুসন্ধান করতে লাগলেন একজন উপযুক্ত পরিচালকের। তিনি গিরিশচন্দ্রের যোগ্যতার প্রমাণ ইতিপূর্বে কিছু কিছু পেয়েছিলেন। তাই তাঁর একান্ত ইচ্ছা হল গিরিশচন্দ্রের হাতে এই থিয়েটারের পরিচালনার ভার অর্পণ করার। গিরিশচন্দ্র কিন্তু কিছুতেই সম্মত হলেন না।

প্রথমতঃ তিনি তখন পার্কার কোম্পানীর অফিসে বুক-কীপার, দ্বিতীয়তঃ অর্থ নিয়ে অভিনয় করা ইত্যাদি ব্যাপারেও তাঁর মন সায় দেয় না। তিনি প্রতাপচাঁদকে সোজাসুজি তাঁর 'অমত আছে' একথা জানিয়ে দিলেন। কিন্তু প্রতাপ জহুরীর যে গিরিশচন্দ্র না হ'লে চলবে না। তিনি কি এত সহজে ফিরে যেতে পারেন? নাছোড়বান্দার মত তিনি লেগে রইলেন গিরিশচন্দ্রের পিছনে, যে

ক'রেই হো'ক তাঁকে রাজী করাতেই হবে। অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়াল যে গিরিশচন্দ্র তাঁকে এড়াবার জন্যে একদিন বাড়িতে থেকেও অপরকে দিয়ে বলে পাঠালেন যে তিনি বাড়িতে নেই। কিন্তু ভবি ভোল্‌বার নয়, ছিনে জোঁকের মত বসে থাকেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যবসায়ী। অবশেষে প্রতাপচাঁদকে লজ্জা দেবার জন্যে গিরিশচন্দ্র স্বয়ং জান্‌লা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বল্‌লেন, "গিরিশবাবু বাড়ি নেই, আপনি এখন যেতে পারেন।" কিন্তু তবু কি ছাড়বার পাত্র প্রতাপ জহুরী, সে জহর চেনে, এমন জহর সে কখনও ছাড়তে পারে? অবশেষে অসীম ধৈর্য এবং অধ্যাবসায়ের জয় হল; গিরিশচন্দ্রকেই সম্মত হ'তে হল প্রতাপচাঁদের প্রস্তাবে। তিনি ভেবে দেখলেন ইতিপূর্বে ন্যাশনাল থিয়েটারের ব্যবসায়িক অসাফল্যের কারণ সমূহ। তিনি চিন্তা করলেন এর আগে যাঁরা এসেছিলেন থিয়েটারের মালিকরূপে তাঁরা কেউই ব্যবসায়ী ছিলেন না, তাঁরা এসেছিলেন নিতান্ত সখ মেটাবার জন্য, লাভ করবার জন্য নয়। এখন যদি প্রতাপচাঁদের মত একজন পাকা ব্যবসায়ী লোক নিয়মশৃঙ্খলা প্রবর্তন ক'রে, আয়-ব্যয়ের যথাযথ হিসেব রেখে থিয়েটার থেকে লাভ করব বলে এগিয়ে আসেন, সেটা বঙ্গীয় নাট্যশালার পক্ষে লাভজনকই হবে এবং নাট্য-পরিচালনার ব্যাপারে তার সহযোগিতা লাভ করা রঙ্গালয়কে বাঁচিয়ে রাখার দিক দিয়ে যথেষ্ট সহায়ক হবে। পরে, অবশ্য, অনেক কিছু ভেবে চিন্তে তিনি রাজী হলেন মাত্র ১০০৲ টাকা মাইনে নিয়ে বেতনভোগী ম্যানেজাররূপে নাটাজগতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে। তিনি তখন পার্কার কোম্পানীর ১৫০৲ টাকা মাইনের চাকুরী পরিত্যাগ করে সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রথম বেতনভোগী তত্ত্বাবধায়কের কার্য গ্রহণ করলেন।

প্রতাপ জহুরী এবং গিরিশচন্দ্রের এই মিলন বাংলা নাট্য-আন্দোলনের ইতিহাসে একটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই অভিনব যোগসূত্রের ফলেই সৃষ্টি হয়েছিল গিরিশচন্দ্রের প্রকৃত

নাট্যকার জীবনের অঙ্কুরোদ্গমের উপযুক্ত ক্ষেত্র। এক বিচিত্র পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে জন্মলাভ করল নাট্যকার গিরিশচন্দ্র। থিয়েটার পরিচালনার জন্য প্রতাপ জহুরী ও গিরিশচন্দ্র যে সকল নিয়মকানুন প্রবর্তন করেছিলেন গত যুগ পর্যন্ত বাংলা দেশের রঙ্গালয় পরিচালনায় সেইগুলিই অনুসৃত হ'য়ে এসেছে। রঙ্গালয় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এইটাই প্রতাপ জহুরীর অবদান।

নবগঠিত ন্যাশন্যাল থিয়েটারের দ্বারোদ্ঘাটন হ'ল ১৮৮১র ১লা জানুয়ারী। খ্যাতনামা কবি সুরেন্দ্র মজুমদার গিরিশচন্দ্রের অনুরোধে 'হামির' নামক একটি নাটক রচনা করে দেন। 'হামির' নাটকের অভিনয় দর্শক চিত্তে রেখাপাত করতে পারে নি।

এরূপ দুর্বল নাটক নিয়ে পূর্ণোদ্যমে চলমান বেঙ্গল থিয়েটারের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা ন্যাশনাল থিয়েটারের পক্ষে সম্ভব হ'ল না। মাত্র তিনটি রাত্রির অভিনয়ের মধ্যেই এই নাটকের অভিনয় শেষ হয়। গিরিশচন্দ্র তখন অত্যন্ত সমস্যার সম্মুখীন হ'লেন- নূতন নাটক কোথায়? মাইকেল, দীনবন্ধুর নাটক তো প্রায় সবই অভিনীত হয়ে গেছে বিভিন্ন নাট্যশালায়। মাইকেল, দীনবন্ধুর পর মধ্যাহ্ন ভাস্করের ন্যায় দীপ্তিমান বঙ্কিমের জনপ্রিয় উপন্যাসগুলিকেও নাট্যরূপ দান করে বঙ্গীয় দর্শকের নাট্যরস পিপাসা মেটাবার চেষ্টাও তখন হয়ে গেছে। বঙ্কিমের নাটকীকৃত উপন্যাসের অভিনয় দেখতে বিপুল জন-সমাগম ঘটত। বঙ্কিমের এই উপন্যাসগুলি ছিল বাংলা রঙ্গালয়ের classic, তাই যখনই যাদের প্রয়োজন হয়েছে তারাই বঙ্কিমের উপন্যাসগুলিকে নাটকাকারে পুনরভিনয়ের চেষ্টা করেছেন।

৬০।৭০ বৎসর এমনই চলেছে। গিরিশচন্দ্রের সময়ে মাত্র কিছু দিন পূর্বে পেশাদার রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাই দর্শক সংখ্যা ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। তাই প্রায়ই নূতন নাটক না দিলে নাট্যশালা চালানো অসম্ভব হ'য়ে পড়ত।

গিরিশচন্দ্র 'হামির' অভিনয়ের পর নূতন নাটকের জন্য অত্যন্ত

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। তাই তিনি থিয়েটারের হ্যাণ্ডবিলে ভাল নাটকের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করে বিজ্ঞাপন দিতে লাগলেন। কিন্তু পুরস্কারের প্রত্যাশায় রামনারায়ণ তর্করত্নের মত কোন প্রতিভাবান নাট্যকারকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল না।

গিরিশচন্দ্র ইতিপূর্বে গীত রচনা করেছেন, নাটকের প্রস্তাবনা লিখে দিয়েছেন, ক্ষুদ্র রঙ্গনাটিকা, গীতিনাট্য প্রভৃতি লিখে যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করেছেন, কিন্তু ছোট পটভূমিকাতেই রঙ ফলাতে তিনি পারেন, বড় পট দেখে তিনি ভীত হন—পেছিয়ে পড়েন; সে শক্তি কি তাঁর আছে—মনে সংশয় জাগে। একটা পূর্ণাঙ্গ নাটক লেখবার জন্য তাই তিনি তখনও সাহস করে এগিয়ে আসতে পারেন না। তাঁর মধ্যে যে অসামান্য নাট্য-প্রতিভা বিদ্যমান—এ পরিচয় তিনি তখনও পান নি। তিনি অনেক জায়গায় বলেছেন যে, তিনি সখ করে নাটক লিখতে আসেন নি, তাঁকে দায়ে পড়ে নাট্যকার হ'তে হয়েছে। কিন্তু খ্যাতিমান নাট্যকার হ'বার আকাঙ্ক্ষা কি গিরিশচন্দ্রের মধ্যে ছিল না? যিনি তাঁর সব রচনাতেই প্রশংসা পেয়েছেন, তাঁর মনে এ কামনা থাকা খুবই স্বাভাবিক।

গিরিশচন্দ্রের মনেও এই আকাঙ্ক্ষা বিরাজ করছিল ঠিকই; কিন্তু তিনি তখনও নিজেকে উপযুক্ত হয়েছেন বলে মনে করেননি বলেই সে সময় নাট্য-রচনায় হাত দিতে চান নি; তখন তাঁর মধ্যে চলেছে প্রস্তুতি এবং নানাভাবে জ্ঞান-সংগ্রহ ও অভিজ্ঞতা-আহরণ। গান, গীতিনাট্য ইত্যাদি লিখেছেন, উপন্যাস, কাব্যগ্রন্থ প্রভৃতির নাট্যরূপ দান করেছেন সেক্‌স্‌পীয়ার প্রমুখ পাশ্চাত্য নাট্যকারদের নাটক, উপন্যাস সমূহ এবং অন্যান্য জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থরাজি অধ্যয়ন করেছেন, ময়দানের লুইস থিয়েটারের সত্বাধিকারিণী প্রতিভাশালিনী অভিনেত্রী মিসেস লুইসের সঙ্গে নানারূপ বিদেশী নাটকেরও অভিনয়-সমালোচনায় এবং দিনের পর দিন অভিনিবেশ সহকারে লুইস্ থিয়েটারের অভিনয়-দর্শনের মধ্য দিয়ে গিরিশচন্দ্রের নাট্যপ্রতিভা ক্রমশঃ বিকাশোপযোগী

হয়ে উঠেছিল। তখনও ঠিক সেই উপযুক্ত মুহূর্ত এসেছে বলে গিরিশচন্দ্র মনে করেন নি। তাই তাঁর এত দ্বিধা, এত সংশয়,—অন্যকে দিয়ে নাটক লিখিয়ে নেবার জন্য এত আকুলতা। উৎকৃষ্ট নাটকের জন্য প্রতীক্ষা করার অবসরে গিরিশচন্দ্র রচনা করেন 'মায়াতরু' এবং 'মোহিনী প্রতিমা' নামক দুইটি গীতিনাট্য ও 'আলাদিন' নামে একটি রঙ্গ-নাটিকা।

১৮৮১র ২২শে জানুয়ারী 'পলাশীর যুদ্ধ' নাটকের পর অনুষ্ঠিত হয় মায়াতরুর গীতাভিনয়। এই গীতিনাট্যটির গানগুলি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

লুইস থিয়েটারে অভিনীত W. S. Gilbert-এর 'Pygmalion & Galatta' নামক নাটকের ছায়া-অবলম্বনে রচিত হয় গিরিশচন্দ্রের 'মোহিনী প্রতিমা' নাটক এবং অভিনীত হয় ১৮৮১র ১৬ই এপ্রিল। এই নাটকটির মধ্যে উচ্চশ্রেণীর ভাবধারা প্রতিফলিত হয়েছিল। নাটকটির বিষয়বস্তু ছিল মানব প্রেমের সুগভীরতা। এক শ্রেণীর দর্শকের নিকট 'মোহিনী প্রতিমা' সমাদৃত হয়েছিল।

এই সঙ্গে উপস্থাপিত করা হত 'আলাদিন' নামক পঞ্চরঙখানি। এই রঙ্গ-নাটিকাটি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জনে সমর্থ হয়েছিল।

নানাভাবে চেষ্টা করার পরও যখন কোন ভাল নাটক পাওয়া গেল না, তখন গিরিশচন্দ্র নিজেই পরীক্ষামূলকভাবে নাটক লিখতে চেষ্টা করলেন। এইভাবে অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে নাট্যরচনার ক্ষেত্রে আগমন ঘটলো গিরিশচন্দ্রের। গিরিশচন্দ্র লক্ষ্য করলেন তখন চলেছে ঐতিহাসিক যুগ; নাটক 'কৃষ্ণকুমারী' থেকে আরম্ভ করে 'পুরুবিক্রম', 'সরোজিনী', 'অশ্রুমতী' প্রভৃতিতে এবং বঙ্কিমের অনেক ঐতিহাসিক উপন্যাস নাট্যে রূপান্তরিত হওয়ায় ঐতিহাসিক নাটকই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। তিনি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'হামিরে'র মধ্যেও সেই চেষ্টাই দেখেছিলেন। প্রথম বড় পটভূমিকায় রঙ ফলাতে গিয়ে—পূর্ণাঙ্গ একটি নাটক-রচনায় হস্তক্ষেপ করে গিরিশচন্দ্র

তাই গ্রহণ করলেন ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু, এবং পূর্ব-সূরীদের মত একে রোমান্সের রসে সিক্ত করে নিতে চাইলেন। এই প্রচেষ্টারই ফলশ্রুতি —'আনন্দ রহো' নাটক। এই নাটকের সমালোচনা প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত 'ভারতী' পত্রিকা যে লিখেছিলেন— 'গিরিশ বাবুর লেখায় আমরা এরূপ কল্পনার অরাজকতা আশা করি নাই',—একথা গিরিশচন্দ্রের 'আনন্দ রহো' নাটক সম্পর্কে বলা খুব অসঙ্গত হয়নি। গিরিশচন্দ্র এতদিন যে সব পাশ্চাত্য নাটক এবং নাট্যসমালোচনা পড়েছিলেন এবং লুইস থিয়েটারে অভিনয়-দর্শন, মিসেস লুইসের সঙ্গে আলোচনার ও অন্যান্য নানা গ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন সেগুলো তাঁর মধ্যে ভাসমানভাবে বিরাজ করছিল, ঠিক আত্মস্থ তখনও হয়নি ; সেই বিচিত্র অনুভূতির অসংযত প্রকাশ ঘটেছিল 'আনন্দ রহো' নাটকের মধ্যে। তখনও তাঁর মনোরাজ্যে সুদূর-প্রসারী কল্পনার পুরোপুরি আবির্ভাব ঘটেনি। তাঁর পঠিত বিভিন্ন বস্তুর সঙ্গে আপন কল্পনার সুসমন্বয় সাধনের ক্ষমতা তিনি তখনও অর্জন করেননি। তাই দেখা গেছে, চিন্তা ও কল্পনার দৈন্য এ নাটকের নানাস্থানে। চরিত্রগুলি জীবন্ত হয়ে উঠতে পারেনি—তাদের অপরিস্ফুট চিত্রই দৃষ্টি-গোচর হয়। লহনা চরিত্রের মধ্যে Lady Macbeth-এর ছায়াপাত ঘটেছে বলে মনে হয় ; একটি অদ্ভুত ধরণের চরিত্র রূপায়িত হয়েছে বেতালের মধ্যে। সর্বদা আনন্দোজ্জ্বল, নির্লিপ্ত, পরদুঃখে বিগলিতপ্রাণ এই বেতাল চরিত্রটি নাটকটির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং গিরিশ-চন্দ্রের অভিনব সৃষ্টি। যাত্রাতে অবশ্য 'যদ্‌ভবিষ্য', 'দিবদাস' প্রভৃতি এই ধরণের চরিত্র আমরা দেখেছি—যারা এসে গানে গানে কিছু তত্ত্বকথা শোনাত, ভবিষ্যতের কথা, লোকের মনের কথা প্রভৃতি বলে দিয়ে যেত। এই বেতাল চরিত্রটি গিরিশচন্দ্রের অন্যান্য নাটকেও মাঝে মাঝে এসে দেখা দিয়েছে, তবে অন্য নামে ভিন্ন পটভূমিকায়।

যাই হোক, গিরিশচন্দ্রের অপরিণত শক্তির প্রথম নাট্যসৃষ্টি

ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হয়েছিল ১৮৮১ সালের ২১শে মে। জনসাধারণ বিশেষ উৎসাহিত হয়নি এই নাটক-দর্শনে। এই নাটকের জনসম্বর্ধনা লাভে ব্যর্থতার আর একটা কারণ হিসাবে বলা যায়, এর কয়েক মাস পূর্বে প্রায় একই বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উৎকৃষ্ট নাটক 'অশ্রুমতী' বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হয়ে যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল।

'আনন্দ রহো'র ব্যর্থতার পর গিরিশচন্দ্র অনুধাবন করলেন তাঁর ত্রুটি কোথায়। তিনি বুঝতে পারলেন এখনও পূর্ণাঙ্গ একটা নাটক লেখার উপযুক্ত তিনি হননি, ইতিপূর্বে বঙ্কিমের উপন্যাসগুলির নাট্যরূপ দান করে তিনি প্রশংসা অর্জন করেছিলেন, কারণ সেখানে ছিল একটা সুগঠিত কাঠামোর মধ্যেই বিচরণ ক'রে তিনি কিছু কিছু চরিত্র-সৃষ্টি ও দৃশ্য সংস্থাপনের ক্ষেত্রে নিজস্ব বৈশিষ্ট প্রদর্শন করেছিলেন। তাই এবার গিরিশচন্দ্র চাইলেন এমন একটা বিষয়বস্তুকে তাঁর নাটকের উপজীব্য করতে, যার মধ্যে আছে বাঙ্গালী নরনারীর মর্মস্পর্শী রসময় আবেদন এবং একটা সুনির্দিষ্ট কাঠামো, যে নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবাধে বিচরণ ক'রে তিনি জনপ্রিয় নাটক সৃষ্টি করতে পারবেন।

গিরিশচন্দ্র উপলব্ধি করলেন যে, বাঙ্গালী ধর্মপ্রাণ, ভক্তিমান দৈব-বিশ্বাসী। তিনি এই নাটকের বিষয় সংগ্রহ করার দিক দিয়ে উপযুক্ত বলে মনে করলেন পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি বাঙ্গালীর অতিপ্রিয় ধর্মগ্রন্থগুলিকে। গিরিশচন্দ্র সেই ঐতিহাসিক নাট্যপ্রিয়তার যুগে পৌরাণিক নাটক লিখতে অগ্রসর হয়ে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন বলে অনেকের কাছে মনে হবে। কিন্তু গিরিশচন্দ্র জানতেন এই পরীক্ষায় সাফল্য তাঁর অবধারিত। কারণ বাঙ্গালী দর্শক যে ঐতিহাসিক নাটক বা উপন্যাস ভালবাসে তার কারণ তা'রা যে ইতিহাসের যথাযথ রূপায়ণের জন্য ভালবাসে তা নয়, তারা এই ধরণের নাটকের মধ্যে পায় উত্তেজনা, পায়

খানিকটা ইতিহাস, খানিকটা রোমান্স। তবে উত্তেজনার খোরাক পাওয়াই হচ্ছে এই সকল নাটক ভাল লাগার কারণ। তিনি তখন ভাবলেন, পৌরাণিকের মধ্যেও এমন বিষয় নিতে হবে যার মধ্যে থাকবে যথেষ্ট উত্তেজনা। তিনি দেখলেন, রাবণ-বধের কাহিনীর মধ্যে বীররস পরিবেশন করা যাবে, বীররসের স্থায়ীভাব উৎসাহ, এই উৎসাহই নিয়ে আসবে অপরিসীম উত্তেজনা। আর এই বীররসের সঙ্গে যদি ভক্তিরস, করুণরস প্রভৃতি মিশ্রিত করা যায় তখন তার সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। রামায়ণের থেকে কাহিনী নিয়ে তিনি লিখলেন—'রাবণ-বধ' নাটক। নাটকটি অভিনীত হল ১৮৮১র ৩০শে জুলাই।

গিরিশচন্দ্র লাভ করলেন বহুবাঞ্ছিত যশোমাল্য, নাটকের অভিনয় হল সাফল্যমণ্ডিত, গিরিশচন্দ্রও স্বীকৃতি পেলেন প্রতিভাশালী নাট্যকার-রূপে। সেইজন্যই আমরা আগেও বলেছি এবং এখনও বলছি যে গিরিশচন্দ্র নট হয়েছিলেন এক রাত্রে, কিন্তু নাট্যকার হ'তে তাঁর বহু প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়েছে। সেই ঐতিহাসিক নাটকের যুগে গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটক সাফল্যলাভ করবে কি না এবিষয়ে অনেকেরই যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসু বলেছেন—

"রাবণ-বধ নাটক যেদিন প্রথম অভিনীত হয়, আমাদের বড়ই ভাবনা হইয়াছিল—পৌরাণিক নাটক চলিবে কি না?" যাই হোক সেদিন পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন গিরিশচন্দ্র, তাকে বরণ করে নিলেন বঙ্গনাট্যলক্ষ্মী এবং দিলেন যথাযোগ্য পথের সন্ধান। এতদিন গিরিশচন্দ্র ছিলেন খ্যাতিমান নট ও নাট্য-পরিচালক,—এখন থেকে তিনি লাভ করলেন সম্মানিত নাট্যকারের ঈপ্সিত আসন। 'রাবণ-বধে' গিরিশচন্দ্র বাল্মীকি রামায়ণকে পুরোপুরি অনুসরণ করেননি, তিনি সম্পূর্ণ নির্ভর করেছিলেন কৃত্তিবাসী রামায়ণের উপর। বাল্যকালে গিরিশচন্দ্র একান্ত চিত্তে তদ্গত হয়ে শুনতে ভালবাসতেন

রামায়ণ, মহাভারত-পাঠ, কথকতা প্রভৃতি এবং এগুলি \সেই বালকচিত্তকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করেছিল যে পরবর্তীকালে পরিণত বয়সেও তাঁকে এই সমস্ত বিষয় যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করেছে। কারণ যাত্রা, কথকতা, রামায়ণ, মহাভারত-পাঠ কেবল সাময়িক আবেশে অভিভূত করেনি তাঁকে, তাঁর অস্থিমজ্জার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে মিশে গিয়েছিল।

গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক নাটক রচনার ক্ষেত্রে মূল রামায়ণ বা মূল মহাভারতকে অনুসরণ না করে কৃত্তিবাস-কাশীরাম দাস-এর রচনাকেই পুরোপুরি অনুসরণ করেছিলেন, এর কারণ তিনি বাঙ্গালী সমাজে বাঙ্গালীর মানস প্রকৃতির কাছে যা প্রীতিকর এবং অনায়াসগ্রহণযোগ্য হবে, সেই উপকরণই সংগ্রহ করতে চেয়েছিলেন তাঁর নাটকের জন্য। বাল্মীকি রামায়ণে কোনও কোনও চরিত্র এমনভাবে অঙ্কিত হয়েছে যেটা বাঙ্গালী পাঠকের রসচিত্তের কাছে অত্যন্ত বিসদৃশ ও দৃষ্টিকটু বলে মনে হয়।

কৃত্তিবাসী রামায়ণের অধিকাংশই গিরিশচন্দ্রের প্রায় কণ্ঠস্থ ছিল। এইজন্যে বহু স্থানে কৃত্তিবাসের ভাষা পর্যন্ত তাঁর নাটকের মধ্যে এসে গেছে। অনেক সময় মনে হয় গিরিশচন্দ্র বুঝি কোন মৌলিক নাটক লেখেন নি। তিনি কৃত্তিবাসী রামায়ণের অংশ বিশেষকেই যেন নাটকাকারে রূপান্তরিত করেছেন। তাঁর 'রাবণ-বধ' নাটকে রাবণ, রামচন্দ্র প্রভৃতি চরিত্র সজীব হয়ে উঠেছে গিরিশচন্দ্রের অপূর্ব বর্ণনা গুণে।

'রাবণ-বধ' নাটকের মধ্যে গিরিশচন্দ্র করেছিলেন করুণ রস, বীররস, ভক্তিরস, হাস্যরস প্রভৃতি নানা রসের সমাবেশ এবং বাঙ্গালী দর্শকের রসচিত্তে আনন্দদানে সমর্থ হয়েছিল এই নাটকটি। জনকনন্দিনীর দুঃখে সকল দর্শকই অশ্রু বিসর্জন করেছে, আবার. বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশী হনুমান ও ত্রিজটার কথাবার্তায় হাস্যমুখরিত হয়ে উঠেছে প্রেক্ষাগৃহ। 'ভারতী' মাসিক পত্রিকা এই নাটকের উচ্ছ্বসিত

প্রশংসাপূর্ণ আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু হাস্যরসাত্মক দৃশ্যটি সংস্থাপনায় তাঁরা সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। হনুমান ও রাক্ষসী ত্রিজটার কথোপকথনের মধ্যে কিছু গ্রাম্য ও চলিত ভাষা প্রয়োগ হয়ত তাঁরা সমর্থন করতে পারেন নি। কিন্তু তৎকালে কোন রুচিশীল দর্শকের কাছেই তা রুচিবিগর্হিত বলে মনে হয় নি। বরং সমগ্র নাটকের গম্ভীর পরিবেশ Relief Scene হিসাবে এই দৃশ্যের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা ছিল।

গিরিশচন্দ্র 'রাবণ-বধে'ই প্রথম প্রবর্তন করলেন ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষব ছন্দ। চতুর্দশ অক্ষরের বন্ধন থেকে অমিত্রাক্ষরকে মুক্ত কবে গিরিশচন্দ্র তাকে দিলেন স্বচ্ছন্দ সাবলীল গতিবেগ—সৃষ্টি হল নাটকের উপযুক্ত ভাষা। মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দ চতুর্দশ অক্ষরের বন্ধনে আবদ্ধ এবং উহা আয়ত্ত করাও সাধারণ অভিনেতৃবর্গের পক্ষে কষ্টসাধ্য।

কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম পেঁচার নকসা'র প্রচ্ছদপটে ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত একটি ক্ষুদ্র কবিতা থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন গিরিশচন্দ্র এই নবতম গৈরিশী ছন্দ প্রবর্তনের। মুক্ত হরিণীর স্বচ্ছন্দ গতিতে চলমান, শ্রুতিমধুর সহজ সরল গৈরিশী ছন্দ পরে গিরিশচন্দ্রের এবং অন্যান্য নাট্যকারের বিভিন্ন নাটকে ব্যবহৃত হয়েছিল এবং নাটক-রচনার উপযুক্ত বাহনরূপে স্বীকৃত হয়েছিল। মাইকেল থেকে অমিত্রাক্ষর ছন্দের সূত্রপাত এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দ রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতি অনেক নাট্যকারই ব্যবহার করতে চেষ্টা করেছেন। সে ইতিহাস সকলেই জানেন। তাই এই ছন্দের ক্রমবিকাশের ইতিহাসের মধ্যে আমরা যেতে চাই না। আমরা শুধু এইটুকুই বলতে চাই যে, গিরিশচন্দ্রই সর্বপ্রথম এই ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর ছন্দকে এমন একটা সার্থক রূপ দিলেন যে, নাটকের অভিনয়-কালে সেকালের সুকণ্ঠ নটনটীগণের কণ্ঠে এই ছন্দের নাট্যাংশ আবৃত্তিতে যে শব্দঝঙ্কার সৃষ্টি হত, তাতে দর্শকগণ স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে পড়তেন।

অনেকেরই এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। এইরূপে অমিত্রাক্ষর ছন্দকে ঘসে মেজে যে গৈরিশী ছন্দ সৃষ্টি হয়েছিল, সেই ছন্দই হল নাটকের সম্পূর্ণ উপযোগী।

নাট্যকার হিসাবে গিরিশচন্দ্র ছিলেন অসীম শক্তিধর, শক্তি-চঞ্চল লেখক। বঙ্গীয় নাট্যশালাকে অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে তাঁর লেখনী পরিচালিত হয়েছিল অপ্রতিহত গতিতে। সে অভিযাত্রায় কোন দিন ক্লান্তি ছিল না,—কোন দিন চিন্তার দৈন্য এসে তাঁকে হতাশায় ম্লান করতে পারে নি। গিরিশচন্দ্রের স্বর্ণ-প্রসূ লেখনী থেকে তাই সৃষ্টি হয়েছে এমনই বিপুল সংখ্যক নাট্যসম্পদ যে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। পেশাদার নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার পর দর্শকসংখ্যা খুবই নগণ্য থাকায় এক একটি নাটক বড় জোর দুই-তিন সপ্তাহ অভিনীত হত; কিন্তু গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকগুলির অনবদ্য অভিনয় এবং রঙ্গালয়ের উন্নততর দৃশ্যসজ্জা প্রভৃতির জন্য তাঁর সময় প্রথম দিকে দুই মাস পর্যন্ত একটি নাটকের অভিনয় চলত, পরে অবশ্য ছয় মাসও চলেছে। প্রতি দুই মাস অন্তর গিরিশচন্দ্র তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভার দ্বারা নূতন নাটক রচনা করে উপযুক্ত নাট্যশিক্ষা দান করে তাকে অভিনয়োপযোগী রূপে মঞ্চে উপস্থাপিত করতেন। গিরিশচন্দ্র তাঁর অসামান্য শক্তির দ্বারা এইভাবে ৮০ খানি নাটক লিখেছেন। তাঁর নাট্যকার-জীবনের সমগ্র সৃষ্টির সম্পূর্ণ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনা করা যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ্য। সেইজন্য সে চেষ্টা আমরা করব না এবং তার প্রয়োজনও নেই। আমরা কেবল এইটুকুই দেখাতে চাই, আর্য যুগের পূর্ব থেকে আরম্ভ করে এবং বাংলাদেশে নাট্য-সংস্কৃতির যে ধারা আজ পর্যন্ত প্রবাহমান সেই ধারাকে গিরিশচন্দ্র 'রাবণ-বধ' নাটক লেখার পর থেকে তাঁর মৃত্যুকাল ১৯১২ সাল পর্যন্ত কিভাবে পুষ্ট করে এসেছেন নাট্য-সৃষ্টির মধ্য দিয়ে, অভিনয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রীতি প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে এবং রঙ্গালয় পরিচালনার মাধ্যমে। ইতিপূর্বে অনেককে বলতে

শোনা গেছে যে, 'গিরিশ বক্তৃতামালার' বক্তারা জাতীয় রঙ্গালয়ের স্রষ্টা গিরিশচন্দ্রের প্রতি ঋণ স্বীকার করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনই করে গেছেনে, তেমন কোন সমালোচনা করে যান নি। আমিও ঠিক এই কথাই বলবো যে, আমি আজ এখানে এসেছি সেই অসামান্য নাট্যপ্রতিভা-সম্পন্ন নট, নাট্যকার, অভিনয়-শিক্ষক, প্রয়োগশিল্পী এবং বঙ্গরঙ্গভূমির প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা গিরিশচন্দ্রের অমর স্মৃতির উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার জন্য,— শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে। তাঁর সমস্ত নাটকের সমালোচনা করতে আমি আসিনি এবং আমার পক্ষে তা' সম্ভবও নয়। প্রত্যেক সমালোচকেরই কোনও না কোন প্রবণতা থাকে এবং সেই প্রবণতা দিয়ে বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকেই আমরা সব জিনিষের বিচার করে থাকি। তাই নিছক নিরপেক্ষ সমালোচনা বড় কঠিন।

যাই হোক, আমরা এখানে এইটাই দেখাতে চেষ্টা করবো যে বঙ্গীয় নাট্য-জগতে গিরিশচন্দ্রের অবদান কতটুকু। নাটক-রচনার ক্ষেত্রে তাঁর বৈশিষ্ট্য এবং নবযুগ-সৃষ্টির ক্ষেত্রে সেগুলির যথাযথ স্থান নিরূপণ করতে গিয়ে আমরা গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক, সামাজিক ও ঐতিহাসিক নাটক-গুলির মধ্যে থেকে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকখানি মাত্র নাটককে বেছে নিয়ে সেগুলোর সম্বন্ধেই আমাদের আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখবো।

'রাবণ-বধের' অভূতপূর্ব সাফল্য দেখে গিরিশচন্দ্র বুঝতে পারলেন যে, তিনি জাতির মর্মস্থলে রস সঞ্চার করার জন্য উপযুক্ত বিষয়বস্তুকেই নির্বাচন করেছেন। তখন গিরিশচন্দ্রের উৎসাহিত লেখনী থেকে সৃষ্টি হল তাঁর দ্বিতীয় পৌরাণিক নাটক 'সীতার বনবাস'। ন্যাশনাল থিয়েটারে এই নাটকটির প্রথম অভিনয় অনুষ্ঠান হয় ১৮৮১ সালের সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে, এবং এর অভিনয় সর্বশ্রেণীর দর্শকের বিশেষ করে মহিলাদের হৃদয়কে অনায়াসে জয় করে নিতে পেরেছিল। রামায়ণের করুণতম অংশকে অবলম্বন করে যে নাটক গিরিশচন্দ্র

লিখেছিলেন, তার সর্বাঙ্গ-সুন্দর অভিনয় যে করুণ রসের প্লাবন বহিয়ে দিয়েছিল তার তুলনা বিরল। এই সময় থেকে বাংলার মা লক্ষ্মীদের আগমনের সাথে সাথে লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টিও বর্ষিত হয় বঙ্গীয় নাট্যশালার উপর, সেই সময় রঙ্গালয়কে ভদ্র, শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সমাজ বেশ প্রীতির চক্ষে দেখতেন না, কারণ অভিনেতাদের মধ্যে পান-দোষেরই প্রাবল্য দেখা যেত। সেইজন্য ভদ্রলোকেরা মহিলাদের প্রায় নিয়ে আসতেন না রঙ্গালয়ে। কিন্তু 'সীতার বনবাসে'র অপূর্ব অভিনয়ের কথা শুনে ক্রমশঃ প্রচুর সংখ্যক মহিলা দর্শকের সমাগম হতে লাগল। 'সীতার বনবাস'ই প্রথম বাংলার মা জননীদের নাট্যশালায় অভিনয়-দর্শনে আগমনের জন্য সমস্ত দ্বিধা-সঙ্কোচের দ্বার উন্মুক্ত করে দিল।

কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর নাটক হওয়া সত্ত্বেও 'অভিমন্যুবধ' 'সীতাব বনবাসের' ন্যায় সর্বশ্রেণীর দর্শকগণের চিত্তজয়ে সমর্থ হ'ল না। 'অভিমন্যুবধ' নাটকটি বিয়োগান্ত নাটক বলেই দর্শক সমাজে পূর্ববর্তী নাটক 'সীতার বনবাসের' মত আদৃত হয়নি। পৌরাণিক নাটকের ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্র এই সর্ব প্রথম বিয়োগান্ত নাটকের অবতারণা করলেন। যে সময় মিলনান্ত যাত্রাভিনয় ও নাটক দেখতেই সকলে অভ্যস্ত এবং এই শ্রেণীর নাটকের প্রতি তাদের আন্তরিক সহানুভূতি বিরাজমান,—সেই যুগে প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধে বিয়োগান্ত নাটক রচনা করে গিরিশচন্দ্র একটা দুঃসাহসিকতার কাজ করেছেন বলা যায়। দর্শক সমাজও এই দুঃসাহসের প্রতিদান দিতে ভোলেনি, তাই নাটকটি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি।

যে নাটকে নানাবিধ দুঃখকর বিচ্ছেদমূলক ঘটনার শেষে মিলন সংঘটিত হয়, সেখানে নূতন ক'রে কোন মিলন দৃশ্য ঢোকানর প্রয়োজন হয় না। কারণ স্বাভাবিকভাবেই সে নাটক মিলনান্ত, যেমন 'হরিশ্চন্দ্র' নাটক। কিন্তু যে নাটকে মিল থাকত না বিচ্ছেদের মধ্যে বিয়োগের মধ্যেই যার পরিণতি, তাকে'ও জোর করে মিলনান্ত

করতে হ'ত। অভিমন্যুবধ নাটকের পরিণতি' মিলনের মধ্যে হতে পারে না, কিন্তু সক্রিয় সেই নাটকেও মিলন-দৃশ্য সংযোজিত করা হ'ত।

গিরিশচন্দ্র অতঃপর 'লক্ষ্মণ-বর্জন', 'সীতার বিবাহ', 'রামের বনবাস' 'সীতাহরণ' নাটক উপহার দিলেন নাট্য-ভারতীর পাদপদ্মে। চরিত্র-চিত্রণের গুণে, ভাষার সাবলীলতায় এবং শক্তিশালী অভিনয়-নৈপুণ্যে নাটকগুলি দর্শক সমাজকে আকৃষ্টও করেছে, কিন্তু বাংলা নাটক বা নাট্যশালার ক্ষেত্রে তেমন কোন বিশেষ উল্লেখযোগ্য অবদান এই নাটকগুলির নেই। তাই আমরা এই সকল নাটক সম্বন্ধে বিশেষ কোন আলোচনা করতে চাই না। গিরিশচন্দ্র সাধারণ রঙ্গালয়ের নাটকাভিনয়ের চলমান ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য অল্প সময়ের মধ্যে অনেক নাটক লিখেছেন—রঙ্গব্যঙ্গমূলক নাটিকা বা পঞ্চরঙ্ রচনা করেছেন, গীতিনাট্য প্রণয়ন করেছেন, কিন্তু এর মধ্যে বেশির ভাগই শূন্য স্থান পূর্ণ করার উদ্দেশ্যেই রচিত হয়েছিল। এর মধ্যে যখন তিনি যথেষ্ট সময় পেয়েছেন, চিন্তা করার অবসর পেয়েছেন, কেবল মাত্র তখনই জন্মলাভ করেছে মহান নাটকগুলি। সেই জন্য যে সমস্ত নাটকের বঙ্গীয় নাট্য আন্দোলনের ধারাকে পুষ্ট করার মত সম্পদ ছিল সেইগুলির সম্বন্ধেই আলোচনা করবার চেষ্টা করব।' ন্যাশনাল থিয়েটারে শেষ অভিনীত হয় 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' নাটক।

গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকগুলির ভীড়ে হারিয়ে যাওয়ার মত নাটক এটি নয় -ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যে অনায়াসে দৃষ্টি-আকর্ষণকারী নাটক এই পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস'—আপনশক্তিতে মহিমান্বিত অবিস্মরণীয়। গিরিশচন্দ্র যখন 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' লিখতে বসেছেন, তখন তাঁর লেখনী যথেষ্ট বলিষ্ঠতা অর্জন করেছে—সমস্ত ভয়-দ্বিধা-সঙ্কোচের অবসান হয়েছে। তাই নাটকের প্রায় প্রতিটি চরিত্র উজ্জ্বলরূপে রূপায়িত হয়েছে। সে সময় ন্যাশনাল থিয়েটারও

এক হিসাবে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান ছিল যে, 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' নাটকটির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চরিত্রগুলিকে প্রাণবন্ত করে তোলার মত প্রতিভাশালী অভিনেতৃগোষ্ঠী লাভ করেছিল।

গিরিশচন্দ্রের জীবনীকার অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বলেছেন যে, তখন যেন অভিনয় হত না --অভিনয়ের প্রতিযোগিতা হত। একথা সত্য। প্রত্যেক অভিনেতাই আপন আপন ভূমিকাটিতে কৃতিত্ব দেখাবার মত যথেষ্ট সুযোগ পেতেন।

একের পর এক অভিনেতা অভিনেতৃবর্গ রঙ্গমঞ্চে আসছেন এবং তাঁদের অপূর্ব আনন্দ-নৈপুণ্যে দর্শকচিত্তে উত্তেজনা ধাপে ধাপে উঠতে থাকে। ভীমরূপী অমৃতলাল মিত্র, দৌপদীর চরিত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী বিনোদিনী, এবং কীচকবেশী গিরিশচন্দ্র কীচক বধ অধ্যায়ে তাঁদের অনবদ্য অভিনয়-নৈপুণ্যে দর্শকচিত্ত জয় করে নিলেন এবং দর্শকগণের বিস্ময়, কৌতূহল ও উত্তেজনাকে এমন চরম পর্যায়ে নিয়ে এলেন যে, মনে হ'ল এর পব আর কারও অভিনয় দর্শকচিত্তে রেখাপাত করতে পারবে না। কিন্তু উত্তরের সঙ্গে গোধন রক্ষা-কল্পে যাত্রাকালে অর্জুনবেশী মহেন্দ্রলাল বসু এমন অপূর্ব অভিনয় প্রদর্শন করলেন যে, তাঁর যাদুস্পর্শে দর্শকমণ্ডলী অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ল। ক্ষুদ্র চরিত্রগুলিও শক্তিশালী নটের. প্রাণবন্ত অভিনয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা অর্জন করেছিল।

এই রকম সমবেত অভিনয়-উৎকর্ষ আজকের দিনে দুর্লভ। এই নাটকটির অভিনয় করা খুব সহজসাধ্য ছিল না, এই নাটক জমান খুব শক্ত ছিল; কারণ নাটকটি যদিও বিরাট পর্বের অন্তর্ভূত কাহিনীকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে, তাহলেও এই নাটকের মধ্যে দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন কাহিনী নাট্যিক ধারাতে বিন্যস্ত হয়েছে---একটি কীচকবধ-প্রসঙ্গ এবং অপরটি উত্তর ও গোধন উদ্ধার প্রচেষ্টা। গিরিশচন্দ্রের সুনিপুণ লেখনী এই দুই ভিন্ন ধারাকে সুন্দরভাবে একই সঙ্গমে মিলিত করে নাট্য পরিবেশকে রসমধুর করে তুলেছেন। এই

রকম দুটি কাহিনীর গঙ্গা-যমুনার ধারার প্রয়াগতীর্থ অন্য কোন নাটকে পূর্বে অথবা পরে লক্ষিত হয়নি।

গিরিশচন্দ্রকে ইতিপূর্বে কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাসের পুরোপুরি অনুসরণ করতে দেখা গেছে,-- মনে হয়েছে যেন তাঁদের কাব্যাংশেরই নাট্যরূপ দান করেছেন। কিন্তু 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' রচনাকালে গিরিশচন্দ্র নিজের উপর যথেষ্ট আস্থাশীল,—আত্মশক্তিতে তাঁর বিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধ। তাই পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস রচনায় তিনি কাশীরাম দাসকে সম্পূর্ণ অনুসরণ করেননি।

এই নাটকের অভিনয়ের পর অভিনেতাদের বেতনবৃদ্ধি ব্যাপার নিয়ে প্রতাপ জহুরীর সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় গিরিশচন্দ্র সদলবলে ন্যাশনাল থিয়েটারের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। দুই বৎসর কাজ করবার পর তিনি ন্যাশনাল থিয়েটার পরিত্যাগ করে তাঁর দলের কয়েক জনকে নিয়ে বিডন স্ট্রীটে যেখানে পরবর্তী কালে মনোমোহন থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেখানে গুর্মুখ রায়ের সহায়তায় ষ্টার থিয়েটার স্থাপনা করেন। তার দ্বারোদ্ঘাটন-কার্য সম্পন্ন হয় ১৮৮৩ সালের আগষ্ট মাসে (বাংলা ১২৯০ সালের ৬ই শ্রাবণ) তাঁর রচিত নাটক 'দক্ষযজ্ঞ'এর অভিনয় দ্বারা।

'দক্ষযজ্ঞের' দক্ষ চরিত্র গিরিশচন্দ্রের একটি অপূর্ব সৃষ্টি। বাংলা নাট্য সাহিত্যে সমতুল অন্য কোন চরিত্র খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। প্রথম অঙ্কের ২য় গর্ভাঙ্কে উদ্যানে দক্ষ চিন্তান্বিত, কিন্তু তা'র মধ্যেও একটা মহিমাব্যঞ্জক ভাব পরিস্ফুট। দক্ষের বিভিন্ন আচার-আচরণের মধ্যে বাস্তবানুগতার পরিচয় পাওয়া যায়। দক্ষরাজ প্রজাপতি—প্রজার প্রতি তাঁর যথেষ্ট স্নেহ, শিবের প্রতি তাঁর অসীম ঘৃণা এবং শিবকে অপমানিত করার একটা দুরন্ত বাসনা, দক্ষ-চরিত্রে এ সকলই সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। এই নাটকের পরিণতিও অতুলনীয় নাটকীয়তার চরমোৎকর্ষে দর্শকের হৃদয়ানুভূতিকে করে তোলে অশান্ত আবেগে সংক্ষুব্ধ, উদ্বেলিত। অভিনয়ের দিক্ থেকে যা' আমরা শুনেছি তা'

নূতন করে ব্যক্ত করার কোন প্রয়োজন নেই। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, অভিনয়-জগতে দক্ষ, শিব এবং সতী চরিত্রের অভিনয় —অবিস্মরণীয় খ্যাতি অর্জন করেছিল,—যে অভিনয়ের কথা স্বচক্ষে দেখলেও ঠিক মত প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। আমরা চাক্ষুষ না দেখলেও লেখার মধ্য দিয়ে একটা কল্পনা করতে পারি যে দক্ষের মত পুরুষ কঠিন, রমনীয় দৃঢ়তাসম্পন্ন একটি বিরাট পুরুষের চরিত্র—শক্তিশালী প্রতিভাধর অভিনেতা ব্যতীত অন্য কারোর জন্য গিরিশচন্দ্র সৃষ্টি করেন নি, আর তা'ছাড়া সাধারণ কারোর পক্ষে এই অসাধারণ চরিত্র রূপায়ণ সম্ভবও ছিল না। দক্ষযজ্ঞের মধ্যে আমরা দেখতে পাই গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক নাটকের বাঁধাধরা রীতিগুলিকে একে একে অতিক্রম করেছেন। পূর্বে দূতের ভূমিকা ছিল অতি নগণ্য—ভগ্নদূতের মত আসরে এসে দু'একটি শব্দ বা বাক্য উচ্চারণ করেই তা'র প্রস্থান। কিন্তু গিরিশচন্দ্র দক্ষযজ্ঞে দূতের ভূমিকাগুলিকেও চরিত্রের মর্যাদা দান করেছেন। দু'একটি কথা বলেই দূতের ভূমিকা শেষ নয়, সেই চরিত্রেও তিনি অভিনয়-নৈপুণ্য দেখাবার উপযুক্ত ক্ষেত্র রচনা করে গেছেন। দক্ষযজ্ঞে 'তপস্বিনী' গিরিশচন্দ্রের একটি অভিনব চরিত্র রূপায়ণ। এই নাটকে গিরিশচন্দ্র ছন্দের পরিবর্তন সাধন করে উচ্চ শ্রেণীর নাট্যত্বে এবং ভাবগাম্ভীর্যে নাটকখানি নাট্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেমন একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অবদান, মঞ্চ-সাফল্যের দিক দিয়েও 'দক্ষযজ্ঞ' নাটক সৌভাগ্যবান। তাই অনায়াসে অর্জিত হয়েছিল বিপুল জনপ্রিয়তার জয়মাল্য।

নাট্য প্রচেষ্টার দিক থেকে দক্ষযজ্ঞ যে শুধু যুগান্তর সৃষ্টি করেছিল তা নয়, নূতন মঞ্চ প্রতিষ্ঠা করে তাতে নবতম দৃশ্যপট সংযোজন করে তিনি বঙ্গীয় নাট্যশালায় মঞ্চসজ্জার বিশেষ উৎকর্ষ দেখিয়েছিলেন।

মঞ্চাচার্য জহরলাল ধর অতি উচ্চস্তরের দৃশ্যপট সৃষ্টি করেছিলেন এবং বিশেষ করে মায়া-সৃষ্টিকারী (Illusion Scenes) দৃশ্যপটগুলি দর্শক সমাজের পক্ষে এক অপূর্ব মোহের সৃষ্টি করেছিল।

'দক্ষযজ্ঞে'র পর গিরিশচন্দ্র 'ধ্রুবচরিত্র' ও 'নল দময়ন্তী' নাটক রচনা করেন এবং এই নাটকগুলিও ষ্টার থিয়েটারে সগৌরবে অভিনীত হয়। কিন্তু এই সময় সাধারণ রঙ্গালয়ের সম্মুখে পুনরায় নেমে এল কৃষ্ণ যবনিকা। অসুস্থতা এবং সামাজিক বিধি-নিষেধের জন্য স্বত্বাধিকারী গুমুঁখ রায় থিয়েটারটি বিক্রয় করতে উদ্যত হ'ন। গিরিশচন্দ্র তখন অমৃতলাল মিত্র প্রমুখ চারজন কর্তৃক সংগৃহীত অর্থদ্বারা রঙ্গালয়টি ক্রয় করে উক্ত চারজনকেই স্বত্বাধিকারী নির্বাচিত করেন। এইভাবে নূতন উদ্যমে পরিচালিত রঙ্গালয়ে একে একে গিরিশচন্দ্রের 'কমলে কামিনী', 'বৃষকেতু' ও 'হীরার ফুল' এবং 'শ্রীবৎস চিন্তা' নাটকের সাফল্যজনক অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ১৮৮৪ সালের ২রা আগস্ট স্টারে অভিনীত হ'ল গিরিশচন্দ্রের অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষর-বহনকারী যুগান্তকারী নাটক 'চৈতন্যলীলা'।

এরপর স্টার থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' অভিনীত হয় ১৮৮৬ সালের ১২ই জুন। বিল্বমঙ্গল ঠাকুর নাটকে রূপায়িত হয়েছে রূপজ প্রেম থেকে রূপাতীতের প্রতি প্রেমের ত্যাগ-বৈরাগ্যময় কাহিনী। প্রেম ভক্তি-বৈরাগ্য এবং দার্শনিকতার অপূর্ব সমন্বয় এই নাটক। নিখুঁত মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে প্রতিটি চরিত্র জীবন্ত এবং চিরভাস্বর। রসবেত্তার কাছে, দার্শনিকের কাছে, মনস্তাত্ত্বিকের কাছে, ভক্ত, প্রেমিক সকলের কাছেই বিল্বমঙ্গলের নাট্যরস সমান আকর্ষণীয়। গিরিশচন্দ্র ভক্তমাল গ্রন্থে সুরদাসের জীবনী পাঠ করে এই নাটক রচনা করতে প্রবৃত্ত হন নি, তিনি এই আখ্যান শুনেছিলেন তাঁর গুরুদেব ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমুখের বর্ণনা থেকে। রামকৃষ্ণদেবই গিরিশচন্দ্রকে তাঁর এই নাটকে একটি ভণ্ড সাধুর চরিত্র দেবার জন্য বলেছিলেন।

'বিল্বমঙ্গল' নাটকে সাধক চরিত্র-সৃষ্টির অনুপ্রেরণা গিরিশচন্দ্র এইভাবে পেয়েছিলেন। এই নাটকের অপূর্ব চরিত্র—'পাগলিনী'ও গিরিশচন্দ্রের বাস্তব অভিজ্ঞতাপ্রসূত। দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের

কাছে একটি পাগলী প্রায়ই যাওয়া-আসা করত। তার অদ্ভুত আচরণ সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র বহু কাহিনী শুনেছিলেন এবং সেই সকলেই মধ্যেই নিহিত ছিল গিরিশচন্দ্রের 'বিল্বমঙ্গল' নাটকের 'পাগলিনী' চরিত্রের মূলসূত্র। এই 'পাগলিনী নাটকটি সম্পূর্ণ বাস্তবানুগ, কোনও অবাস্তবতা এবং আদর্শ ও কল্পনার অনুরঞ্জন এই চরিত্র-পরিকল্পনায় লক্ষিত হয় না।

তবে এই পাগলিনী—সাধিকা পাগলিনী, কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী—তার সংগীতের মধ্যে তাই সাধনার বিকাশ ক্রম প্রকাশমান। এই পাগলিনী চরিত্র গিরিশচন্দ্রের একটি উল্লেখযোগ্য চিত্রায়ন।

'বিল্বমঙ্গল' নাটকের পর গিরিশচন্দ্রের 'বেল্লিকবাজার' ও 'রূপসনাতন', নাটক স্টারে অভিনীত হয়। এই সময় স্টার থিয়েটারের সামনে সঙ্কট দেখা দেয়। বিখ্যাত ধনী গোপাললাল শীল স্টার থিয়েটারের জমি ক্রয় ক'রে নিয়ে থিয়েটার বাড়ি ছেড়ে দেবাব নোটিশ দেন। অমৃতলাল বসু প্রমুখ স্টার থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ তখন তাঁকেই ঐ বাড়ি বিক্রয় করে দিয়ে হাতিবাগানের নিকট জমি ক্রয় করে নূতনভাবে স্টার থিয়েটারের প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন। গোপাল শীল পুরাণো স্টার থিয়েটারের এমারেল্ড থিয়েটার নামকরণ করলেন এবং অর্ধেন্দুশেখর প্রভৃতিকে নিয়ে থিয়েটার আরম্ভ করলেন। কিন্তু ঠিক তেমন জমে উঠলো না। তিনি তখন গিরিশচন্দ্রকে দলে আনবার চেষ্টা করতে লাগলেন। এককালীন প্রচুর অর্থদান এবং উচ্চ বেতন দেবার প্রস্তাব গিরিশচন্দ্রের কাছে আসে। গিরিশচন্দ্র প্রথমে প্রত্যাখান করলেও স্টার থিয়েটার গঠনে শিষ্যগণের সাহায্যের জন্য এ প্রস্তাবে পরে সম্মত হন। এমারেল্ড থিয়েটারে অভিনীত হয় গিরিশচন্দ্রের ছু'খানি নাটক—'পূর্ণচন্দ্র' এবং 'বিষাদ'। সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ নাটক 'পূর্ণচন্দ্র' এবং পুণ্যাত্মা সতী নারীর পবিত্র পতিভক্তিমূলক 'বিষাদ' নাটক দর্শক সমাজে যথেষ্ট আদৃত হয়েছিল।

এরপর গোপাল শীলের থিয়েটার করার সখ মিটে যায় এবং গিরিশচন্দ্রও তখন স্টার থিয়েটারের সঙ্গে পুনর্মিলিত হন।

এমারেল্ড থিয়েটারে থাকাকালীন গিরিশচন্দ্র কর্তৃক বেনামীতে রচিত 'নসীরাম' নাটক দিয়েই নব পর্যায়ের স্টার থিয়েটার উদ্বোধন হয়েছিল। চিন্তাশীল ভাবুক দর্শকের কাছে এই কাম-পরাভবকারী ভক্তিরসে সিঞ্চিত নাটকখানি খুবই আদরণীয় হয়েছিল; কিন্তু সাধারণস্তরের দর্শকের কাছে খুব সম্বর্ধনা লাভ করতে পারে নি।

'সরলা নাটকের সাফল্যজনক অভিনয়ে সামাজিক নাটকের চাহিদার বিষয় উপলব্ধি ক'রে এবং বন্ধুগণের সনির্বন্ধ অনুরোধে গিরিশচন্দ্র সামাজিক নাটক রচনায় ব্যাপৃত হন এবং তারই ফল— 'প্রফুল্ল' নাটক।

প্রফুল্ল নাটকের প্রতিটি চরিত্রই স্বাভাবিক। বর্তমান কালের অভিজ্ঞতার আলোকসম্পন্ন দৃষ্টির কাছে কোন কোন চরিত্র হয়ত অস্বাভাবিক মনে হ'বে, কিন্তু মাত্র ৫০।৫৫ বৎসর আগেকার মানুষের সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রাচীন লোকের কিছু কিছু অভিজ্ঞতা আছে, তাঁরা বিনা দ্বিধায় বলবেন যে, প্রফুল্ল নাটকের কোন চরিত্র-রূপায়নেই কল্পনার অতিরঞ্জন বা আতিশয্য-দোষ ঘটেনি, বরং চরিত্রগুলি প্রতিনিধি স্থানীয় হয়েছে।

পরিশেষে, আমাদের এই বলার কথা যে, চরিত্র-চিত্রণ, ঘটনা-সংস্থাপন, অন্তর্মুখীতা প্রভৃতির বিচারে গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকগুলি যে পর্যায়েই আসন লাভ করুক না কেন, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত কলকাতার সমাজের প্রমাণ্য দলিল চিত্ররূপে এই নাটকগুলির গুরুত্ব ও মূল্য কোন দিনই হ্রাস পাবে না। যদি তৎকালীন কলকাতার সমস্ত ইতিহাস কোন দিন লুপ্ত হয়ে যায়, তখন গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকগুলি কলকাতার ঐ সময়ের বাঙ্গালী সমাজের ইতিহাস সংকলনে যথেষ্ট সহায়ক হবে।

সামাজিক ইতিহাস আছে এবং আরও ইতিহাস হয়ত লিখিত হবে। কিন্তু কলকাতার সেই যুগের পারিবারিক জীবনের ইতিহাস বা চিত্র যদি দেখতে হয় তা'হলে গিরিশচন্দ্রের এই সব নাটকের দিকে অবশ্য দৃষ্টি নিতে হবে।

গিরিশচন্দ্র বহুমুখী প্রতিভা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তিনি একাধারে নাট্যকার—অভিনয়-শিক্ষাদাতা, নাট্য-সংস্কারক, আদর্শবাদী অধ্যাত্ম দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ। বাংলার নাট্যজগতের তাই তিনি পরিপুষ্ট করে যেতে পেরেছেন তাঁর নানা-বিষয়িণী প্রতিভার সমবেত প্রাচুর্যে। বিভিন্ন বিষয়ে বিচিত্র অভিজ্ঞতার ফলে গিরিশচন্দ্রের নাট্যকার-জীবন সার্থক হয়ে উঠেছিল। তিনি ছিলেন অভিনেতা—দর্শকদের হৃদয়-নদীর জোয়ার-ভাঁটার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল ঘনিষ্ঠ।

তাই তাঁর নাটকে সন্ধান পাওয়া যায় জনচিত্তগ্রাহিতার বহুবিধ উপাদান। তাই তাঁর নাটকগুলি বিস্ময়করভাবে মঞ্চসফল। পৌরাণিক, ধর্মমূলক, সামাজিক, ঐতিহাসিক সকল শ্রেণীর নাট্যপথেই গিরিশচন্দ্রের পদক্ষেপ ঘটেছে এবং কৃতী অভিযাত্রী হিসাবে তিনি লাভ করেছেন যশের গৌরব কিরীট। ইটালিয়ান অপেরার ধরণে গীতিনাট্য-রচনাও গিরিশচন্দ্রের কৃতিত্বের পরিচায়ক। পূর্বেই আমরা গিরিশচন্দ্র-রচিত বিভিন্ন ধারার উল্লেখযোগ্য নাটকগুলির আলোচনা-প্রসঙ্গে তাঁর ঐ সকল বিভাগে বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছি। গিরিশচন্দ্র প্রথমে ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেছিলেন, কিন্তু তেমন কোন বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর রেখে যেতে পারেনি সে নাটক। তিনি তাঁর 'পৌরাণিক নাটক' প্রবন্ধে এক জায়গায় বলেছেন—

"হিন্দুস্থানের মর্মে মর্মে ধর্ম। মর্মাশ্রয় করিয়া নাটক লিখিতে হইলে ধর্মাশ্রয় করিতে হইবে।"

এই সত্য গিরিশচন্দ্র তাঁর 'আনন্দ রহো' নাটকের ব্যর্থতার পর উপলব্ধি করেছিলেন এবং আদর্শ ও ধারণা নিয়ে সেই সময় তাঁর যে পৌরাণিক নাটকগুলি লিখিত হয়েছিল সেগুলি সাফল্যের সিংহদ্বার

একে একে অতিক্রম ক'রে গৌরবতীর্থে পৌঁছতে পেরেছিল। গিরিশচন্দ্রের নাট্যশৈলীতে দেশী ও বিদেশী, বাংলার নিজস্ব সাহিত্য ও সংস্কৃতির আদর্শ এবং সেক্স্পীরয় নাট্যবৈশিষ্ট্যের দুই ধারার মিলন সংঘটিত হয়েছিল। তাই একদিকে যেমন তাঁর উপর পড়েছিল বাংলার যাত্রা, কবিগান, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত পুরাণ প্রভৃতির প্রভাব—অন্যদিকে তেমনি পাশ্চাত্য দেশের মহাকবি সেক্স্পীয়ারও তাঁর ভাব-কল্পনায় অনেকখানি স্থান অধিকার করেছিলেন।

নটগুরু, নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্রের অবদানের কথা নাট্যরসিক বাঙ্গালী কোনদিনই বিস্মৃত হবে না—চিরদিনই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে এবং যুগস্রষ্টা নাট্যরথীকে উপহার দেবে হৃদয়ের অকুণ্ঠ প্রীতি-অর্ঘ্য।

গিরিশচন্দ্র অশেষ সৌভাগ্যবান নাট্যকার। তাই জীবিতকালেই তাঁর ভাগ্যে ঘটেছিল যশোমাল্যলাভ। নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাব কালে ন্যাশনাল ও বেঙ্গল থিয়েটার এই দু'টি নাট্যশালার পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক অস্তিত্ব বিরাজমান ছিল,—কিন্তু পরে তাঁর জীবদ্দশাতেই বাংলা দেশে ৪টি রঙ্গালয় একসঙ্গে সাফল্যজনকভাবে পরিচালিত হয়েছিল। প্রতিটি রঙ্গালয় তখন গিরিশচন্দ্রের হাতে-গড়া শিষ্য-প্রশিষ্যে পরিপূর্ণ। গিরিশচন্দ্রের নাট্যরীতির তখন প্রবল প্রতিপত্তি।

১৯০১ সালে বেঙ্গল থিয়েটারের অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের নাট্যধারায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোন অস্তিত্বই বাংলা দেশে আর দেখা যায়নি। গিরিশচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য তখন অপ্রতিদ্বন্দ্বী—প্রবল প্রতাপান্বিত, একচ্ছত্র সম্রাট। গিরিশচন্দ্রের সমসাময়িককালে বাংলা দেশে নাটকের খুবই অভাব। মাইকেল, দীনবন্ধুর মুষ্টিমেয় নাটকগুলির পুনরাবির্ভাব হয় বারে বারে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিকেই নাটকায়িত করে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের নাটকের দৈন্য মেটাবার চেষ্টা করা

হয়। অপ্রত্যাশিতভাবে গিরিশচন্দ্র এই সময় বাংলা নাট্যজগতে দেখা দিলেন সৃজনী শক্তির প্রসূতিরূপা প্রয়োজনীয়তার তাগিদে, অনেকটা বাধ্য হ'য়েই নাট্যরচনায় প্রবৃত্ত হয়ে গিরিশচন্দ্র ক্রমে ক্রমে তাঁর অসাধারণ নাট্যসম্ভার উপহার দিলেন বঙ্গীয় নাটকগুলির পাদপদ্মে। উষর নাট্যক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্র বহালেন বহু নাটকের মালাকনী-ধারা—বাঙ্গালী নাট্যামোদীর তৃষ্ণা মিটে গিয়ে স্নিগ্ধ শীতল বারিরাশিতে এই অনুর্বর ক্ষেত্র উর্বর হ'ল, ও পরবর্তীকালে ভ'রে গেল বহু শক্তিশালী ও উৎকৃষ্ট সোনার ফসলে।

গিরিশোত্তর যুগের অন্যতম শক্তিশালী নাট্যকার রূপে বাংলার নাট্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হ'লেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। তাঁর নাট্যপ্রতিভার যাদুস্পর্শে সজীব নাটকগুলি অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল এবং মঞ্চ-সাফল্যের দিক্ দিয়ে ইতিহাস-সৃষ্টিকারী। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম প্রয়াস প্রহসনগুলির মধ্যে রূপায়িত হয়ে ওঠে। রঙ্গ-ব্যঙ্গ, হাসির গান ও নির্দোষ পরিশুদ্ধ কৌতুক রসের উচ্ছ্বাসে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসনগুলি উদ্বেলিত হয়ে ওঠায় জনগণচিত্তে অনাবিল হাস্যরসের ধারাকে উৎসারিত করে দিতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু তাঁর প্রহসনগুলিতে প্রধান ভূমিকা তাঁর বহু খ্যাত হাসির গানগুলির। এই হাস্যরসাত্মক অনবদ্য গানগুলি দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসনগুলিকে যথেষ্ট পরিমাণে রসায়িত করে তুলেছিল। 'কল্কি অবতার' তাঁর প্রথম প্রহসন। আঘাত-বিহীন পরিহাসের সহায়তায় তিনি ব্রাহ্ম, নব্যতন্ত্রীহিন্দু, বিলেত ফেরৎ, প্রাচীন ও নবীনপন্থী এবং রক্ষণশীল সমাজের সকলের ত্রুটিবিচ্যুতি সংশোধনের জন্য চেষ্টিত হয়েছেন। কোথাও কোন আক্রমণ বা আক্রোশমূলক কটাক্ষ-পাত এই প্রহসনে দৃষ্ট হয় না। দ্বিজেন্দ্রলালের 'বিরহ' নামক প্রহসনের কৌতুক-রসাশ্রিত কাহিনী বিশুদ্ধ ও উচ্চাঙ্গের রস পরিবেশনে অমলিন সৌন্দর্যে মণ্ডিত। 'ত্র্যহস্পর্শ', 'প্রায়শ্চিত্ত', 'পুনর্জন্ম', 'আনন্দবিদায়'

প্রভৃতি কয়েকটি প্রহসন-রচনার মাধ্যমে দ্বিজেন্দ্রলাল হাস্যরসের প্রবাহ বহাতে চেষ্টা করেছেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্য-প্রতিভা দ্বিতীয় স্তরে রচিত হয়েছে পৌরাণিক নাটকাবলী। দ্বিজেন্দ্রলালের এ জাতীয় নাটকগুলি গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের ন্যায় অসাধারণ সাফল্য অর্জন করতে পারে নি। তার কারণ পৌরাণিক পরিবেশ সৃষ্টিতে তিনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন।

পুরাণকে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর যুক্তিবাদী বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টির আলোকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন, কিন্তু সেইখানেই তাঁর ব্যর্থতার বীজ নিহিত। পৌরাণিক নাটকে গিরিশচন্দ্রের ন্যায় তিনি ভক্তিরস ও আধ্যাত্মিক ভাববন্যা বহাতে পারেন নি। অলৌকিক ভাব-জগতকে বাস্তব জগতের দ্বন্দ্বময় মানবীয় পরিবেশে রূপায়িত করিতে উদ্যোগী হয়েছেন নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল। এইরূপে ভাবভাষা ও পরিবেশ কোন দিক দিয়েই দ্বিজেন্দ্রলালের পৌরাণিক নাটক সত্যকার আধ্যাত্মিকতা মণ্ডিত পৌরাণিক হয়ে উঠতে পারে নি।

প্রথম পৌরাণিক নাটক 'পাষাণী'তে অহল্যা ও ইন্দ্র চরিত্র বাস্তব জগতেরই অনুরূপ সম্পূর্ণ রক্ত মাংসের মানুষে পরিণত হয়েছে। কামনা-মলিন, নির্লজ্জ এই নাটকের পৌরাণিক চরিত্রগুলির মহিমাকে অনেকাংশে ক্ষুণ্ন করেছে। 'সীতা' বা 'ভীষ্ম' কোন নাটকই সফল পৌরাণিক ভাবগাম্ভীর্যে মণ্ডিত হয়ে উঠতে পারে নি।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্য-প্রতিভার স্ফুরণের তৃতীয় স্তরে আমরা দেখেছি পরিণত উজ্জ্বলদীপ্তি—তাঁর ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে।

'প্রতাপসিংহ', 'দুর্গাদাস' প্রভৃতি নাটকের মধ্য দিয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাট্যশৈলী ক্রমবিকাশ লাভ করেছে। জাতীয় ভাবোদ্দীপক দেশপ্রেমমূলক ধ্যান-ধারণা তাঁর এই সকল নাটকের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠে ছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের দেশপ্রেমমূলক সংগীতগুলি জাতীয় সংগীতরূপে বাংলার নরনারীর কণ্ঠে গীত হয়েছে।

শুধু বাংলার নাট্য-সাহিত্যে কেন, বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের অমূল্য সম্পদরূপে এই সকল গান দ্বিজেন্দ্রলালকে বাঙ্গালীর কাছে সার্থক গীতিকার রূপে অমর করে রাখবে।

'নুরজাহান' দ্বিজেন্দ্রলালের একটি অমর নাট্যসৃষ্টি। নুরজাহানের ব্যথা মৌন অন্তরের তপ্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস বেদনাতুর পরিবেশন সৃষ্টি করেছে। ঐশ্বর্য ও ক্ষমতায় গর্বোদ্ধত উন্নত মস্তক পরিশেষে অবনত হ'ল কন্যার করুণা ও মমতাপূর্ণ স্নেহ-ভালবাসার সাহায্যে। করুণ রসাত্মক এই নাটকখানি বেদনাভারাক্রান্ত করে তোলে দর্শকের রসচিত্তকে। যদিও 'মেবারপতন' নাটকের পর রচিত হয়েছে 'সাজাহান' নাটক, কিন্তু তাহলেও আমরা এই নাটকখানির সম্বন্ধে পূর্বেই কিছু আলোচনা করতে ইচ্ছুক; কারণ 'সাজাহান' দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠ নাটকরূপে অবিসংবাদিতভাবে গণ্য হয়ে থাকে। এই 'সাজাহান' নাটক শুধু বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসেই নয়, বিশ্বের নাট্যদরবারেও সম্মানীয় স্থানের অধিকারী, অপূর্ব চরিত্র-চিত্রণে দূর-দূরান্তে ক্রিয়াশীল শিথিল ঘটনাগুলিকে এক সুদৃঢ় গ্রন্থিতে আবদ্ধ-করণে, সুগভীর অন্তর্দ্বন্দ্বে, ঘাত-প্রতিঘাতের ক্রমোচ্চতায়, মহান্ আদর্শের অনুরঞ্জনে—'সাজাহান' নাটকখানি সহৃদয়-হৃদয়-সংবেদ্য হয়ে উঠেছে।

গিরিশ-যুগের আর একজন প্রতিভাশালী ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। তিনিও বাংলার নাট্যস্রোতস্বিনীকে অজস্র ধারায় পুষ্ট করতে এগিয়ে এসেছিলেন। ক্ষীরোদপ্রসাদের রূপকথার কাহিনী-আশ্রিত-নাটক, পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক নাটক সমূহ সম্পর্কে আলোচনার অনেক কিছু আছে। কিন্তু সে চেষ্টা থেকে আমরা আপাততঃ বিরত থাকবো—কারণ তা সময়সাপেক্ষ এবং একটি সম্পূর্ণ নূতন প্রবন্ধ গ্রন্থে সেই আলোচনা করা সম্ভব—এই অল্প পরিসরে তা সম্ভব নয়।

তাই আমরা ক্ষীরোদপ্রসাদের নাট্য-শৈলীর বৈশিষ্ট্য, বাংলা

নাট্যসাহিত্যে তাঁর অবদান এবং তাঁর পৌরাণিক নাটকে গিরিশচন্দ্রের প্রভাব সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলবার চেষ্টা করবো।

ক্ষীরোদপ্রসাদকে আমরা এক কথায় রোমান্টিক ধর্মী নাটক-রচয়িতারূপে যদি অভিহিত করি, তাহ'লে তা খুব অসমীচীন হবে না। ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, রূপকথাশ্রয়ী প্রায় সমস্ত শ্রেণীর নাটকগুলির মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে ক্ষীরোদপ্রসাদের রোমান্স-প্রিয় কল্পনাবিলাস কবি-মানস। সম্ভাব্যতা ও বাস্তবানুগতা তাঁর নাটকে খুব কম, কারণ তাঁর নাটকগুলির মধ্যে চলেছে দূরপ্রসারী রোমান্টিকতার লীলাবৈচিত্র্য। পৌরাণিক নাটকে গিরিশচন্দ্রের ন্যায় ভক্তি-ভাবের অত উচ্ছ্বাস ছিল না—ভক্তিকে তিনি যুক্তি বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে নাটকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছেন। ভক্তি, যুক্তি, কল্পনাবিলাস একত্র মিশ্রিত হয়ে অভিনব রূপ পরিগ্রহ করেছে ক্ষীরোদ-প্রসাদের পৌরাণিক নাটকগুলিতে—'নরনারায়ণে'র মধ্যে এই রীতির পূর্ণ সার্থকতা লাভ হয়েছে।

বাংলা নাট্য-সাহিত্যের একটি অমূল্য এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী সৃষ্টিরূপে নর-নারায়ণ চিরদিন বাঙ্গালী নাট্যরসিক কর্তৃক কীর্তিত হ'য়ে থাকবে।

ঐতিহাসিক নামধেয় 'আহেরিয়া' নাটকে বংশানুক্রমিকতার সত্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে অস্বীকার করে ক্ষীরোদ-প্রসাদ যৌক্তিকতা বিসর্জন দিয়েছেন। তাই এই নাটককে রূপকথার কাহিনী বলে অনেক সময় ভ্রম হয়।

সুপ্ত বংশগরিমা ও পরিবারগত ঐতহ্য একদিন না একদিন সমস্ত প্রতিবন্ধকতা ভেদ করে মানুষকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করবে ;—এই মতবাদ ক্ষীরোদপ্রসাদের অন্যান্য কয়েকটি নাটকেও প্রচারিত হয়েছে। 'রত্নেশ্বরের মন্দিরে' নাটকটির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়।

'চাঁদবিবি' নাটকের মধ্যেও অধিক স্থান দখল করেছে অনৈতিহাসিক লোকশ্রুতিমূলক ও রোমান্টিক কাহিনী।

স্বদেশপ্রেমের বাণী ও জাতীয়তাবোধ সন্নিবেশিত হয়েছিল ক্ষীরোদ-প্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য' নাটকের মধ্যে।

আধুনিক স্বাদেশিকতার উদ্দীপনাময় সুর এই নাটকে ঝঙ্কৃত হ'য়ে ওঠায় বাংলার নাট্যামোদী জনসাধারণের হৃদয়জয়ে সমর্থ হয়েছিল 'প্রতাপাদিত্য' নাটক। কিন্তু নাটকের মূল্য-বিচারে এর স্থান খুব উচ্চ নয়। অসংযত কল্পনার উচ্ছ্বাসে নাটকটি হারিয়েছে তার ঐতিহাসিকতা এবং নাটকীয় মর্যাদা। কোন কোন চরিত্র রূপায়িত হয়েছে বিকৃতভাবে, আবার কোন চরিত্র রয়ে গেছে অপরিণত—অপরিস্ফুট।

ক্ষীরোদপ্রসাদের 'রঘুবীর' নাটক ঐতিহাসিক পটভূমিতে রচিত হলেও ইতিহাসের সঙ্গে এর সম্পর্ক অতি ক্ষীণ। অতি নাট্যিক রোমাঞ্চকর পরিস্থিতিই এর মধ্যে মুখ্য হয়ে উঠেছে। কাহিনীর মধ্যে ঘটনা বিন্যাসের যথার্থ না থাকায় অত্যন্ত শিথিল হয়ে পড়েছে নাট্যগ্রন্থি। রঘুবীর-চরিত্রই এই নাটকেব মধ্যে প্রধান চরিত্র এবং এই চরিত্রটি অনেকটা বিকাশ লাভ করেছে। রঘুবীর-চরিত্রে দুই সংস্কারের দ্বান্দ্বিক রূপ পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে। একদিকে বংশানুক্রমিকতার সংস্কার, অন্যদিকে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্য দিয়ে অর্জিত শিক্ষার সংস্কার।

'আলমগীর' ক্ষীরোদপ্রসাদের একটি জনপ্রিয় ও শক্তিশালী নাট্যসৃষ্টি। আলমগীর চরিত্র তাঁর স্মরণীয় অবদান। আলমগীরের অন্তর্মুখী জীবনের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করার চেষ্টা করেছেন নাট্যকার। সম্রাটের বহির্জীবন ও অন্তর্জীবনের রসঘন এবং মনস্তাত্ত্বিক পরিচয় অপূর্ব মহিমায় অভিব্যক্ত হয়েছে। আলমগীর একদিকে যেমন বজ্রাদপি কঠোরানি, অন্যদিকে আবার মৃদুনি কুসুমাদপি। একদিকে নির্মম নিষ্ঠুর, অন্যদিকে দুর্বল, শিশুর ন্যায় অসহায়। আলমগীর চরিত্রের এই অচিন্ত্যনীয় দ্বন্দ্বময় স্বরূপ অতি সুন্দরভাবে রূপায়িত হয়েছে ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকের মধ্যে। উদিপুরী চরিত্রটি এই

নাটকের একটি উল্লেখযোগ্য সু-অঙ্কিত চরিত্রসৃষ্টি। আলমগীর চরিত্রের বিকাশে উদিপুরীর অংশ বড় কম নয়।

ক্ষীরোদপ্রসাদের একটা নিজস্ব জীবনদর্শন ছিল– সত্যাশ্রয়ীর শক্তি অজেয়, অদম্য। এই সত্যের আদর্শ-গ্রহণকারীর সংঘাতময় জীবনের প্রতিচ্ছবি ক্ষীরোদপ্রসাদের বিভিন্ন নাটকে প্রতিবিম্বিত হয়েছে 'রঘুবীরে'র মধ্যে। 'আলমগীর' নাটকে,– 'নরনারায়ণ'-এ কর্ণচরিত্রের পরিণতিতে, 'গোলকুণ্ডা'য় আবুলহাসান, 'রঞ্জাবতী'তে দলু সর্দারের চরিত্রে– সর্বত্রই ক্ষীরোদপ্রসাদের নিজস্ব জীবন-দর্শনের স্পন্দন শোনা যায়।

ক্ষীরোদপ্রসাদের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির মধ্যে তাঁর পৌরাণিক নাটক 'নরনারায়ণ' বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী এবং বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসের কালজয়ী মর্যাদায় ভূষিত। ভীষ্ম, সাবিত্রী প্রভৃতি পৌরাণিক নাটক দর্শকগণের নিকট আদৃত হ'লেও সার্থক হয়ে উঠতে পারে নি। কিন্তু গিরিশোত্তর যুগে পৌরাণিক নাটকের মধ্যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল সার্থক নাটক 'নরনারায়ণ।

গিরিশ-যুগে গিরিশ-শিষ্য শক্তিধর নাট্যরথী অমৃতলাল বসুর আবির্ভাব ঘটেছিল বাংলা নাট্যসাহিত্যের লঘু, তরল হাস্যরসাত্মক দিক্‌টিকে পুষ্ট করে তোলার জন্য। জীবনের গুরুগম্ভীর, উচ্চভাবপূর্ণ দিকে তেমন পরিচালিত হয় নি তাঁর কৌতুকরসোচ্ছল নাট্যরথ। গিরিশচন্দ্রের মধ্য দিয়ে বাংলা নাট্যসাহিত্য লাভ করেছে গভীর ভাবসমৃদ্ধ উচ্চাঙ্গের নাট্যসম্ভার। জীবনের তরল লঘু চপল অধ্যায়ের পরিচয় তাঁর প্রতিভার আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠবার অবকাশ পায় নি। অবশ্য তিনি কয়েকটি পঞ্চরঙ্‌ রচনা করেছিলেন একথা ঠিক, কিন্তু বাংলা নাট্যধারায় কোন উল্লেখযোগ্য অবদান বলে সেগুলিকে গণ্য করা হয় না।

অমৃতলাল এলেন কৌতুকরস-সৃষ্টির শক্তি নিয়ে, রঙ্গে-ব্যঙ্গে, বুদ্ধিদৃপ্ত বাগ্‌বৈদগ্ধে হাস্যরসের স্নিগ্ধ, আনন্দময় স্রোতধারা প্রবাহিত

করলেন তিনি বাংলার নাট্যাঙ্গনে। তাই তাঁর পরিচয়—'রসরাজ অমৃতলাল'।

অমৃতলাল বসুর প্রতিভা ছিল গিরিশচন্দ্রের ন্যায় বহুমুখী। তিনি ছিলেন একাধারে নাট্য-ব্যবস্থাপক, অভিনয়-শিক্ষাদাতা, অভিনেতা ও নাট্যগুরু। ষ্টার থিয়েটার যে একদিন সৌভাগ্যের উচ্চতম শীর্ষে উন্নীত হয়েছিল, তার প্রধান কৃতিত্ব অমৃতলালের।

নাটক-প্রযোজনার শক্তি ছিল তাঁর অসামান্য। মঞ্চে নাট্য-উপস্থাপনায় দৃশ্যপট, সাজসজ্জা ও অন্যান্য বস্তুর বাস্তবানুগতার দিকে তাঁর ছিল সদা জাগ্রত দৃষ্টি। যেমন জিনিস ঠিক তেমনভাবেই তিনি রূপায়িত করতে চেষ্টা করতেন, এজন্য প্রচুর অর্থ ব্যয়েও তিনি কুণ্ঠিত হতেন না।

এই বিষয়ে তিনি গিরিশচন্দ্রকে অনেকটা অতিক্রম করে গেছেন। গিরিশচন্দ্র খ্যাতিমান নাট্য-পরিচালক হ'লেও এই সকল খুঁটিনাটি বিষয়ে অনেক সময় দৃষ্টিক্ষেপ করেন নি।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, সেই সময় বাংলার নাট্যশালায় ছিলেন তিনজন শক্তিশালী নাট্য-প্রযোজক—তাঁরা হ'লেন গিরিশচন্দ্র, অর্ধেন্দুশেখর ও অমৃতলাল। গিরিশচন্দ্রের মধ্যে ছিল ধৈর্যের অভাব। তিনি দৃশ্যপট, সাজসজ্জা ইত্যাদি সব বিষয়ে লক্ষ্য দিতেন বটে, কিন্তু তত গভীর ভাবে নয়। অভিনয়-শিক্ষাদান কালে তিনি অভিনেতাদের নিজেদের ধারাটাকেই বজায় রেখে কিছু কিছু সংশোধন করে দিতেন—তা'দের নিয়ে প্রচুর খেটে আমূল পরিবর্তনের চেষ্টা তিনি করতেন না। অর্ধেন্দুশেখর অন্য সব দেখলেও বিশেষ জোর দিতেন চরিত্রগুলিকে তৈরি করার জন্য। ছোট ছোট ভূমিকার অভিনেতাদের শেখাতে গিয়ে তিনি নাছোড়বান্দার মত লেগে থাকতেন এবং বহু সময় দিতেন। এর ফলে অনেক সময় বড় ভূমিকাগুলি ব্যর্থ হয়ে যেত।

অর্ধেন্দুশেখর তাই প্রযোজক হিসাবে খুব সাফল্য লাভ করতে

পারেন নি। প্রযোজক হিসাবে অমৃতলাল ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। নাট্য-ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নিজস্ব মতবাদে আস্থাশীল দৃঢ়চেতা পুরুষ ছিলেন অমৃতলাল। তাঁর সুদৃঢ় ও অনমনীয় মনোভাবের জন্যই তৎকালের রঙ্গালয় দর্শকগণের অসংযত চাপল্য ষ্টার প্রেক্ষাগৃহকে কখনই কোলাহল-পূর্ণ পরিণত করতে পারেনি।

অমৃতলালের নাট্য-বৈশিষ্ট্য বিচার-প্রসঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্রের আলোচনা হয়ত কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হতে পারে, কিন্তু নাট্যকারের ব্যক্তিগত প্রবণতা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাঁর সৃষ্টিকে যে প্রভাবিত করে থাকে—একথা অনস্বীকার্য্য। অমৃতলালের নাট্যরীতিতে উপলব্ধি করার পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক হবে বলেই আমরা এখানে তাঁর বিশিষ্ট মনোবৃত্তির কিছুটা পরিচয় দিতে চেষ্টা করছি।

অমৃতলালের প্রায় অধিকাংশ নাটকই প্রহসন—হাস্যরসাত্মক, ব্যঙ্গ ও কৌতুকাশ্রিত এবং কিছু কিছু বা গিরিশচন্দ্রের পঞ্চরঙ্ জাতীয়।

সমকালীন সমাজের ছায়া প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর প্রহসনগুলির মধ্যে। যুগের হাওয়া অনুযায়ী তিনি রঙ্গ-ব্যঙ্গের শাণিত শর নিক্ষেপ করেছেন। তাতে হুলের আঘাতের সঙ্গে মধুও উৎসারিত হয়েছে—কাঁটার ক্ষতের সাথে সাথে এসেছে মিষ্ট সৌরভ। তাঁর প্রহসনের অভিনয় দেখে অনেকে আনন্দ পেয়েছেন, হাস্যরোলে উচ্চকিত হয়ে উঠেছে প্রেক্ষাগৃহ, আবার কেউ কেউ কিছুটা বিরক্ত হ'য়ে চলে গেছেন। এতেই উপলব্ধি করা যায় তাঁর রচনার মধ্যে যথেষ্ট শক্তি ছিল এবং তা হয়ে উঠেছিল সার্থক। তাই সেই প্রহসনগুলির পক্ষে জনচিত্তকে দোলায়িত করা সম্ভব হয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের মধ্যে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল, তার প্রতিফলন দেখা যায় অমৃতলালের প্রহসনের মধ্যে। এক দিকে ভারতীয় সনাতন সংস্কারাচ্ছন্ন রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ, অন্য দিকে পাশ্চাত্য

ভাবধারায় অনুপ্রাণিত প্রগতিশীল নবীন সমাজ;—এক দিকে বৃদ্ধস্থবির অচলায়তন, অপর দিকে প্রাণবন্যায় উদ্বেলিত অসংযত উদ্দাম আবেগ।

অমৃতলালের নাটকগুলিতে বেশ সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে দুই যুগের দ্বান্দ্বিক রূপ। আজ কেন, একশ বছর পরেও নাট্য-সমালোচকগণ এর মধ্যে যুগমানসের সংঘাতময় চিত্ররূপ আবিষ্কার করতে পারবেন।

প্রশ্ন জাগে অমৃতলালের নাটক কি তৎকালীন সমাজের সর্বাঙ্গীন ছবিকে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিল, না তার মধ্যে কেবলমাত্র তাঁর দেখা উত্তর কলকাতার বিশেষ সমাজের সংকীর্ণ অভিজ্ঞতাই মূর্ত হয়ে উঠেছিল; বৃহত্তর বাঙ্গালী সমাজের ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের আভাস বলে সন্দেহ করাটা ঠিক যথার্থ হবে না, কারণ আজ থেকে ৬০ বৎসর পূর্বেকার কলকাতার সম্বন্ধে যাঁদের ধারণা আছে, তাঁরা একথা ভাল ক'রেই জানেন যে, তখনকার কলকাতার সমাজ বলতে বোঝাত উত্তর কলকাতার সমাজকেই। সুতরাং কলকাতার সমাজের রূপ আঁকতে গিয়ে উত্তর কলকাতার সমাজকে রূপায়িত করা হলে তা খুব অন্যায় হ'বে না। তাতেও প্রশ্ন উঠতে পারে কলকাতার সমাজই তো আর সমগ্র বাংলার সমাজ নয়; সারা বাংলার সমাজ-চিত্রের সামগ্রিক রূপ এর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় নি। এ কথা প্রণিধানযোগ্য যে কলকাতা ছিল তখন সারা ভারতের রাজধানী, দেশের প্রাণকেন্দ্র। নবাগত পাশ্চাত্য সংস্কারের যা কিছু দ্বন্দ্ব তা কলকাতাতেই প্রথম অনুভূত হয়েছে। তাই কলকাতার সমাজ-চিত্রের মধ্যেই এ দ্বন্দ্বের রূপ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। পরে এই তরঙ্গোচ্ছ্বাস পল্লীগ্রামের সীমানাতে ছড়িয়ে পড়ে। যাই হোক, অমৃতলালের প্রহসনের মধ্যে আমরা প্রাচীন সনাতন পন্থার সমর্থনের আভাস পাই।

অমৃতলালের নাট্যরীতিতে satire বা তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের মাধ্যমে কৌতুক রস সৃষ্টির প্রয়াস দেখা যায়। 'বিবাহ-বিভ্রাট', 'বাবু',

'একাকার', 'বৌমা', 'তাজ্জব ব্যাপার' 'কালাপাণি' ইত্যাদি প্রহসনের মধ্যে পাশ্চাত্য ভাবধারার অনুকরণকারী নব্য সমাজের বিভিন্ন আচরণ ও কার্যধারাকে এবং বিধবা-বিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা ও স্বাধীনতা, জাতিভেদ-অস্বীকারের প্রচেষ্টা প্রভৃতির উদ্দেশ্যে ব্যঙ্গবিদ্রূপ বর্ষণ করেছেন সনাতনপন্থী অমৃতলাল, এবং এই সকলের মধ্য দিয়ে সমকালীন রক্ষণশীলতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

Satire-এর তীব্র আঘাত শ্রেণী-বিশেষকে বিড়ম্বিত ক'রে অন্যান্যের মধ্যে হাস্যরস সৃষ্টি ক'রে থাকে তাই সেখানে আঘাতে-জর্জরিত শ্রেণী ঠিকমত হাস্যরসকে আস্বাদ করা থেকে বঞ্চিত হয়। তাই অমৃতলালের অনেকগুলি প্রহসন সার্বজনীন হাস্যরসের উৎস হয়ে উঠতে পারে নি। কিন্তু তাঁর কয়েকটি নাটক এই ত্রুটি থেকে মুক্ত। সেগুলির মধ্যে নির্মল হাস্যরসের মাধুর্য উৎসারিত হয়েছে—সেখানে জ্বালা নেই, আছে মধুর, কোমল, হাস্য-রসের লঘু চপলতা।

'খাস-দখল' নাটকখানি অমৃতলালের একটি স্মরণীয় নাট্যসৃষ্টি। এই নাটকখানিকে Comedy of Manners জাতীয় বলা চলে। নিখুঁত সমাজ-চিত্র এই নাটকের মধ্যে উৎকীর্ণ হয়েছে, তবে তাতে একেবারে অতিরঞ্জন যে ছিল না তা বলব না। এই জাতীয় নাটকে অতিরঞ্জন মেনে নেওয়া হয়েছে সর্বদেশে।

অমৃতলালের অনন্যসাধারণ বাগ্‌বৈদগ্ধ্য 'খাস-দখল' নাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কথার খেলায়, ধ্বনি-মাধুর্যে ও শব্দঝঙ্কারের মধ্যে দিয়ে অপূর্ব মায়াজাল রচনা ক'রে শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করার যাদু ছড়িয়ে রয়েছে অমৃতলালের 'খাস-দখল' নাটকে।

গিরিশচন্দ্রের আদর্শ অনুসরণ করে অমৃতলাল 'আদর্শ বন্ধু' নাটক রচনা করেন। গৈরিশ ছন্দের অক্ষম ব্যবহার, গিরিশচন্দ্রের ন্যায় বিদূষক চরিত্র-সৃষ্টি প্রভৃতির মধ্যে নাট্য-সম্রাট গিরিশচন্দ্রকে অনুসরণের প্রয়াস স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু নাটকীয় উপাদান

থাকা সত্ত্বেও তার যথাযথ ব্যবহার না করার জন্য নাটকখানি সার্থক হয়ে উঠতে পারে নি।

অমৃতলালের পৌরাণিক নাটক 'যাজ্ঞসেনী'র মধ্যে গিরিশচন্দ্রের প্রভাব প্রতীয়মান। কিন্তু সেই পৌরাণিক পরিমণ্ডল ও ভাষা-সৃষ্টিতে সফল হতে পারেন নি অমৃতলাল। দুর্বল চরিত্র-চিত্রগুণ, নাটকীয় গতিহীনতা ও মূলগত ভাবের পরিস্ফুটনের ব্যর্থতাই 'যাজ্ঞসেনী' নাটকের সার্থক পৌরাণিক নাটক হ'য়ে ওঠার পথে সৃষ্টি করেছে প্রতিবন্ধকতা।

অমৃতলালের নাট্য-বৈশিষ্ট্যের উল্লেখযোগ্য অবদান তাঁর নাটকে সার্থক ও সুরচিত গীতাবলীর যথাযথ সমাবেশ, যার ফলে নাটকের গতি হয়ে উঠেছে বেগবান এবং অন্তরের ভাববিশ্লেষণ হয়েছে অনেকাংশে সহজ এবং যথোপযুক্ত। পূর্ণাঙ্গ নাটকের মধ্যে কোথায়ও দু'একটি হাস্যরসাত্মক দৃশ্য অঙ্কন করে যে মিশ্র নাটক রচিত হত,— অমৃতলাল সেই মিশ্রধারার মধ্যে না গিয়ে তাঁর জীবনব্যাপী নাট্য সাধনার মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণভাবে হাস্যরসাত্মক নাট্যসৃষ্টির একটা ধারাকে পুষ্ট করে গেছেন।

নাট্যগুরু গিরিশচন্দ্রের নাট্যাদর্শের শেষ প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি অপরেশ-চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। অপরেশচন্দ্রের সাথে সাথেই গিরিশচন্দ্র কর্তৃক প্রজ্জ্বলিত আদর্শের দীপশিখা যে একেবারে নির্বাপিত হ'য়ে গিয়েছিল তা নয়, পরোক্ষ-ভাবে নানা বিষয়ে বিশেষ করে ভক্তিমূলক পৌরাণিক নাটক-রচনার ক্ষেত্রে পরবর্তী কালের নাট্যকারগণের ভাব-কল্পনাকে অনেক সময় তা আলোকিত করেছে।

বিদায়ী যুগ এবং নবাগত যুগের মিলন-মোহনায় দাঁড়িয়ে অপরেশ-চন্দ্র যেমন একদিকে অস্তোন্মুখ চন্দ্রের স্নিগ্ধ মাধুর্যে হৃদপাত্রকে পূর্ণ করেছিলেন, তেমনি আবার অভিবাদন জানিয়েছেন রক্তরাগরঞ্জিত উদীয়মান যুগসূর্যকে।

গুরু গিরিশচন্দ্রের ন্যায় অপরেশচন্দ্রও বাংলার নাট্যক্ষেত্রে প্রায়

সমস্ত বিভাগেই তাঁর নাট্য-প্রতিভাকে নিয়োজিত করেছিলেন। অনুবাদ-নাটক, চরিতমূলক, পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, কৌতুক-রসোদ্দীপক—সমস্ত শ্রেণীর নাটকই রচনা করেছিলেন অপরেশচন্দ্র রঙ্গালয়ের বিচিত্র চাহিদা মেটাবার জন্য। উপন্যাসের নাট্যরূপ দানে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

ইংরাজী নাটকের ছায়া-অবলম্বনে নাটক-রচনার মাধ্যমেই হয়েছিল বাংলার নাট্যজগতে অপরেশচন্দ্রের প্রথম আবির্ভাব। 'রঙ্গিলা', আহুতি', 'শুভদৃষ্টি', 'রাখীবন্ধন', 'বন্দিনী', এমন কি 'ইরাণের রাণী'ও পাশ্চাত্য নাটকের ভাবানুসারে রচিত।

মহাপুরুষগণের জীবন-লীলার নাট্যরূপায়ণে গিরিশচন্দ্র যে ধারা প্রবর্তন করেছিলেন সেই পথ লক্ষ্য করেই যাত্রা করেছেন অপরেশচন্দ্র। তাঁর রচিত 'রামানুজ' 'শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ' প্রভৃতি নাটকে তার স্বীকৃতি বর্তমান। কিন্তু যে আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল এবং ভক্তিরসে প্লাবিত ভাবজগতের সৃষ্টি হয়েছিল গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্যলীলা' প্রভৃতি নাটকে, অপরেশচন্দ্রর নাট্যকৃতিতে সে ঐশ্বর্য কোথায় ?

অতঃপর কাল যুগধর্ম অনুসরণ করে ঐতিহাসিক নাটকের রীতি অনুযায়ী রোমান্টিকতা এবং অনেক ক্ষেত্রে অনৈতিহাসিকতা অপরেশচন্দ্রের এ জাতীয় নাটকগুলিকে আচ্ছন্ন করেছিল। 'অযোধ্যার বেগম', 'মগের মুলুক' প্রভৃতি ঐতিহাসিক নাটক রোমান্টিকতায় পরিপূর্ণ। এর মধ্যে 'অযোধ্যার বেগম' নাট্যকারের একখানি জনপ্রিয় নাটক, সেই সময়ে সংগৃহীত ঐতিহাসিক তথ্য সমস্তই এই নাটকে সন্নিবেশিত। সুতরাং এই নাটকটিকে অনৈতিহাসিকতা দোষে দুষ্ট একথা বলা সঙ্গত হবে না।

'ইরাণের রাণী' অপরেশচন্দ্রের একখানি পুরোপুরি রোমান্টিক নাটক। জনপ্রিয়তার কষ্টিপাথরে এর উৎকর্ষ নির্ণীত হয়েছে।

পৌরাণিক নাটক-রচনায় অপরেশচন্দ্র তুলনামূলকভাবে অধিকতর সাফল্য অর্জন করেছিলেন। তাঁর 'কর্ণার্জুন' নাটক লাভ করেছিল

বিপুল জনসম্বর্ধনা। মহাভারতের নাটকীয় আবেদনপূর্ণ অংশকে বিষয়বস্তুরূপে গ্রহণ করায় নাট্যকারের নির্বাচনী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। দৈবের সঙ্গে সংগ্রামরত পুরুষকারের শক্তিতে শক্তিশালী কর্ণচরিত্র বিশিষ্ট মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

'কর্ণার্জুন' নাটকে নাটকীয় গতি কোথাও হয়ে পড়েনি শ্লথ,—মন্থর,—ভারগ্রস্ত। এই নাটকে কর্ণ ও শকুনি চরিত্র নাট্যকারের কৃতিত্বপূর্ণ অবদান। ঘটনা-সংস্থাপনায়, চরিত্র-সৃষ্টিতে, সংলাপমাধুর্যে, অন্তর্দ্বন্দ্ব পরিস্ফুটনে 'কর্ণার্জুন' একটি স্মরণীয় নাট্যসৃষ্টি। এই নাটকটির মধ্যে অপরেশচন্দ্রের মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

'কর্ণার্জুন' সম্পর্কে একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, নাটকখানি যেখানে যেভাবে অভিনীত হয়েছে, সেখানেই সাফল্য অর্জিত হয়েছে এবং রঙ্গালয়কে এই নাটক প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির সুযোগ ক'রে দিয়েছে। এমন কি, সৌখীন নাট্য-সম্প্রদায়ও যখন কোথাও অভিনয় করেছেন, তাঁরা হয়ত উপযুক্ত দৃশ্যপট, সাজসজ্জা ইত্যাদি সংগ্রহ করতে পারেন নি, কিংবা তাঁদের মধ্যে অনেক সময় উচ্চস্তরের অভিনয়-প্রতিভারও অভাব থাকত, কিন্তু তা সত্ত্বেও কর্ণার্জুন নাটকের অভিনয় সর্বত্রই চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠতে, এর ললাটে চিরদিনই অঙ্কিত হয়েছে সাফল্যের বিজয় তিলক। এই নাটকটির সংগঠনে এমনই একটা আশ্চর্যশক্তি নিহিত রয়েছে যে, এর অভিনয় মানুষকে মোহিত করবেই।

অপরেশচন্দ্রের 'শ্রীরামচন্দ্র' নাটকও রঙ্গালয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল। নাটকটি গড়ে উঠেছে বিস্তৃত পরিসরে ব্যাপ্ত সুদীর্ঘ কাহিনীকে অবলম্বন করে। তা'হ'লেও নাট্যগ্রন্থি কোথাও শিথিল হয়ে পড়েনি।

কিন্তু 'শ্রীকৃষ্ণ' নাটকের অন্তর্ভুক্ত সুবিস্তৃত বিষয়বস্তু যেন এক-একটি খণ্ড কাহিনীতে পরিণত হয়েছে। নাটকীয় ঐক্যের যথেষ্ট অভাব এই নাট্য-প্রচেষ্টার মধ্যে।

'মঙ্গলকাব্য' থেকে কালকেতু উপাখ্যান অবলম্বনে অপরেশচন্দ্র রচনা করেছিলেন 'ফুল্লরা' নাটক। এই নাটকে উল্লেখযোগ্য ভাব বর্তমান নাটকীয় দ্বন্দ্ব, কৌতূহল এবং নাট্য-পরিস্থিতি। মানবিক আবেদন নাটকটির মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠায় 'ফুল্লরা' নাটক রসগ্রাহী হ'য়ে উঠেছে। অভিনয়ের দিক থেকেও নাটকটি মঞ্চসফল।

তাঁর সামাজিক নাটক 'ছিন্নহার' হাস্যরসাত্মক 'দুমুখো সাপ' এবং 'অপ্সরা', 'সুদামা' প্রভৃতি গীতি-নাট্যের মধ্যেও নাট্যগুরু গিরিশচন্দ্র এসে বারে বারে দেখা দিয়েছেন। কিন্তু গুরুর নাট্যাদর্শকে সম্যকভাবে আত্মীকরণ অপরেশচন্দ্রের পক্ষে সম্ভব না হওয়ায় তাঁর নাটকগুলি গিরিশ-নাটক-সমূহের সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে উঠতে পারে নি। কিন্তু তাহ'লেও অপরেশচন্দ্রের লেখনীতে এমন যাদু মাখানো ছিল যে, তাঁর প্রায় প্রতিটি নাটক বাংলার নাট্যামোদী সাধারণের অকুণ্ঠ অভিনন্দনে ধন্য হয়েছিল।

রঙ্গালয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত নট ও নাট্যকার অপরেশচন্দ্রের নাট্যসৃষ্টির মধ্যে শেষ বারের মত উড্ডীন হ'ল যুগস্রষ্টা গিরিশচন্দ্রের নাট্য-প্রভাবের প্রত্যক্ষ নিশান।

———